ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ

ডঃ দীপক চন্দ্র

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০ ০৭৩
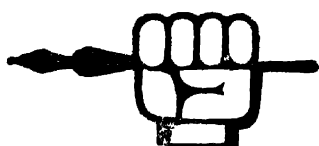
প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৬১

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

প্রথম অধ্যায়

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দ্রুপদ রাজের বিশেষ অতিথি ও বন্ধুরূপে উপস্থিত ছিলেন বৃষ্ণি সংঘের প্রধান কৃষ্ণ এবং যাদব সংঘের অন্যান্য প্রধানেরা। কৃষ্ণ ও বলরামের সাথে ভোজ, অন্ধক সাত্বৎ বংশীয় প্রধানেরা এসেছিলেন। অতিথি অভ্যাগতদের আসন যেখানে নির্দিষ্ট হয়েছিল কৃষ্ণ সেখানে যাদব বংশীয় রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে একত্রে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁরা ছাড়া আরও অনেক নৃপতি ছিলেন সেখানে। এমন কি ঋষি, মুনি এবং ব্রাহ্মণদের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। পশ্চাদভাগে উপবিষ্ট ছিলেন রবাহুত জনগণ ও ব্রাহ্মণগণ। পান্ডবেরা ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণদের সাথে একাসনে বসে পাঞ্চাল রাজ্যের ঐশ্চর্য দেখতে লাগল। সভার মধ্যস্থলের মঞ্চে উপবিষ্ট ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহুত রাজকুমার ও নৃপবৃন্দ। আপন আপন রূপ, যৌবন, কুলশীল ও ঐশ্বর্যমদে তারা এতই মত্ত যে, ঈর্ষা কষায়িত লোচনে পরস্পরের দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাচ্ছিল। তাদের দু'নয়নের ঈর্ষাবহ্নি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করছিল।

উৎসুক নগরবাসী ও গ্রামবাসী ভীড় করেছিল স্বয়ম্বর সভায়। সকলের কোলাহল কলরব ও কলহাস্যে উৎসব অঙ্গন ছিল মুখরিত। সভার পূর্বদিকে শুভ্র প্রস্তর ফলকে নির্মিত বেদী ছিল স্বয়ম্বরের জন্য সংরক্ষিত।

বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত সভাস্থল। চন্দন ও অগুরু ধূপে সুবাসিত। রমণীয় পুষ্পমাল্যে ও পতাকায় শোভিত। দুন্দুভির গম্ভীর নির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছিল। মধুর স্বরে বীণা বাজছিল। মৃদঙ্গের সুমিষ্ট ঝংকার নূপুর নিক্কণে এবং সঙ্গীতে সভাগৃহে মুখর হল। সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করল শিল্পীরা। রাজনর্তকীরা সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়াল অর্ধচন্দ্রের মত। নৃত্যের ভঙ্গী করে তারা অতিথিদের অভিবাদন করল। তারপর, হর-পার্বতীর নৃত্য পরিবেশন করল তারা।

এসব কিছুই কৃষ্ণ দেখছিলেন না। নির্নিমেষ নয়নে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সভাগৃহে প্রবেশ পথের দিকে। থেকে থেকে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। গ্রীবা উত্তোলন করে ভীড়ের মধ্যে প্রত্যাশিত কাউকে খুঁজতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কৃষ্ণ। কিন্তু দেখতে না পেয়ে বেশ হতাশ হলেন। কৃষ্ণের এই অস্থির বিচলিত ভাব কারও নয়ন গোচর হল না।

রক্তবর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান করে, মাল্য চন্দনে ভূষিত হয়ে বহুমূল্য রত্ন অলংকারে সজ্জিত হয়ে, পুষ্পমাল্য করধৃত করে সভার দ্বারদেশে উপস্থিত হল দ্রৌপদী। সব বাদ্যযন্ত্র ও কোলাহল থেমে গেল। কুলপুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে স্বস্তি বচন পাঠ করতে লাগল। তাঁর মন্ত্রপাঠ শেষ হলে দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে আনা হল।

লজ্জাবনতমুখী দ্রৌপদীকে নিয়ে ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর মঞ্চের পুরোভাগে এসে

দাঁড়াল। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র সকল বেজে উঠল। সভাস্থ ব্যক্তিরা চঞ্চল হল। মত্ত মধুপের মত গুঞ্জন করতে লাগল তারা। শঙ্খধ্বনির মধ্যে চাপা পড়ে গেল তাদের কণ্ঠস্বর। পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন হস্ত উত্তোলন করে শঙ্খ ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে নিষেধ করলেন।

দ্রৌপদী শ্যামবর্ণা হলেও অসামান্যা সুন্দরী। তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্য দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করে। কল্পনা করেও তার রূপের তল খুঁজে পাওয়া যায় না। যাজ্ঞসেনীর পরমাশ্চর্য রূপে বিমোহিত হল নৃপবর্গ। মধুলোভী নৃপবর্গের অক্ষিদ্বয় চঞ্চল হল। কন্দর্পবাণে জর্জরিত তনু তাদের মুহুর্মুহুর্ শিহরিত হল। সহস্র লোভাতুর চক্ষুর সম্মুখে দ্রৌপদী লজ্জায় অভিভূত হল। রক্তিম হল তার মুখমণ্ডল কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রে উপস্থিত অতিথিবর্গকে করজোড় করে প্রণাম করল।

সভাস্থ নৃপতিবর্গের সঙ্গে দ্রৌপদীর পরিচয় সম্পন্ন করে ধৃষ্টদ্যুম্ন মেঘগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলঃ 'হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! কৃষ্ণার সম্মুখের বেদীতেই একটি ধনু ও পাঁচটি শর আছে। ঐ ধনুর্বাণের সাহায্যে সভাকক্ষের একেবারে সর্বোচ্চ বিন্দুতে রক্ষিত লক্ষ্যবস্তু, ঘূর্ণ্যমান চক্রের ছিদ্র পথ দিয়ে পর পর পাঁচটি শরই যিনি লক্ষ্যভেদে সমর্থ হবেন, আমার ভগ্নী কৃষ্ণা কুলশীল রূপলাবণ্য সম্পন্ন সেই মহাবীরের ভার্যা হবেন।'

ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল পড়ে গেল। দর্শকদের মধ্যেও তার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। নানা জনে নানা মন্তব্য করল। যোগ্য কনের যোগ্য বরের জন্য যোগ্যতার এই পরীক্ষা করে দ্রুপদরাজ খুব ভালই করেছেন। অনেকের আবার এই ব্যবস্থা মনঃপুত হল না। কেউ কেউ দ্রুপদরাজের সততা সম্পর্কে সন্দেহ করল। কৃষ্ণার অনুপম রূপ-লাবণ্যে অভিভূত নৃপবর্গ কামমোহিত হয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করার স্বপ্ন দেখতে লাগল। স্ফীত গর্ব ও অহংকারে অন্ধ হয়ে প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল কৃষ্ণা তারই ভার্যা! আর কয়দণ্ড মাত্র বাকি!

সভাস্থ রাজকুমারের চাঞ্চল্য ও উৎসাহ দেখে কৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খুব চিন্তিত দেখাল তাঁকে। পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনও খুব উদ্বিগ্ন। মুখে কিছু বলছেন না। কিন্তু মনে মনে তৃতীয় পাণ্ডবকে প্রত্যাশা করছেন। অর্জুনকে জামাতারূপে পাওয়ার সাধ তাঁর অনেককালের। তারই উপযোগী করে এমন ধনু নির্মাণ করলেন যা অন্যের বাঁকানো সহজসাধ্য ছিল না। তা ছাড়া, অন্যে যাতে লক্ষ্য ভেদ করতে সমর্থ না হয় সেজন্য শূন্যে একটি চক্র স্থাপন করে তার উপর লক্ষ্যবস্তু রাখলেন। তাঁর সুগোপন উদ্দেশ্য একমাত্র কৃষ্ণই অনুমান করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু সেজন্য দ্রুপদের কোন ভাবনা ছিল না। উপস্থিত রাজকুমারদের মধ্যে অর্জুনকে দেখতে না পেয়ে তিনি বিষণ্ণ হলেন। সভামধ্যেও কোথাও খুঁজে পেলেন না তাকে। ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার দুঃখ শূলের মত বিদ্ধ করতে লাগল। অর্জুনের অভাবটা কৃষ্ণও ভুলতে পারছিল না কিছুতে।

পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনের মনের অবস্থা কৃষ্ণ জানেন। কিন্তু তিনিও দ্রুপদরাজের ন্যায় বিচলিত। উদ্বেগ ও অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছিল তাঁর। আশার একবিন্দু

আলোও দেখতে পেলেন না। অথচ, যাদব প্রধানদের নিয়ে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হওয়ার পেছনে ছিল বিশেষ একটা উদ্দেশ্য। অর্জুন সহ অন্যান্য পাণ্ডবদের দেখা না পেলে তা অর্থহীন হয়ে যাবে।

জতুগৃহে পাণ্ডবেরা মারা না গেলে স্বয়ম্বর সভায় তারা অবশ্যই উপস্থিত হবে। এ তাঁর নিছক অনুমান নয়; নির্ভুল রাজনৈতিক গণনা।

হোমানল থেকে যেদিন যাজ্ঞসেনী উদ্ভূত হল সেদিন জ্যোতিষীরা ভাগ্যফল গণনা করে বলেছিল: দ্রৌপদী হবে অর্জুনের জয়লব্ধা। সেই হবে মহাযুদ্ধের কারণ। জ্যোতিষীর গণনা কখনও মিথ্যা হয় না। বিধিলিপি যায় না মুছে ফেলা।

খণ্ড-বিখণ্ড ভারত রাজ্যগুলিকে পাণ্ডবদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করা সহজ বলে সমন্বয়পন্থীরা মনে করেন। এঁদের মধ্যে ব্যাসদেবের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই পাণ্ডবদের সহায়তায় এক ঐক্যবদ্ধ ভারতভূমি গঠনের চিন্তা করেন কৃষ্ণ। কিন্তু সে প্রত্যাশা কি বিফল হবে তাঁর? স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না কি ঋণ? পৃথিবী থেকে অত্যাচার, অবিচার, দুঃখ-দৈন্য দূর করবার জন্যেই পাণ্ডবদের মত নিঃস্ব, রিক্ত, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষদের আজ প্রয়োজন তাঁর। তারা সৎ, আদর্শবান ও ধার্মিক। তাদের মত মানব হিতৈষীই আর্ত-মানুষের বন্ধু হওয়ার যোগ্য। শাসন ক্ষমতা হাতে পেলে তারা নতুন ভারতভুমি গঠনের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারবে। এই কার্যের জন্য প্রয়োজন অর্জুনের শৌর্য, বীর্য, সাহস, তেজ; ভীমের অসীম ক্ষমতা ও প্রচণ্ড শক্তি এবং যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরায়ণতা ও সততা। কিন্তু কোন কারণে অর্জুন অনুপস্থিত হলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে, ভেবে আকুল হলেন কৃষ্ণ।

সমবেত নৃপবর্গের মুখমণ্ডলে পাণ্ডবদের মুখের আদল খুঁজতে লাগলেন কৃষ্ণ। তন্ন তন্ন করে দেখলেন প্রত্যেককে। কিন্তু চেষ্টা করেও দৃষ্টি সর্বপ্রান্তে পৌঁছল না। তবে কি?—অমূলক সন্দেহটা মন থেকে মুছে ফেলতে গিয়েও পারলেন না। চক্ষুবন্ধ করলেই জতুগৃহের সেই দগ্ধ বীভৎস নর-কঙ্কালগুলি তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বর্বরতার প্রতি তখন এক দুঃসহ ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মে তাঁর।

পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র সন্তানতুল্য পাণ্ডুপুত্রদের ছলনা করছেন অথবা তাদের সবংশ ধ্বংস করার জন্য বারণাবতে পাঠাচ্ছেন এমন চিন্তা যুধিষ্ঠির এবং তার ভায়েরা কখনও করেনি। এমনকি মনেও ছিল না সংশয়। নির্ভাবনায় পিতৃব্যের নির্দেশ শিরোধার্য করে তারা বারণাবতে গেল। তারপর, কিছুদিন বাদে সংবাদ এল বারণাবতের জতুগৃহে কুন্তী ও তার পঞ্চপুত্র সবংশে পুড়ে মরেছে। কিন্তু, এসব বিশ্বাস করেনি কৃষ্ণ। তাঁর কেবলই মনে হ'ত, এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মস্ত মিথ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। পাণ্ডবদের মত ধার্মিক, সত্যবাদী, নিরহংকারী মহাত্মাদের কখনও ধ্বংস হয় না, হতে পারে না। এই দৃঢ় বিশ্বাস কৃষ্ণের সর্ব শক্তির মূল। আরও ধারণা, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে এখানেই সাক্ষাৎ হবে তাঁর।

পাণ্ডবেরা বনবাসী ও ভিক্ষুক। কিন্তু তারা রাজার সন্তান। তাদের সমকক্ষ বীর ভারতে অল্পই আছে। তাদের শৌর্য-বীর্য, শক্তি-সাহস, বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তা

পরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ। কৃষ্ণ তাকে বরণ করতে এসেছেন। পাণ্ডবদের মিত্র ও আত্মীয়রূপে পেলে কৃতার্থ হবেন তিনি। তাঁর সঙ্গী সাথীরা অবশ্য এই মনোভাব আদৌ জ্ঞাত নয়। তাদের জানানোর প্রয়োজনও হয়নি এখনো। যথা সময়েই জানতে পারবে তারা।

জ্যোতিষীর বাক্য নিষ্ফল হয় না। পাণ্ডবদের সবংশে নিহত হওয়ার কথা কৃষ্ণ কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারলেন না। থেকে থেকে কেবল মনে হতে লাগল পাণ্ডুতনয় অর্জুন, নিশ্চয়ই স্বয়ংম্বর সভাতে আত্মগোপন করে আছে। তার রাজনৈতিক জ্ঞানও প্রখর। স্বয়ম্বরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাদের যে কত প্রয়োজন তৃতীয় পাণ্ডব তা জানে।

পাণ্ডবেরা বর্তমানে রাজ্যচ্যুত বনবাসী ও ভিখারী। সহায়, সম্পদ বলতে তাদের কিছুই নেই। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলে বিনা আয়াসে তারা রাজকীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। দ্রুপদরাজের আত্মীয়তা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহায়ক হবে। নিরাপদ আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেবে। হৃত গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা তখন তাদের সহজ হবে। একসাথে তারা লাভ করবে রাজত্ব ও রাজকন্যা। এই বিবাহ তাদের জীবনের মানচিত্র বদলে দেবে। এতবড় রাজনৈতিক সুযোগ পাণ্ডবেরা হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেবে বলে মনে হল না কৃষ্ণের। আরও, নানারকম অসংলগ্ন চিন্তা তাঁর মনোভূমি ছুঁয়ে কেবলই যাওয়া-আসা করতে লাগল।

রবাহূত ব্রাহ্মণেরা যেখানে বসেছিল সেখানে সহসা দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হল আনন্দে। দুরন্ত আবেগে বুক করল দুরু দুরু। স্বস্তিতে তৃপ্তিতে চক্ষু বুজে এল। সব উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তার অবসান হল। বড় ভাল লাগল এই সভা।

পার্শ্বে উপবিষ্ট বলরামকে খুব কাছে ডেকে কানে কানে পাণ্ডবদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। বললেন, হলধর, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পঞ্চপাণ্ডব এসেছে। বসে আছে রবাহূত ব্রাহ্মণদের মধ্যে। ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করলে অনেক মজার ঘটনা দেখতে পাবে।

বলরামের কিছুই বোধগম্য হল না। আরক্ত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্যে বিমোহিত দর্পিত অহংকারী নৃপবর্গ লক্ষ্যভেদের জন্যে একে একে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁদের অনেকেই ধনু উত্তোলনে ব্যর্থ হলেন। ধনুতে গুণ পড়াতে গিয়ে অনেকেই ভূপতিত হলেন। কেউ কেউ শুধু ঘর্মাক্ত হলেন। ব্যর্থতার গ্লানি ও লজ্জায় তাঁদের মুখমণ্ডল হল রক্তিম। ধনু উত্তোলনের সময় যেসব অঙ্গভঙ্গী করছিলেন তাঁরা তা দেখে হাসি পেল কৃষ্ণার। মাঝে মাঝে অধর যুগল পদ্মকলির মতো আন্দোলিত হচ্ছিল।

শিশুপাল, জরাসন্ধ, শল্য প্রমুখ মহাবলশালী ক্ষত্রীয় বীরেরা ঘর্মাক্ত কলেবরে স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করল। তাদের দুর্দশা দেখে মহাবল কর্ণ বীরবিক্রমে এগিয়ে

গেল। এবং অনায়াসে ধনু উত্তোলন করে তাতে গুণ পরিয়ে শর নিক্ষেপের জন্য লক্ষ্য যখন স্থির করল তখন দ্রৌপদী অবাক হল! কুলশীল, মর্যাদা, বিপন্ন হওয়ার আশংকায় সে অস্থির এবং বিচলিত হল। পিতার অভিলাষিত ব্যক্তি অর্জ্জুনকে পতিরূপে সেও বরণ করেছে মনে মনে। তার আসনে কর্ণকে বসাতে দ্রৌপদীর আত্মা বিদ্রোহ করল। না, কিছুতেই নয়;—কোন অবস্থায় অর্জ্জুন ছাড়া অন্য কেউ স্বামী হতে পারে না তার। সেজন্য, পিতা বহু কৌশলে অর্জ্জুনের উপযোগী ধনু ও লক্ষ্য নির্মাণ করেছে। কিন্তু, কর্ণ যে প্রতিদ্বন্দ্বী হবে, এমন কথা কৃষ্ণও ভাবেনি। রাজপুত্র এবং সদ্বংশজাত সে নয়। তবে, অঙ্গরাজ্যের রাজা। রাজা বলেই সে যোগ্য। যোগ্যতার শর্ত এরূপ হওয়া কখনও উচিত নয়। রাজকুমারী নিশ্চয়ই কোন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারে না। একটা দুর্জয় প্রতিবাদ তাকে ইস্পাতের মত কঠিন করে তুলল। কর্ণ লক্ষ্যভেদে নিমগ্ন। এখনই শর নিক্ষেপ করবে।

সভাস্থ ব্যক্তিরা বাকরুদ্ধ হয়ে দেখছিল কর্ণকে। কৃষ্ণও নির্নিমেষ নয়নে এই নাটক লক্ষ্য করছিলেন। অর্জ্জুনের কথা চিন্তা করে কৃষ্ণ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কর্ণ সফল হলে কৃষ্ণা ধর্মতঃ তার স্ত্রী হবে। অর্জ্জুন সভায় উপস্থিত থেকেও বঞ্চিত হবে বিজয় গৌরবের। আশংকা আর উদ্বেগে চঞ্চল হল তাঁর মন। উত্তেজনায় অধীর হয়ে মাঝে মাঝে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। ইচ্ছে হচ্ছিল, কিছু একটা বলে কর্ণকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করে দেবেন। কিন্তু অতিথির সেরূপ আচরণ বিধেয় নয় মনে করেই ধৈর্য ধারণ করলেন। বিধিলিপি কখনও নিস্ফল হয় না, এই বলে আপনাকে প্রবোধ দিলেন তিনি। তবু, সংশয় গেল না! পাষাণ প্রতিমাবৎ কৃষ্ণার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, ইশারার প্রতীক্ষায়।

দ্রৌপদীর নিরুপায় চক্ষু দুটি ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অনুসরণ করল। কিন্তু অপলক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে কর্ণের দিকে! তখন আর দ্বিধার সময় নেই। উত্তেজনায় তার দেহ কম্পিত হতে লাগল। লজ্জায় মুখ হল আরক্ত। চক্ষু হল অগ্নিবর্ণ। সাহস সঞ্চয় করে তীক্ষ্ন কণ্ঠে চীৎকার করে বলল: সভাস্থ সজ্জনবৃন্দ! আপনারা শুনুন, রাজকুমারী হয়ে আমি কোন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করবেন।

সেকথা ঘোষণামাত্র সভাস্থ ব্যক্তিরা চমকে উঠল। বিদ্যুৎ স্পর্শের মত কর্ণের অন্তঃকরণ কেঁপে উঠল। বিষন্ন করুণ দৃষ্টিতে তাকাল কৃষ্ণার মুখপানে। তীর বিদ্ধ পাখীর মত যন্ত্রণা কাতর তার মুখ। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। সন্তর্পণে যথাস্থানে নামিয়ে রাখল ধনু। তারপর ধীর পদক্ষেপে আসনে এসে বসল।

সভা হল নিস্তব্ধ। সুঁচ পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। আর কোন নৃপতি অগ্রসর হতে সাহসী হল না। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল লক্ষ্যস্থলের দিকে।

অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাহস দেখে বিপ্রগণ উল্লসিত হল। তাকে ব্রাহ্মণ বলেই ভাবল তারা। তাই আশীষবাণী উচ্চারণ করে উৎসাহিত করল। পরাজয়ের

আশংকায় কেউ কেউ আবার ম্রিয়মান হল। বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্পর্ধা অনেক ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ করল। তাদের ধিক্কার উপহাস বিদ্রুপের বিরুদ্ধে একদল ব্রাহ্মণ রুখে দাঁড়াল। বাদপ্রতিবাদের উত্তেজনায় সভা গম গম করতে লাগল।

অর্জ্জুন নির্বিকার। এত কোলাহল, উত্তেজনা সে ভ্রূক্ষেপ করল না। নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় দৃঢ় প্রত্যয়ে ধীর ও গম্ভীর পদক্ষেপে বেদীর দিকে অগ্রসর হল।

বলরাম অত্যন্ত প্রীত ও হৃষ্ট হয়ে দেবতুল্য রূপবান কৃষ্ণাজিনধারী লোহিত বর্ণময় বিপ্রবেশী অর্জ্জুনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তার সুগঠিত বপু, দৃপ্ত পৌরুষ তাঁর চোখে নেশা ধরিয়ে দিল। কৃষ্ণও অগ্রজের মত আনন্দে অস্থির হল।

বেদীর সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল অর্জ্জুন। কোনরূপ ব্যস্ততা নেই তার। সমস্ত শক্তি যেন আত্মস্থ করে নিচ্ছিল সে। তারপর বেদী প্রদক্ষিণ করল সাতবার। যুক্ত করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করল। তারপর ধনুটি অবলীলায় হাতে তুলে নিল। অমনি সব গুঞ্জন থেমে গেল। সভা নিস্তব্ধ হল। কোন দিকে না তাকিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে অর্জুন তাতে গুণ সংযোগ করল। এবং নিমেষমধ্যে পর পর পাঁচটি শরে বিদ্ধ করল নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু। লক্ষ্যবিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হল।

অমনি পক্ষ ও বিপক্ষ দলের সব ব্রাহ্মণেরা কমণ্ডলু ও উত্তরীয় ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। দর্শকেরা অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল। বিজয়ীর সম্মানে বেজে উঠল বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। পুরঙ্গনাদের শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হল সভাস্থল।

কৃষ্ণের দুই চক্ষু আনন্দে দীপ্ত হল। কৃষ্ণা হল বিহ্বল। পদ্ম-পলাশের মত নেত্র-দ্বয় ভাবাবেশে বিভোর। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীনবেশী শ্যামবর্ণ তরুণ ব্রাহ্মণের দিকে। বুকে তার আবেগ, মনে আশঙ্কা, চোখে মুগ্ধতা।

মুখে কিছু বলতে পারল না সে। সলজ্জ চক্ষুদ্বয়ে নীরব আমন্ত্রণ। আত্ম-সমর্পণের ব্যগ্র ব্যাকুল আহ্বান। বিজয়ীর প্রতি নারীর স্বভাবগত আকর্ষণের মুগ্ধতা তার দু'চোখের তারায় ফুটে বেরোল। অকুণ্ঠ-হৃদয়ে বিজয়ীর কণ্ঠে-পরিয়ে দিল তার বরমাল্য। মহারাজ যজ্ঞসেন হৃষ্টচিত্তে বিজয়ী বীরের হস্তে দ্রৌপদীর পদ্মকলির মত করদ্বয় স্থাপন করে বললেন ঃ বৎস ধন্য তুমি। এ কন্যার বরমাল্য তোমার প্রাপ্য। একে গ্রহণ করে কৃতার্থ কর আমায়।

তারপর ব্রাহ্মণগণ এসে বিধিমতে অর্জ্জুনকে দ্রৌপদী সম্প্রদান করলেন।

হর্ষোৎফুল্ল যজ্ঞসেনের মনে তবু সংশয়! অজ্ঞাত কুঁলশীল এই ব্রাহ্মণ কে? কি তার পরিচয়? কোথায় ঘর তার?—রাজকীয় সুখ ও ঐশ্বর্যে লালিতা পালিতা কৃষ্ণা পারবে কি দীন ব্রাহ্মণের গৃহে দিন যাপন করতে? কষ্ট হবে না তার? কন্যার দুর্ভাগ্য স্মরণ করে তাঁর পিতৃহৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির হল। পরক্ষণেই একটা অবিশ্বাস প্রবল হল তাঁর মনে। ঐ ধনু ও লক্ষ্যে অর্জ্জুন ছাড়া অন্য কেউ শরক্ষেপণ করতে পারে না। কিন্তু, এই বিশ্বাস মনে কিছুতে দৃঢ় হল না।

কন্যা ও জামাতার চিন্তায় যখন তন্ময় যজ্ঞসেন, তখন অপমানিত আশাহত পরাজিত শত শত নৃপ অসি হস্তে ধাবিত হল তাঁর দিকে। তাদের বিশ্বাস মহারাজ

দ্রুপদ ইচ্ছা করেই এই অবহেলা দেখিয়েছেন। অপমান করার জন্যই একজন ভিখারী ব্রাহ্মণকে কন্যা সম্প্রদান করেছেন। স্বয়ম্বর ক্ষত্রিয়ের জন্য। ব্রাহ্মণের তাতে অধিকার নেই। তবু তাকে সে সুযোগ দেওয়া হল। কিন্তু সেজন্য ব্রাহ্মণ দোষী নয়। সব অপরাধ দ্রুপদের সুতরাং দোষের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে মিলে দ্রুপদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

প্রতিশোধের রক্ত তৃষ্ণায় অস্থির হল তাদের অসি। ক্রোধোন্মত্ত নৃপগণের কোলাহলে চীৎকারে আস্ফালনে কেঁপে উঠল স্বয়ম্বর সভা! কৌতূহলী হয়ে যারা স্বয়ম্বর দেখতে এসেছিল গণ্ডগোল দেখে পালাল তারা। অতিথিদের অনেকেই প্রাণভরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। ক্ষত্রিয় রাজারা সকলেই যজ্ঞসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। নিজেকে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় মনে করলেন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ব্রাহ্মণদের সাহায্য ভিক্ষা করলেন।

কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বায়ুবেগে ধেয়ে এল অসুরাকৃতি এক ব্রাহ্মণ যুবক। ধনুর্বাণ হাতে তার পাশে দাঁড়াল কৃষ্ণা বিজয়ী কৃষ্ণাজিনধারী অর্জ্জুন। মুহূর্তে স্বয়ম্বর সভা রণাঙ্গনে পরিণত হল। সজ্জিত কাননের বৃহৎ বৃক্ষগুলি নিমেষ মধ্যে উন্মূলিত করে বিদ্রোহী রাজন্যবর্গকে ভীমবেগে আক্রমণ করল ভীম। তার ক্লান্তিহীন আক্রমণে হতভম্ব হল আক্রমণকারীরা। মধ্যমের তাণ্ডব নৃত্য দেখে দেখে অবাক হল অর্জ্জুন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অধরে তার স্নিগ্ধ বক্র হাসির রেখা।

তারপর, বড় রকমের যুদ্ধ যখন আসন্ন হল, তখন অর্জুন যোগ দিল তার সঙ্গে। চক্ষের পলকে সে অস্ত্রহীন করল বলদর্পী নৃপবর্গকে। তাদের ধনুর ছিলা হল ছিন্ন, অসি ও খড়্গ হল ভগ্ন। কর্ণ, শল্য, ভগদত্ত প্রমুখের গর্ব হল খর্ব।

ভীমার্জুনের যুদ্ধে চমৎকৃত ও অভিভূত পাঞ্চালরাজ। এমন অদ্ভুত যুদ্ধ ইতি-পূর্বে দেখেননি তিনি। জামাতা দীন ব্রাহ্মণ বলে মনে যে ক্ষোভ ছিল তা দূর হল। জামাতার জন্যই প্রাণরক্ষা পেল তাঁর। কৃতজ্ঞতায়, গর্বে আনন্দে তাঁর বক্ষ স্ফীত হল। সংশয়ের অবসান হল। নিঃসন্দেহ হলেন যে, ইনিই সেই তৃতীয় পাণ্ডব। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জামাতা।

দ্রৌপদীরও বিস্ময়ের অন্ত নেই। বিপ্রদ্বয় মুহূর্তে যে তুমুল কাণ্ডটা করল তা কোন সাধারণ বীরের কার্য নয়! পাণ্ডু পুত্রেরা ছাড়া এরূপ বিক্রম, অন্য কেউ প্রদর্শন করতে পারে না। ভীষণ ভাল লাগল বিপ্রবেশী অর্জ্জুনকে। আকাঙ্ক্ষিত বরের কণ্ঠে বরমাল্য দিতে পারার আনন্দে সে বিহ্বল। পল্লবঘন আঁখিদ্বয় অনুরাগে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়ল। একদৃষ্টে বিজয়ী বীরের দিকে তাকিয়ে রইল। পলক পড়ে না মোটে। ভাল লাগার আবেশে দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে এল। বাতাস লাগা ধানের ক্ষেতে যেমন ঢেউ বয়ে যায় তেমনি একটা দুর্বল আবেগের শিহরণে তার সারা অঙ্গে মুহুর্মুহু প্লাবিত হল। বড় ভাগ্যবতী বলে মনে হল নিজেকে। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! কতবার নামটা উচ্চারণ করল মনে মনে। তবু তৃপ্তি মেটে না তার।

অনেককাল ধরে এমন একজন নির্ভীক বীরের সন্ধান করছিলেন কৃষ্ণ। পাণ্ডবদের

শক্তি, সাহস, তেজ ও বিক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন তিনি। এজন্য তাদের বহুমূল্য দিতে হয়েছে জীবনে। অনেক দুঃখ, লাঞ্ছনা কষ্ট ভোগ করে ভারতের রাজনীতিতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের আবির্ভাব খুবই নাটকীয় এবং রোমাঞ্চকর। তাদের পুনরাগমন কৃষ্ণকে পুলকিত করল। মনে মনে স্বাগত জানালেন।

ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে একদিন দুর্যোধন তাদের সবংশে হত্যার জন্য বারণাবতে পাঠাল। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে যাতে তারা জীবন্ত দগ্ধ হয় সেজন্য দক্ষ কারিগর দিয়ে বিবিধ দাহ্য-বস্তুর সমন্বয়ে এক আশ্চর্য সুরম্য গৃহ নির্মাণ করল। তারপর কিছুদিন বাদে জতুগৃহ ভস্মীভূত হওয়ার সংবাদ এল। সে সংবাদ শ্রবণ করে কৃষ্ণ ঘটনাস্থলে এসেছিলেন! অগ্নিদগ্ধ মনুষ্য দেহগুলি দর্শন করে তিনিও অন্যান্য রাজন্যদের মত পাণ্ডবদের মৃত্যুসম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, ধর্মাত্মা বিদুর প্রাণাধিক যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতাদের জন্য দুঃখ বা শোক করেননি তখনই কৃষ্ণের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হল। সেই রহস্যের অবসান হল আজ। সব দুশ্চিন্তার হল শেষ। এই মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। পাণ্ডু পুত্রেরা তাহলে এখনও বেঁচে আছে! বিধাতা তার কর্ম সম্পাদনের জন্যই বোধ হয় বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের। সুতরাং তাঁর আশা ও বাসনা পূরণের আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না। পিতৃস্বসা কুন্তীর পুত্রদের বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য তিনি গর্ব অনুভব করলেন। নিবিড় বাহু-পাশে আবদ্ধ করার জন্য তাঁর সমগ্র হৃদয় ব্যাকুল হল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের অজ্ঞাত পরিচয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করা নিরাপদ নয় মনে করে আপনার অসংযত ইচ্ছা ও উচ্ছ্বাসকে সংযত করলেন।

কর্ণ, শল্য, দুর্যোধনের মনে একই সন্দেহ। এরা সাধারণ ব্রাহ্মণ নয়। তাহলে কে এই বিপ্র? কোন্ ব্রহ্মতেজে বিশাল বিশাল বৃক্ষ নিমেষে উৎপাটিত হল? পলক না ফেলতে এত শররাশি কোন মায়ামন্ত্রে নিক্ষিপ্ত হল? শ্রেষ্ঠ অস্ত্রীদের নিরস্ত্র করার এই ব্রহ্মবল তারা পেল কোথা হতে? সাধারণ মানুষের এ কার্য অসাধ্য। তবে কি, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কোন দেবতা এসেছে হোমাগ্নি সম্ভূতা দ্রৌপদীকে স্বর্গের দেবী করে নিতে? সংশয়ে দোদুল্যমান হল তাদের চিত্ত। সুতরাং নতুন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে বিপ্রদ্বয়ের সত্য পরিচয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক মনে করল তারা।

বিপ্রগণের মায়াবল ধ্বংসের জন্য ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত ও পরাভূত নৃপবর্গ একত্রিত হয়ে পুনরায় আক্রমণের জন্যে উদ্যত হল। তখন শান্তি কামনায় কৃষ্ণ তাদের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। কোমল পেলব দীর্ঘ বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে ক্ষুব্ধ নৃপবর্গকে শান্ত ও সংযত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন।

কৃষ্ণ সকলকে অনুনয় করে বললেনঃ হে মহাবল, মহীপালবৃন্দ। পাঞ্চালী এই বিপ্রের জয়লব্ধা। ধর্মতঃ তার ভার্যা। আপনারা সকলেই প্রাজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ। তাহলে, এরূপ রক্তক্ষয়ী কলহে আপনারা কি করে লিপ্ত হলেন—আমি ভাবতেও অক্ষম। এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনাদের মতো নৃপের মানায় না। এরা ধনহীন হলেও শক্তিমান। সুতরাং দুর্বল ভেবে এদের সঙ্গে সংগ্রামপরায়ণ হলে অনর্থক রক্তপাত হবে। তাতে আপনাদের কোনো লাভই হবে না। সে হবে আপনাদের চরম অধর্ম। আপনাদের

অপযশ বৃদ্ধি পাবে তাতে। সুতরাং এখনই আপনাদের যুদ্ধ পরিহার করা উচিত। পাঞ্চালী যথার্থই এই বিপ্রের স্ত্রী। আমার বিনীত অনুনয়, আপনারা স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন।

মধুভাষী কৃষ্ণের অনুনয় বাক্যে বিমোহিত হল তারা। সকল চিত্তক্ষোভ অচিরেই প্রশমিত হল। এতটা বিভ্রান্তি এবং অসাবধানতার জন্য তারা প্রত্যেকেই লজ্জিত হল। কৃষ্ণের নির্দেশ প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করল তারা। এবং এতক্ষণে কিছুটা সুস্থ বোধ করল। কৃষ্ণের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলে ভাল করে চেয়ে দেখল। কী সুন্দর সেই মুখশ্রী! আয়ত চোখের চাহনি প্রেমে, ক্ষমায়, প্রজ্ঞায়—স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তাদের। কৃষ্ণের প্রজ্ঞাকে অভিনন্দন জানিয়ে তারা বিদায় নিল।

ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নিয়ে ভার্গব গৃহে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণ। অধরে তাঁর রহস্যময় হাসি।

পিতৃস্বসা পৃথার কথা মনে হল তাঁর। রত্নগর্ভা পঞ্চ-পাণ্ডবের জননী তিনি। রাজ্য ঐশ্বর্য-সুখ বঞ্চিতা সেই মহীয়সী নারী কোথায়, কি অবস্থায়, এখন আছেন, জানতে বাসনা হল তাঁর। কতকাল দেখেন না তাঁকে! পঞ্চ-পাণ্ডবও জানে না কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের আত্মীয় সম্পর্ক। চেনেও না তাঁকে। ভারী আশ্চর্য এক ঘটনা। এখন তাদের সঙ্গে নতুন করে আত্মীয় সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন খুবই অধিক।

পাণ্ডবদের এখন চরম দুঃসময়। সহায় সম্বল বলতে তাদের কিছু নেই। এমনকি একজন বান্ধবও না। স্বজন থেকেও নেই! রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব আছে, কিন্তু তার উপর অধিকার নেই। বসবাসের ভূমি নেই, বাস করার গৃহ নেই। এক নেই রাজ্যের বাসিন্দা তারা। তাদের দুরবস্থা দেখে মায়া হল কৃষ্ণের। এই দুর্দিনে তাদের সহায় হওয়া সবচেয়ে বেশী দরকার। এখন পাণ্ডবদের প্রয়োজন একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর। সর্ববিপদে যে তাদের সহায় হবে। এবং যাঁর বল, বিক্রম, তেজ সাহস তাদের দেবে নিরাপদ আশ্রয় ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ। এমন মিত্রের কাছে অসহায় পাণ্ডবেরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। চিরন্তন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হবে। আত্মপ্রকাশের শুভক্ষণে যে তাদের সহায় হবে পাণ্ডবেরা নির্দ্বিধায় তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেবে। তাদের বন্ধু হলে একটা অলিখিত কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ এক সুদূরপ্রসারী মূল্য লাভ করবে। কৃষ্ণ তাই সদলবলে ভার্গব গৃহে যাওয়া মনস্থ করলেন। এবং এক বিরাট কূটনৈতিক জয়লাভে তৎপর হলেন।

ভিখারী অবস্থার পাণ্ডবদের আর খুব বেশিদিন কাটাতে হবে না। শীঘ্রই আত্ম-প্রকাশ করবে তারা। অচিরেই প্রত্যাবর্তন করবে স্বরাজ্যে। তখন ধৃতরাষ্ট্রও পারবে না তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে। কিন্তু হস্তিনাপুরের কোন অধিকার ধৃতরাষ্ট্র তাদের দেবে না। নতুন রাজ্য রাজধানী তাদের তৈরী করে নিতে হবে। পাণ্ডুপুত্রেরা কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং উদ্যমী পুরুষ সেজন্য কোন অসুবিধা হবে না তাদের। কিন্তু এ কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তারা। অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পেলে তারা ধন্য হবে। কৃতজ্ঞ থাকবে। পাণ্ডবদের বল, বিক্রম, তেজ, সাহস, ব্যক্তিত্ব, মনীষা শ্রদ্ধার বস্তু। তাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যে-কোন প্রভুত্বশালী রাজার কাম্য ধন।

পাণ্ডবেরা বেঁচে আছে জানলে জরাসন্ধের মত প্রতিপত্তিশালী সম্রাটও তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এরূপ অবস্থায় পাণ্ডবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তিনি লাভবান হবেন অধিক। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়া তখন তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। অসহায় পাণ্ডু পুত্রেরা রাজ্যলাভের জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জরাসন্ধের মত সাম্রাজ্যবাদী প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটের মিত্রতা ও সহযোগিতা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবে। সরল ও ধর্মপ্রাণ পাণ্ডুপুত্রেরা কূটবুদ্ধি দিয়ে কখনই জরাসন্ধের কপট অভিপ্রায়ের মূল্যায়ন করবে না। কিন্তু জরাসন্ধের শক্তি শিবিরের সঙ্গে পাণ্ডবেরা যুক্ত হলে শক্তির ভারসাম্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা প্রবল। দুই বৃহৎ শক্তিশালীর শরিক জরাসন্ধ এবং যাদব সংঘের অনিবার্য সংঘর্ষে যাদবেরা আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ হবে। পরাজিত যাদব প্রধানদের বন্দী করে মহাকালের বলি সম্পন্ন করবে জরাসন্ধ।

কৃষ্ণ তাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। উদ্বেগ ও আশংকায় তার মন হল অস্থির। দুর্ভাবনায় চিত্ত হল কাতর।

পাণ্ডবেরা রাজনৈতিক সাহায্য ও আশ্রয় লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সুতরাং অন্যের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পূর্বেই যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় তাহলে সব দিক রক্ষা পায়। পাণ্ডুপুত্রেরা তাঁর পরম আত্মীয়। তাদের উপর কোন রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের ইচ্ছা তাঁর নেই। সম্পূর্ণ আত্মীয়রূপে পেতে চান তাদের। উভয় রাষ্ট্রের মৈত্রী ও সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা তাঁর উদ্দেশ্য। প্রীতি, মৈত্রী ও সহযোগিতার এক আদর্শ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে নবগঠিত দুর্বল রাজ্যগুলি সংরক্ষণের পক্ষপাতী তিনি। কিন্তু সে সংগোপন ইচ্ছার সংবাদ রাখে না কেউ। কারো কাছে প্রকাশও করেন না কখনো। নিজেই নিজের চিন্তার অংশীদার তিনি।

পাণ্ডবদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের অভিলাষ কি উপায়ে যাদব প্রধানদের কাছে ব্যক্ত করা যায় সেই উপায় চিন্তা করছিলেন কৃষ্ণ।

কৃষ্ণকে চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখে বলরাম জিগ্যেস করলঃ এমন বিমর্ষ কেন তুমি? কি হল তোমার?

এরকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন কৃষ্ণ। বলরামের সাগ্রহ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বললেনঃ হলধর! পিতৃস্বসার পুত্র ভীম ও অর্জ্জুনের বিক্রম দেখে অভিভূত হয়ে গেছি। তাদের সাথে আলাপের জন্য মন আমার ভীষণ ব্যাকুল হয়েছে। আমার ইচ্ছা তোমরাও আমার অনুগমন কর।

যদুবংশীয় ব্যক্তিরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। সেদিকে না তাকিয়ে কৃষ্ণ স্বগতোক্তি করে বললেনঃ আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র অর্জ্জুন স্বয়ম্বরে যে গৌরব মর্যাদা লাভ করল, আত্মীয় হিসাবে আমরা সেজন্য গর্ব অনুভব করছি। তার সাফল্যে আমরা উৎফুল্ল। তাই তো?

তাঁদের মতামত জানার জন্যই যেন প্রশ্নটা করা হল। সব যাদব প্রধানেরা মাথা নেড়ে কৃষ্ণের বক্তব্য সমর্থন করলেন। অনেকে উচ্চৈস্বরে বলল ঃ তা তো বটেই।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি অনুসরণ করে কৃষ্ণ মেঘমন্দ্র কণ্ঠে বললেনঃ

হে আমার পূজনীয় যাদব প্রধানগণ, আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কুন্তীপুত্রদের চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের দিনে আমরা কেউ তাদের আত্মীয় ও বন্ধু হইনি। দুঃখের কথা আমাদের পরম আত্মীয় হয়েও তারা আজ পথের ভিখারী। তস্করের ন্যায় আত্মগোপন করে থাকতে হয় তাদের। এর চেয়ে অধিক লজ্জা, ঘৃণা আর কি থাকতে পারে? তারা সৎ ধার্মিক এবং আদর্শবান। তবু, তারা মানুষের ন্যায্য অধিকার সুখ ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার ন্যূনতম দাবীটুকুও তারা পেল না। তবু, আত্মীয় হয়ে তাদের জন্য কিছুই করলাম না। এই মুহূর্তে, আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো।

কৃষ্ণের ভাষণে যাদব প্রধানরা একটু মুস্কিলে পড়লেন; সত্যিই তো! এতক্ষণ এ কথাটা একবারও মনে হয়নি তাঁদের। কৃষ্ণ মনে না করলে ব্যাপারটা খুব খারাপে দাঁড়াত। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের মান মর্যাদাও যুক্ত হয়ে আছে। অতএব তাঁদের কিছু একটা করা অবশ্যই উচিত। কিন্তু কি? পরস্পরের মুখ অবলোকন করতে লাগল তাঁরা। তখন বলরাম বললেনঃ কৃষ্ণ খুবই কাজের কথা বলেছে। বিলম্ব না করেই আমাদের পিতৃস্বসার গৃহে যাওয়া উচিত।

বলরামের প্রস্তাব সকলে একবাক্যে অনুমোদন করলেন। অতঃপর রথে আরোহণ করে তাঁরা দ্রুত ভার্গব গৃহের দিকে যাত্রা করলেন।

কৃষ্ণের বুদ্ধি ও চাতুর্যের তুলনা নেই। নিজেও জানেন তিনি। আত্ম-প্রত্যয় দীপিত হাসিতে রঞ্জিত হল তাঁর মুখখানি। যাদবদের কেউ জানেন না যে, এক বিরাট রাজ্য জয় সম্পন্ন করতে চলেছেন তাঁরা। কৃষ্ণের অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই, যাদব ও পাণ্ডবের মহামিলন সংঘটিত হতে চলেছে।

বলরামকে সঙ্গে করে কৃষ্ণ যখন ভার্গবের কুটীর প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কুটীর সংলগ্ন বারান্দায় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন স্তব্ধ পাষাণবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। ভীষণ মৌন ও বিষন্ন তারা। লজ্জাবনত আঁখিদ্বয় সংশয় ও ভীরুতায় কম্পিত। কেউ কারও মুখের প্রতি ভাল করে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পাচ্ছে না। কুটীরের দ্বারপ্রান্তে অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে বসে আছেন কুন্তী। দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণাকেও তাদের মধ্যে দেখলেন কৃষ্ণ। উদভ্রান্তের মত সে তাকিয়ে আছে অর্জুনের দিকে। সকলকে এরকম চিন্তামগ্ন, বিমর্ষ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে কৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন।

এমন একটা বিসদৃশ অবস্থার জন্য তৈরী ছিলেন না কৃষ্ণ। স্বপ্নেও এরূপ দৃশ্য কল্পনা করেননি। সব কেমন অস্বাভাবিক মনে হল তাঁর। কোথায় যেন একটা বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। তাই, এমন বিমূঢ় তারা। মাত্র কয়েক দণ্ডের মধ্যে এমন কি ঘটল যা তাদের জীবন এলোমেলো করে দিল। রাজ-নন্দিনী কৃষ্ণাই কি কালবৈশাখীর সেই মত্ত ঝড়?

কৃষ্ণ যে কখন আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছিল, পঞ্চপাণ্ডবের কেউ তা জানে না। দ্রৌপদীর আপাত নত মুখের বক্র কটাক্ষে অর্জুন পিছন ফিরে তাকাতেই কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখতে পেল। অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাঁদের

দিকে। পলক পড়ল না চোখের। এই লোকটির অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং প্রত্যুৎপন্নমতির ফলেই এক মহা সর্বনাশ থেকে সকলে রক্ষা পেল স্বয়ম্বর সভায়। এই মুহূর্তে তাঁকে এখানে দেখতে পাওয়া খুবই বিস্ময়ের।

অপরিচিত অতিথিদের দেখামাত্র পাণ্ডুমহিষী কুন্তী ত্রস্তপদে কুটীর থেকে বেরিয়ে এলেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে অবাক হলেন তিনি। শৈশব ও কৈশোরে তাঁদের দেখলেও কুন্তী চিনতে ভুল করলেন না। আনন্দে তাঁর কণ্ঠস্বর কলকল করে উঠল। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করতে তাঁদের নিয়ে কুটির মধ্যে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম পিতৃস্বসা কুন্তীর পদযুগল স্পর্শ করে প্রণাম করল। বিস্ময়ে পঞ্চপাণ্ডব হতবাক্ হল? কে এই অতিথি? তাদের সাথে এঁদের সম্পর্ক কি? এতদিন কোথায় ছিলেন তাঁরা? এখানেই বা এলেন কেন? অসংখ্য জিজ্ঞাসায় তাঁদের মন তোলপাড় করে উঠল।

কুন্তী কিছু বলার আগেই কৃষ্ণ আপনার আত্মপরিচয় দিয়ে সকৌতুকে বললেন: আপনার জননী আমরা পিতৃস্বসা। আমরা আপনার মাতুল পুত্র। বসুদেব আমাদের পিতা। ইনিই আমার অগ্রজ বলরাম।

বিস্ময়ে বিহ্বল হল পঞ্চপাণ্ডব। প্রত্যেক ভ্রাতার সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ। তাঁর বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে যথাবিধি সম্ভাষণাদি সেরে যুধিষ্ঠির হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন: আমাদের চিনলেন কেমন করে?

কৃষ্ণের প্রশান্ত মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসেন, আর বলেন: প্রচ্ছন্ন থাকলে কি অগ্নির দাহিকা শক্তি বিনষ্ট হয়? ভস্মও পারে না তাকে আবৃত করতে। স্বয়ম্বর সভায় ভীম ও অর্জুনের পরাক্রম দেখেই তাদের চিনেছি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যখন তোমরা পাঁচ ভাই উপবিষ্ট ছিলে তখনও চিনতে ভুল হয়নি আমার। জতুগৃহ থেকে তোমরা যে রক্ষা পেলে সেও দেবতার আশীর্বাদ।

কুন্তী কিন্তু ভীষণ অন্যমনস্ক। এসব কথাবার্তা তিনি শুনছেন না বলেই মনে হল কৃষ্ণের। কি এক গভীর দুশ্চিন্তায় তিনি যেন আচ্ছন্ন। তাঁকে বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন: আপনাকে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে কোন কারণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত আছেন। সব কুশল তো।

এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে কুন্তী ছোট থেকে ভাল করে জানেন। তার কাছে কিছু লুকোনোর উপায় নেই। মানুষের মনের ভেতরটা সে দেখতে পায়। বিধাতা তাকে এক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। কুন্তী নিজেকে আর অবদমিত করতে পারল না। রুদ্ধ আবেগে তাঁর কণ্ঠ ভিজে গেল। আত্মসম্বরণ করতে তাই একটু সময় লাগল। তারপর, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন:

বৎস, দ্রৌপদীকে না দেখে, ভীম ও অর্জুনের কৌতুকের তাৎপর্য না বুঝেই কুটীরের ভিতর থেকে বলে ফেললাম, তোমরা যে ভিক্ষা এনেছ, সকলে মিলে ভোগ কর। এখন, মাতৃবাক্য যাতে অন্যথা না হয় সেজন্য অর্জুন আপনার জয়লব্ধা দ্রৌপদীকে পঞ্চভ্রাতার ভার্যা হওয়ার কথা বলছে। তুমি এর প্রতিকার কর কৃষ্ণ। এমন

একটা উপায় বলে দাও, যাতে আমার দ্রৌপদী মায়ের পাপ না হয়। বহুচারিণীত্বের দোষ থেকে সে যেন অব্যাহতি পায়। এবং আমিও অনুচিত কর্মের দোষ থেকে মুক্ত হতে পারি।

বিস্ময়ে কৃষ্ণের বাকরুদ্ধ হল। সত্যনিষ্ঠার এমন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। ঠিক এ রকম কোন বিচারের ভার গ্রহণ করতে হবে তাঁকে, ভাবেননি কখনও। কল্পনাতেও পেঁছায়নি এতদূর। তাই ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত মূক হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। এমন আশ্চর্য খুব কম হয়েছেন জীবনে। রহস্য স্বপ্নাচ্ছন্ন হল তাঁর দৃষ্টি।

এক নারীর পঞ্চ স্বামী! অবশ্য কুন্তীও জীবনে চারজন পুরুষ বরণ করেছেন। তবু ভ্রষ্টা নামের কলঙ্ক লাগেনি তাঁর চরিত্রে। তা হলে দ্রৌপদীর বহুচারিণীত্বে দোষ হবে কেন? প্রেমের হীরক দ্যুতিতে সব পাপ প্রক্ষালন হয়। নিয়ম ও সংযমে প্রেম যদি একনিষ্ঠ হয় তা হলে বহুপুরুষের সংস্রবেও সে নারী ব্যাভিচারী হয় না। কুন্তীর সমাধানহীন আকুল জিজ্ঞাসার জবাব এ ছাড়া অন্য কিছু হয় না! কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না কৃষ্ণ।

কেবলই মনে হতে লাগল, জীবন থেকে এক আশ্চর্য সুন্দর পাঠ গ্রহণের জন্য দেবতা যেন তাদের মর্তধামে পাঠিয়েছে। সাধারণ মানুষেয় দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ ও পীড়নের কষ্ট ও দুর্ভোগের সঙ্গে পরিচিত করার জন্যেই বিধাতা তাদের রাজ্য, ঐশ্বর্য, আশ্রয় কেড়ে নিয়ে একেবারে পথের ভিক্ষুক করলেন। লক্ষ্য মূঢ় মূক জনসাধারণের ভীড়ে হারিয়ে গেল তারা। তাদের আলাদা কোন পরিচয় থাকল না। তাদের গোত্রান্তর হল। দুঃখী মানুষের প্রতি মমতা জাগানোর জন্যই যেন এই সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি। এক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে যেন জন্ম তাদের। তাই রাজ্যলাভের ঠিক আগেই এক নতুন চিত্ত সংকটের সূচনা করে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং জীবনপাঠের নয়া ব্যবস্থা করলেন বিধাতা। আর দ্রৌপদী সেই পাঠ্যপুস্তক।

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁর নিজস্ব বলে কিছু থাকতে নেই। তাঁর সব সম্পদই রাজ্যের প্রজাগণের। পাঁচজনের সম্পত্তি। রাজা তার রক্ষক মাত্র। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী গ্রহণ যেন এক মহা সত্যের ইংগিত বহন করছে। এক রমণীকে পাঁচ ভাইতে যখন মিলেমিশে ভোগ করবে তখন তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা ও প্রীতির যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাবে, তা থেকে জনগণ এই শিক্ষাই লাভ করবে যে, এই পৃথিবীতে কিছুই আপনার একলার ভোগের জন্য নয় যা কিছু আছে তা সকলকে মিলেমিশে ভোগ করতে হবে। সকলের সমান অধিকার তাতে।

এরূপ একটা অদ্ভুত ভাবনায় তাঁর চিত্ত অভিভুত হল। খুব আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। এ তো তাঁর নিজস্ব ভাবনা, জিজ্ঞাসা ও পরিকল্পনারই ছায়া! সাম্য, প্রেম, মৈত্রী ও সহযোগিতার যে রাজনৈতিক আদর্শ স্থাপনের স্বপ্ন তাঁর দু'চোখে, পাণ্ডবেরা যেন তারই রূপকার।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে পিতৃস্বসার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন কৃষ্ণ। কেমন এক ধরনের রহস্যময় গভীরতা সে দৃষ্টিতে।

কুন্তীও সাগ্রহে ভ্রাতুস্পুত্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। মুগ্ধতার সঙ্গে একটা ভয়ের ভাব ছিল সে চাহনিতে।

এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসিতে কৃষ্ণের ওষ্ঠাধর বক্র ও কুটিল হল। নিয়তির কঠোর নির্দেশ যেন স্বগতোক্তির মত করে ধীরে ধীরে বললেন, এতে আপনার বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। উদ্বিগ্ন হওয়ারও কোন কারণ খুঁজে পাই না। আমরা সকলেই বিধির বিধানে কাজ করি। আমাদের সমস্ত কর্মফল তাঁর চরণে অর্পিত হয়। অকারণ আশংকা বা উদ্বেগ ঠিক নয়। বিধাতার যখন ইচ্ছা তখন আপনার আদেশমত দ্রৌপদী পঞ্চ-পাণ্ডবেরই ভার্যা হোক। এতে সকলেরই ধর্ম রক্ষা হবে।

বিস্ময়ে অর্তনাদ করে উঠলেন কুন্তী।—অ্যাঁ! তুমি বলছ কি দেবকীনন্দন? তাও কি সম্ভব! এক নারীর পঞ্চস্বা—

কুন্তীর বিস্ময় ব্যাকুল জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর অর্ধপথে তার কণ্ঠরোধ করল।

মেয়েদের মন এক আশ্চর্য বস্তু। নিজের সম্বন্ধে পৃথা যত উচ্চ ধারণা পোষণ করুক না কেন, সতীত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা তাঁকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। পৃথার মনের গোপন ব্যাথার কাহিনী কৃষ্ণ জানে। তাই কৃষ্ণের চোখে পড়তেই সঙ্কুচিত ও বিহ্বল হয়ে পড়েন তিনি। অমনি বাক্যরুদ্ধ হয়ে যায়। পৃথার অবস্থা দেখে কৃষ্ণের হাসি পেল। অপ্রতিভের হাসি সে নয়। কৌতুকেরও নয়। কেমন একটা রহস্যময় গম্ভীর বিষন্ন সে হাসি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বয়ম্বর সভা শেষ। সব নৃপতিই স্ব-স্ব রাজ্যে ফিরে গেছেন। কেবল কৃষ্ণই ফেরেননি। পাঞ্চালরাজ যেতে দেননি তাঁকে। কৃষ্ণার বিবাহ পর্যন্ত তাঁকে থাকার অনুরোধ করলেন। অগত্যা, আরও কিছুদিন পাঞ্চালরাজের অতিথি হয়ে থাকতে হল তাঁকে। অবশ্য পাণ্ডবদের সাথে আলাপ-পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত করার জন্য পাঞ্চাল রাজের অনুরোধ সানন্দে গ্রহণ করলেন তিনি। আপন কর্মের সাথীরূপে পেতে চান তাদের। সাম্য, প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার যে রাজনৈতিক আদর্শ তিনি স্থাপন করতে চান, পাণ্ডবেরা যেন তারই রূপকার।

এ-জীবনে কত বীর, ত্যাগী ধার্মিক তিনি দেখেছেন, কিন্তু তাদের কারও সাথে পাণ্ডবদের তুলনা হয় না। এমন আশ্চর্য পৌরুষ, মনীষা, বুদ্ধির দীপ্তি, শক্তি, সাহস, তেজ আর কখনও চোখে পড়েনি। যত তাদের কথা ভাবেন ততই রহস্যাচ্ছন্ন হয় তাঁর দৃষ্টি। তাদের দুঃখ কষ্ট দুর্ভোগের মধ্যে তিনি প্রপীড়িত ভারতবর্ষের এক দুঃসহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি যেন তারাই।

মদগর্বী ঐশ্বর্যলোলুপ, ক্ষমতালোভী, অধার্মিক স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের দম্ভ ও অহংকারে ভারতভূমি জর্জরিত। তাদের অত্যাচার শোষণ, পীড়ন ও নির্যাতনে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনসাধারণ অসহায়, বিপন্ন। প্রকৃতপক্ষে তারা দুর্বল, ভীরু এবং ক্ষমতাহীন। রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস তাদের নেই। তারা শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ। ভাগ্যের হাতে আপনাদের সমর্পণ করে তারা রাজার শাসন ও দণ্ড বহন করে চলে। তাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক সত্তা কিংবা অধিকার পর্যন্ত নেই। রাজার অনুকম্পা এবং অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তারা। এই ঔদাসীন্য এবং ভীরুতাই তাদের দুর্বলতার কারণ। পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্য এই দুঃসহ অবস্থার করুণ পরিণাম।

রাজার ছেলে হয়েও ভিখারী তারা। ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা। সৈন্যবাহিনী তাঁরই তত্ত্বাবধানে। কোষাগার তাঁর অধিকারে। সুতরাং রাজ্যের অধিকার থেকে পাণ্ডবদের বঞ্চিত করা কঠিন হল না তাঁর। রাজ্যহীন হয়ে তারা পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরল। সহায়, সম্বল বলে তাদের কিছু ছিল না। এমনকি থাকার সামান্য আশ্রয় এবং ক্ষুধার অন্ন পর্যন্ত নয়। সম্পূর্ণ পরান্নজীবী। অথচ, কি আশ্চর্য, রাজপুত্রের গর্ব তাদের ছিল না। অন্যায়ভাবে রাজ্যচ্যুত হওয়ার জন্য পিতৃব্যের প্রতি কোন বিদ্বেষ বা বিরাগ পোষণ করে না। কৌরব ভ্রাতাদের প্রতিও নেই কোনো দ্বেষ। আপন অদৃষ্টকেও সেজন্য ধিক্কার দেয় না। আশ্চর্য সাধু পুরুষ তারা। ভাগ্যতাড়িত রাজকুমারদের মধ্যে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি।

পাণ্ডবদের সহিষ্ণুতায় আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। তাদের ক্ষমা করার অসীম শক্তি বিস্মিত করল তাঁকে। তাদের মহত্ত্ব, উদারতার কোন তুলনা খুঁজে পেলেন না। এক আশ্চর্য সুন্দর মানুষ তারা।

দুঃখী, দুর্গত ও অসহায় মানুষের বন্ধু তারা। তাদের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করেছে তারা। বিপদ-আপদ থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য আত্মীয়ের মত বন্ধুর মত তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জীবন পণ করে তাদের জন্য লড়াই করেছে বহুবার। বক রাক্ষস, হিড়িম্ব রাক্ষস বধ করে সাধারণ মানুষকে ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করেছে তারা। পাণ্ডবের বল বীর্য ও সাহসের বশীভূত হয়েছে এইসব সাধারণ মানুষ। তবু লোভের বশবর্তী কিংবা বলবীর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব কিংবা আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেনি কখনও। সাধারণ মানুষের আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে রাজ্য স্থাপনের কার্যে অপব্যবহারও করেনি। এই অসাধারণ চরিত্রবল তাদের। পাণ্ডবদের কথা যত ভাবেন ততই আশ্চর্য হন কৃষ্ণ। এমন নির্লোভী, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী দেবচরিত্রের মানুষ সত্যই কি এই পৃথিবীতে জন্মে?

কৃষ্ণের মনে হল, এক মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য হয়ত বিধাতা সৃষ্টি করেছেন তাদের। মানুষের দুঃখ, কষ্টের অভিজ্ঞতা তাদের জীবনলব্ধ। নির্যাতিত মানব-সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের তারাই অধিকারী! লক্ষ্য মূঢ় মূক মানুষের বুকে বল প্রাণে ভরসা জাগানোর মত প্রেম ও শক্তি আছে পাণ্ডবদের। এই গণদেবতারা তাঁ

সখা। এ কথা ভাবতে শরীর রোমাঞ্চিত হল। এদের সাহায্য ছাড়া অখণ্ড ভারতরাজ্য গঠন তাঁর একার উদ্যমে সম্ভব নয়। সারা ভারতে এদের মত নির্লোভী, ধার্মিক শক্তিশালী মানুষ আর নেই। এরাই পারে অচল, অনড় জনরথ টেনে নিয়ে যেতে। দ্রৌপদীর মত মহীয়সী নারীর সাহচর্যের প্রয়োজন আছে তাদের জীবনে। পঞ্চপাণ্ডবের রাশ শক্ত হাতে ধরার মত ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব আছে এ মেয়ের।

কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়েতে যজ্ঞসেনের অমত। অপর দিকে পঞ্চ-পাণ্ডবও দ্রোপদীকে বিবাহ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সমাধানের সূত্র বার করতে কৃষ্ণ ব্যাসদেবের শরণাপন্ন হলেন। ব্যাসদেব এই বিবাহকে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত বললেন। মুনিকন্যা ব্রাহ্মীর একই সঙ্গে দশজন পতি বরণ এবং গৌতমী জটিলার সাতজন ঋষিকে পতিরূপে গ্রহণ করার পৌরাণিক কাহিনী বলে দ্রুপদকে এই বিবাহে সম্মত করালেন। শুধু তাই নয়, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের পৌরহিত্যও করলেন তিনি।

খুব সমারোহেই বিবাহ সম্পন্ন হল। এই বিবাহে কৃষ্ণসর্বাপেক্ষা খুশী হলেন। দ্রৌপদীর মত নারী রত্ন কারও একার সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়। তাতে বিভেদ বাড়ে। সংসারে সকলের ভোগের অধিকার সমান। সে অধিকার পেলে শান্তি, ঐক্য, সংহতি রক্ষা পায়। প্রীতি ও মৈত্রী অক্ষুণ্ণ থাকে।

হোমাগ্নিসম্ভূত পাবক শিখারূপী দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বের প্রতি কৃষ্ণের অপরিসীম শ্রদ্ধা। তার মনীষা বুদ্ধির দীপ্তিও তুলনাহীন। স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণার নির্ভীক ব্যক্তিত্ব, দৃপ্ত মনোবল ও তেজ প্রকাশের সেই দৃশ্যটি তাঁর চোখের সামনে কেবলই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ধনুর্দ্ধর কর্ণ যখন ক্ষিপ্রহস্তে ধনুতে জ্যা-রোপণ করল তখন কারও মতামতের অপেক্ষা না করেই মুক্ত কণ্ঠে নির্দ্বিধায় তারস্বরে ঘোষণা করল ঃ 'সূতপুত্রে বরিব না কভু"! দ্রৌপদীর সমস্ত দেহ ভঙ্গীমার মধ্যে দৃপ্ত-ব্যক্তিত্ব কর্তৃত্বের সাথে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এক লহমায় মানুষকে স্তম্ভিত ও বশীভূত করার এক অদ্ভুত সহজাত শক্তি ছিল তার মধ্যে। এমন নারীর সাহচার্য ছাড়া বিশাল পৃথিবীর অধিপতি হওয়া যায় না। পাণ্ডবেরা সত্যই ভাগ্যবান!

তারপর এল পিতৃ-পিতামহের রাজ্য হস্তিনাপুরে যাওয়ার আহ্বান। মহামতি বিদুর হস্তিনার বিশেষ দূত হয়ে এলেন দ্রুপদ গৃহে। কুশল বার্তা বিনিময়ের পর বিদুর সবিনয়ে দ্রুপদকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব নিবেদন করলেন। পঞ্চপাণ্ডবের সাথে পাণ্ডুমহিষী এবং পাঞ্চালীকে হস্তিনায় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি। এই অযাচিত আহ্বানে সবাই খুশী হল।

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির প্রীতিবশত সখা কৃষ্ণকে তাদের সাথী হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন না কৃষ্ণ। হওয়া সম্ভব ছিল না! কেননা, এর সঙ্গে রাজনীতি ও কুটনীতি জড়িত ছিল। তাই, হাঁ না কিছুই বললেন না।

যত সময় যাচ্ছিল কৃষ্ণ ততই অস্থির হয়ে পড়লেন। মনের মধ্যে তাঁর নানা প্রশ্ন। অকারণে যাদবদের একজন শত্রুবৃদ্ধি হওয়ার আশংকা তাঁকে কেবলই দ্বিধাগ্রস্ত করছিল। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাই বিলম্ব হল।

এমন সময় একজন চর এসে জানাল যে, দুর্যোধন, কর্ণ শকুনি, দুঃশাসন গুপ্ত উপায়ে পাণ্ডবদের নিগৃহীত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা স্থির করেছে, বন্ধুবেশী কপট হিতাকাঙ্খী চর পাঠিয়ে পাঞ্চালরাজের মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ, দায়িত্বশীল কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত করে পাণ্ডবদের স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ করাবে। অর্থভোগের সুবিধা থেকে পাণ্ডবেরা যাতে বঞ্চিত হয় এবং সৈন্যবাহিনীর উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যাতে না হয়, রাজা দ্রুপদ যাতে বিতৃষ্ণ হয়, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর উপর যাতে বিরাগ পোষণ করে এবং পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাতে বিভেদ সৃষ্টি হয়, দুর্যোধন তারই চেষ্টা করছে।

কৃষ্ণের হাসি পেল। লোভে, হিংসায় উন্মাদ হয়েছে দুর্যোধন। কাণ্ডজ্ঞানহীন না হলে এমন বালসুলভ চিন্তা করে কেউ? এতে তার চরিত্রের নীচতাই প্রকাশ পেল। পাণ্ডবেরা এখন আর বালক নেই। তারা কেউ বুদ্ধিহীন নয়। তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চিন্তা নিতান্তই বালসুলভ, কষ্টকল্পিত চিন্তা! কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রে পাণ্ডবদের প্রতি শত্রুতার যে মনোভাব প্রকাশ পেল তাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। দুর্যোধনের মন থেকে পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধের গ্লানি এখনও মুছে যায় নি। মুছবে বলে মনে হয় না কৃষ্ণের। দুর্যোধনের ঈর্ষা, কর্ণের ক্রোধ, শকুনির কুমন্ত্রণা, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্র স্নেহ যে কোন মুহূর্তে পাণ্ডবদের বিপদ ঘটাতে পারে। রাজ্যলাভের কিছুকাল পরেই হয়ত সেই বিবাদ বা আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। ধৃতরাষ্ট্র বাধ্য হয়ে এবং চাপে পড়ে, বারণাবতে জতুগৃহ দাহের কলংক চাপা দেয়ার জন্যই পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ করল। স্ব-ইচ্ছায় ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়নি। তাই, কৃষ্ণের আশংকা শীঘ্রই হয়ত একটা বড় রকম বিপদ বাধার সম্মুখীন হবে পাণ্ডবেরা। ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছাটা যদি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক হত তাহলে এসব সন্দেহের কোন কারণ থাকত না।

সিংহদুয়ারে সুসজ্জিত রথের নিশানগুলি পত্ পত্ করে উড়ছিল বাতাসে। অশ্বগুলি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়ল। অন্তঃপুরে ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হচ্ছিল। ব্রাহ্মণেরা উচৈঃস্বরে যাত্রা মঙ্গল পাঠ করছিল। মেয়েদের হাসি, হুড়োহুড়ি, লোকজনের কোলাহল এবং বিবিধ বাদ্যধ্বনি কৃষ্ণ শুনতে পাচ্ছিলেন কানে। তবু কর্তব্য স্থির করতে পারলেন না। সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হল তাঁর মন।

পাণ্ডবদের এখন সৈন্য নেই, অস্ত্র নেই, অর্থ নেই, সহায় নেই, বন্ধুরাষ্ট্র নেই। পাঞ্চাল রাজ্যই তাদের একমাত্র ভরসা। অথচ, এই পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করে অর্জ্জুন একদিন তার অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণা দিয়েছিল। সে ক্ষতি পাঞ্চাল রাজ্য এখনও পূরণ করতে পারেনি। অপরপক্ষে, দুর্যোধনের সহায় সম্পদ এবং অর্থের অভাব নেই। বান্ধব তার অনেক। এই অবস্থায় নির্বান্ধব ও নিরস্ত্র পাণ্ডবদের একদল হিংস্র নেকড়ের মুখে ছেড়ে দেওয়া কখনও নিরাপদ নয়। পরম প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির হয়ত বিপদাশংকা করেই তাঁকে আহ্বান করেছেন। যুধিষ্ঠিরের সাথী হলে সমস্ত ব্যাপারটা এক রাজনৈতিক রূপ লাভ করবে। সম্ভবতঃ সেরকম কিছু

ভেবেই যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্য চেয়েছেন। সুতরাং এই অবস্থায় তাঁকে ত্যাগ করা অথবা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হল বন্ধুর সঙ্গে অসহযোগিতা করা। কাজেই, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার ভাবনা ত্যাগ করলেন তিনি। যুধিষ্ঠিরের বন্ধু হওয়ার জন্য কৌরব এবং তাদের অনুগামী বন্ধুরা যদি তাঁর কিংবা যাদবদের শত্রুও হয় তবু বান্ধব পাণ্ডবকে ত্যাগ করবেন না কিছুতে। এজন্য যে-কোন মূল্য দিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

অবশেষে, যুধিষ্ঠিরের সাথে হস্তিনায় যাওয়া স্থির করলেন কৃষ্ণ। পাণ্ডবদের মধ্যে তাঁকে দেখলে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, ভীষ্ম বুঝতে পারবে যে কৃষ্ণ সহ বিশাল যাদব সংঘ পাণ্ডবদের বন্ধু ও সহায়। জরাসন্ধের মত শক্তিশালী সম্রাটও আঠারোবার মথুরা আক্রমণ করে পারেনি জয়লাভ করতে। ব্যর্থতার লজ্জা ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বারংবার তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হয়েছিল। যাদবদের সুশিক্ষিত রণনিপুণ বিশাল সৈন্যবাহিনী পাণ্ডবদের সাহায্যে যে কোন সময়ে এগিয়ে আসতে পারে, এই সত্য জানা থাকলে দুর্যোধনের রাজনৈতিক ধৃষ্ট আচরণ একটু সংযত হবে। পাণ্ডব-দের তৃণজ্ঞানে অবহেলা করতে সাহস পাবে না আর। জরাসন্ধও ঝুঁকবে না তাদের দিকে। জরাসন্ধকে নিষ্ক্রিয় রাখার রাজনৈতিক সাফল্যে পুলকিত হলেন তিনি। যুধিষ্ঠিরের সামান্য সঙ্গী হওয়ার মধ্যে যে এত রাজনৈতিক লাভালাভের জটিল তর্ক জড়িয়ে আছে কৃষ্ণ আগে তা কখনও চিন্তা করেনি।

পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে রথে আরোহণ করলেন কৃষ্ণ। হস্তিনাপুরের দিকে ছুটল রথ। ছবির মত একে একে সরে যাচ্ছিল নগর, গ্রাম, জনপদ, প্রান্তর ও বনভূমি।

কৃষ্ণ অন্যমনস্ক। ধ্যান করার মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন তিনি। আয়ত চোখে তাঁর উদাস নিস্তেজ চাহনি। অপরিহার্য কোন কর্তব্য নির্ধারণের জন্যই যেন চিন্তামগ্ন।

পাণ্ডবেরা তাঁর বন্ধু ও শরণাগত। এজন্য তাদের অমঙ্গলের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হন। ক্ষতির আশংকা করে বিচলিত হন। সর্বদা তাদের নিঃস্বার্থ উপকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত তিনি। চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়ল তাঁর।—সত্যিই কি তাই? মন থেকে জবাব এল—নিশ্চয়ই। তবু সন্দেহ হল। বারংবার মনে হতে লাগল, আসল কথাটা তিনি যেন গোপন করে যাচ্ছেন। নিজের প্রয়োজনেই তাদের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন, এ কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা কেন তাঁর? এ যেন নিজের সাথে নিজেরই ছলনা। যাদব বংশের কেউ তাঁর মনের কথা জানে না। এমনকি বলরামও না। জানিয়ে কোন লাভ হয় না বলেই জানান না। সব কাজই একা করতে হয় তাঁকে। কেউ কোন দায়িত্ব বহন করে না। সকল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার অংশীদার তিনি নিজেই।

সুরা, নারী আর ভোগ বিলাসিতা নিয়ে এত মত্ত তারা যে রাজকার্যে সতর্ক দৃষ্টি নেই। তাদের শৌর্য, বীর্য বল ও বুদ্ধির উপর কৃষ্ণের কোন আস্থা নেই তাদের কেউ আর প্রকৃতিস্থ নয়। নারী, পুরুষ সবাই সুরায় মত্ত। কৃষ্ণের তাই দুর্ভাবনার শেষ নেই। অথচ জরাসন্ধ যে-কোন সময় বড় রকম শত্রুতা করতে পারে।

কংস হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত জরাসন্ধ নিবৃত্ত হবে না। একদিন তার প্রতি-হিংসা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য কৃষ্ণ দ্বারকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। সেস্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য জরাসন্ধ যাদবদের কোন ক্ষতি করতে পারল না। তাই বড় রকমের আক্রমণ সংঘঠিত করার জন্য যে কৃষ্ণদ্বেষী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক জোট গঠন করল। তাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি বর্তমানে যাদব রাষ্ট্রের নেই। আকণ্ঠ ভোগ বিলাসের সুখে নিমগ্ন থাকার জন্য তারা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ছিল। যত দিন যাচ্ছিল, রাজকার্যের সব দায়-দায়িত্ব কৃষ্ণের উপর অর্পণ করে তারা নিশ্চিন্ত মনে ভোগ বিলাসে ডুবে রইল। যাদব ও বৃষ্ণিদের এই অধঃপতনে কৃষ্ণ অত্যন্ত বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত বোধ করেন।

কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃংখলতার ফলে একটা গোটা জাতির পতন আসন্ন হল। অথচ, সেজন্য তাদের কোন দুর্ভাবনা নেই। কৃষ্ণও অত্যন্ত অসহায়। সেজন্য কিছু করার ছিল না তাঁর। বাইরের লোকেরা এসব খবর রাখে না বলেই বড় বিপর্যয় হয়নি এখনও। তবে, এভাবে যাদবদের বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। তাদের নিরপত্তার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী বিশ্বস্ত রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা। নির্দ্বিধায় যারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে সেরূপ বন্ধুও তাদের দরকার। একমাত্র নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নৃপতির কাজেই সেরূপ নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করা যেতে পারে। ধর্মপরায়ণ, প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবেরাই দিতে পারে সেই অকপট বন্ধুত্ব। এই বিশ্বাস নিয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে আশা সফল হয়েছে তাঁর। সুতরাং মনে আর কোনরকম দ্বিধা থাকা উচিত নয় তাঁর। পাণ্ডবদের অকপট বন্ধুত্বের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য তাদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে চললেন।

রথের গতি মন্দীভূত হয়ে এল ক্রমে। কৌরবদের প্রাসাদের ছোট বড় বিভিন্ন পতাকা স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগল। আম্র পল্লব ও পুষ্পমাল্যে শোভিত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ। ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহারথীরা রাজপুরদ্বারের নিকটবর্ত্তী সু-সজ্জিত মঞ্চে পাণ্ডবদের রাজকীয় অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষমান। পাণ্ডবদের রথ সেখানে এসে পৌঁছতেই জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। কোলাহল সাগর তরঙ্গের মত দূর-দূরান্তে প্লাবিত হল। দুন্দুভি বেজে উঠল। উলু দিতে লাগল মেয়েরা। পুরুষরাও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল।

প্রথমে বিদুর, তারপর, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণ হাস্যবদনে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। কতকাল পরে পাণ্ডুপুত্রদের দেখলেন তাঁরা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পান্ডবদের সেই একই অবস্থায়, নিমেষহীন দৃষ্টি, উম্মুক্ত ওষ্ঠে আবদ্ধ নিঃশ্বাস। যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য ভ্রাতারা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপের চরণ বন্দনা করে উঠে দাঁড়াল। তাঁরাও আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন তাদের সঙ্গে। তারপর প্রাথমিক সম্ভাষণ ও কুশলাদি বিনিময় শেষ হল। অপেক্ষামান কৌতূহলী জনতা হস্ত উত্তোলন করে তাদের অভিনন্দন জানাল। তারাও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল।

বিশ্রামের পর কুরুপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যুধিষ্ঠির সভাগৃহে উপস্থিত

হলেন। অন্যান্য ভ্রাতারা এবং কৃষ্ণ তার সঙ্গে রইলেন। সভাসদ পরিবৃত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসে ছিলেন। যুধিষ্ঠির প্রবেশ করতে পাত্র-মিত্র এবং সভাসদ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করল। যুধিষ্ঠির ধীর পদে কম্পিত বক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের পাদপদ্ম বন্দনা করে কৃপাপ্রার্থীর মত যুক্তকরে তার সম্মুখে দাঁড়ালেন।

ধৃতরাষ্ট্রকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তিত মনে হল। যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল। দুই চক্ষুর পল্লব ঘন ঘন কম্পিত হতে লাগল। মুখের পেশী তাঁর ফুলে উঠল। দন্তের পীড়নে শক্ত হল চোয়ালের হাড়। কষ্ট করে কি যেন একটা দমনের চেষ্টা করলেন। সেজন্য তাঁর অধরদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছিল। কয়েকবার ইতস্ততঃ করে ধীরে ধীরে বললেন—বৎস কৌন্তেয়, পিতৃ-পিতামহের রাজ্য থেকে তোমাদের বঞ্চিত করার কোন অভিরুচি আমার নেই। তোমাদের রাজ্য, তোমরাই নেবে, তাতে আমি আপত্তি করব কেন? তবে, সমস্যা অনেক। চন্দ্র ও সূর্য এক আকাশে একই সময় কখনও থাকে না। তেমনি লোকালয় পরিবেষ্টিত এই সমৃদ্ধ নগরীতে দুর্যোধনের সঙ্গে তোমার একত্রে থাকা সম্ভব নয়। তাতে ভাইতে ভাইতে বিবাদ বাধবে। সংঘর্ষ হবে। বৃদ্ধ বয়সে সে দৃশ্য দেখার ইচ্ছা নেই।

এই বলে ধৃতরাষ্ট্র থামলেন। যুধিষ্ঠিরকে চিন্তার অবসর দিয়ে তিনিও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির! এই সাজানো গোছানো নগরী, লোকালয় পূর্ণ জনপদের অধিকার ত্যাগের ইচ্ছা দুর্যোধনের একেবারে নেই। আমারও সেরূপ ইচ্ছা।

আবার চুপ করলেন ধৃতরাষ্ট। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাল। কথা বলতে তাঁর কণ্ঠ বার বার রুদ্ধ হল। ধৃতরাষ্ট্রের অস্বাভাবিক আচরণে পাণ্ডবেরা হতাশ হল। ভীম অজ্জুর্ন অত্যন্ত রুষ্ট হলেন।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ধৃতরাষ্ট্র হতাশ কণ্ঠে বললেন—সব দিক বিবেচনা করে স্থির করলাম খাণ্ডবপ্রস্থের জঙ্গলটা এমনিই পড়ে আছে। ওই বনভূমিটা তোমাদের দিলাম। মনের মত রাজ্যস্থাপন করে সুখে শান্তিতে বাস কর। মহাধনুর্ধর অজ্জুর্ন এবং প্রবল বলশালী বৃকোদর যখন আছে তখন অরণ্যে তোমরা নির্ভয়ে বসবাস করতে পারবে।

ধৃতরাষ্ট্রের শঠতায় আশ্চর্য হলেন যুধিষ্ঠির। পিতৃব্যের ছলনা মর্মাহত করল তাঁকে। সহসা কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না তাঁর। ভীম ও অর্জুন ক্রোধে থর থর করে কাঁপছিল। তাদের সমস্ত মাংসপেশী উত্তেজনায় ফুলে উঠল। নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ ও মুখমণ্ডল ঘৃণায় কুঞ্চিত হল। অসহায়ের মত যুধিষ্ঠির একবার ভাইদের দিকে আর একবার কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকালেন।

সবিনয়ে যুধিষ্ঠির পিতৃব্যের সিদ্ধান্তের মৃদু প্রতিবাদ করে বললেনঃ তাত, কি হেতু পিতৃ-পিতামহের নির্মিত নগরী, জনপদ ও রাজ্যের অর্ধাংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? কোন্ অপরাধে বনবাসী করছেন আমাদের? এই গহন অরণ্য আমাদের কোন্ কাজে লাগবে?

অমনি ভীমনাদে গর্জন করে উঠল বৃকোদর! দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে বলল: আপনি সত্যই অন্ধ অন্তরে-বাইরে। পাণ্ডুপুত্রদের শত্রু মনে করেন আপনি। আপনার স্নেহ-সাম্রাজ্য থেকে আমরা শিশুকাল থেকে বঞ্চিত। তাই, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আবাসভূমিতে নির্বাসিত করে আপনি নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্য ভোগের ফন্দি করছেন।

ভীমের রূঢ় বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর করলেন না ধৃতরাষ্ট্র। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে কৃষ্ণ আশ্চর্যান্বিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্য কোন অভিসন্ধির কথা চিন্তা করে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। নানা জটিল ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়লেন।

অর্জুন প্রতিবাদ করার জন্য উসখুস করছিল। কিন্তু কৃষ্ণের ইঙ্গিতে থামতে হল তাকে। উদ্ভূত অবস্থা মনে মনে পর্যালোচনা করলেন কৃষ্ণ। সব বিচার করে তাঁর মনে হল রাজ্যের অধিকার থেকে পাণ্ডবদের বঞ্চিত করাই ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়। সেই জন্যে এমন অসঙ্গত অবাস্তব হীন প্রস্তাব করল। কারণ, তিনি ভাল করেই জানেন, এরূপ প্রস্তাবে পাণ্ডবেরা রাজী হবে না। তাদের জন্য বিকল্প কিছু করবে বলে মনে হল না কৃষ্ণের। ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিতেই তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডবেরা যদি কোন কারণে এই প্রস্তাবে রাজী না হয় তা'হলে ধৃতরাষ্ট্র তাদের দাবি পুনর্বিবেচনা করবেন না। ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির এবং ভাইদের সূচাগ্র পরিমাণ মেদিনী দিতেও রাজী নয়। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। শুধু তাঁদের সম্মান রক্ষার জন্যেই রাজনৈতিক ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। যুধিষ্ঠির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর অভিসন্ধিই জয়ী হবে। সরলমতি পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের কূটবুদ্ধির মমার্থ উপলব্ধি করেনি বলেই তর্ক করছে। কৃষ্ণ তাই তাদের জন্য চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন।

অধিকার যত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হোক না কেন, তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। অধিকার কেউ দেয় না কাউকে, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। তেমনি ধৃতরাষ্ট্রের সামান্য অনুকম্পার দান তাদের অধিকার অর্জনের পথ সুগম করবে। রাজ্য স্থাপনের দাবি ও অধিকার লাভই এখন তাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই সামান্য অধিকার নিয়েই এখন তাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কারণ বলের দ্বারা এই মুহূর্তে তাদের রাজ্য স্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ। ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রধান। সৈন্যবাহিনী, কোষাগার তাঁরই হাতে। কাজেই, শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই সুযোগে পাণ্ডবদের কোনমতে পরিত্যাগ করা উচিত হবে না। কলহ জমে ওঠার আগেই তিনি বৃকোদরের পৃষ্ঠে স্পর্শ করলেন। কৃষ্ণের নীরব অর্থপূর্ণ দৃষ্টির তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ভীম ও অন্যান্য ভ্রাতারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কৃষ্ণের কাজল কালো চোখে কি এক অপূর্ব তন্ময়তা। আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পঞ্চপাণ্ডবের দিকে। কেমন একটা আত্মস্থ ভাব তাঁর। খাণ্ডবের নির্জন বনভূমিই হবে মহাভারত স্রষ্টাদের জীবনের পাঠশালা। এই নির্জন অরণ্য হবে তাদের আচার্য। এখানে লোভ, ছলনা, প্রতারণা, মাৎসর্য কিছু নেই। বনভূমির সম্রাট যে বনস্পতি, জীবকুলের বন্ধু সে। তাদের একমাত্র আশ্রয়। বনস্পতির

ছায়া দিয়ে, ফল দিয়ে, শাখা-প্রশাখা দিয়ে জীবকুলকে রক্ষা করছে। খাণ্ডবপ্রস্থ সেই শিক্ষাই দেবে পাণ্ডবদের।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার জন্য কৃষ্ণ অনুরোধ করল যুধিষ্ঠিরকে। বললেন: মহাত্মা! কুরুপতি আপনার মঙ্গলের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। প্রতিষ্ঠিত জনপদে বিপদ বাধা লেগেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের আবাসভূমি থেকে বনভূমি অনেক শ্রেয়। সেখানে ঈর্ষা নেই, প্রতারণা নেই, অধর্ম নেই। পতিত বনাঞ্চলে আপনাদের ইচ্ছামত নগর নির্মাণ করতে পারবেন। স্রষ্টার আনন্দ লাভ করবেন। মহারাজের প্রস্তাবে আমাদের রাজী হওয়া উচিত। আপনাদের উন্নতি ও মঙ্গলের কথা ভেবেই পিতৃব্য উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছেন।

কৃষ্ণের বাক্যে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ আশ্চর্য ও অভিভূত হল। ধৃতরাষ্ট্র নিজেও বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণই পাণ্ডবদের দুর্দিনের বন্ধু। একমাত্র হিতৈষী। তাঁর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শকে যুধিষ্ঠির কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। পাণ্ডবদের মঙ্গলের কথা কৃষ্ণের চেয়ে অন্য কেউ বেশি ভাবে না। এমনকি স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরও নন। কৃষ্ণ যে চিন্তা করেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মতি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে যুধিষ্ঠির তা জানেন। সুতরাং চিন্তা না করেই তিনি হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণের নির্দেশ অনুমোদন করলেন।

রাজাজ্ঞা লাভ করে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা কুন্তী অন্যান্য ভ্রাতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করলেন। পাহাড় জঙ্গল বেষ্টিত এই স্থান অত্যন্ত মনোরম। চতুর্দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য। পার্বত্য প্রদেশের মধ্যে মধ্যে অনেকখানি সমতলভূমি আছে। বাসগৃহ নির্মাণের পক্ষে খুবই উপযোগী। স্থানে স্থানে নির্ঝরিণী থাকায় পাণীয় জলের অপ্রাচুর্য নেই। ঘন জঙ্গল ও পাহাড় বেষ্টিত এই অঞ্চলের একটিমাত্র প্রবেশ পথ।

পঞ্চপাণ্ডব সহ কৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে দেখলেন সমগ্র অঞ্চলটি। যত দেখছেন ততই আশ্চর্য হচ্ছেন। এর ভৌগলিক অবস্থান রাজনীতির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড় ও জঙ্গলের জন্য শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনা খুবই কম। প্রবেশপথ একটি থাকায় পাহারার খুব সুবিধা হল।

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রজাপত্তনের জন্য বিভিন্ন বর্ণের ও শ্রেণীর আবাসভূমি চিহ্নিত হল। গোপালন, কৃষি-কর্মের জন্য স্থান নির্বাচন করা হল। শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা দেশ যাতে প্রভূত সম্পদশালী হতে পারে তারও ব্যবস্থা নেয়া হল। দেখতে দেখতে খাণ্ডবপ্রস্থের চেহারা বদলে গেল। নবরূপে নবসাজে আত্মপ্রকাশ করল নগরী। ব্যাসদেবের বর্ণনায় তার চিত্ররূপ হল;

'সে নগর সাগরতুল্য বৃহৎ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত হইল এবং শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতাল গঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় চন্দ্র ও পাণ্ডুবর্ণ মেঘসদৃশ গগনতল ব্যাপিনী প্রাকার শ্রেণীতে শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সৌধ সকল কপাট-বিশিষ্ট বিস্তৃত দ্বার দ্বারা বিস্তৃতপক্ষ গরুড়ের শোভা ধারণ করিল! ঐ পুরশ্রেষ্ঠ মেঘবৃন্দ ও মন্দার পর্বত সদৃশ সুসংবৃত অস্ত্রযুক্ত দুর্ভেদ্য দুর্গ সমূহের মত সুরক্ষিত হইল। এবং স্থানে স্থানে দ্বিজিহব পন্নগ সদৃশ শক্তি নামক অস্ত্রসমূহে সমাবৃত, অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত

অট্টালিকা-পুঞ্জে সুশোভিত যোধগণ কর্তৃক, রক্ষিত, তীক্ষ্ম অঙ্কুশ সকল, এককালে শত শত মনুষ্যের প্রাণঘাতক শতঘ্নী নামক অস্ত্রযুক্ত যন্ত্রজাল ও লৌহময় মহাচক্রে শোভিত হইল। পথ সকল প্রশস্ত ও সুবিভক্তরূপে নির্মিত হইল। ঐ নগর পাণ্ডুবর্ণ নানাবিধ পরমোৎকৃষ্ট অট্টালিকা মণ্ডলীতে পরিদীপ্যমান হইয়া অমর ভুবনের ন্যায় শোভমান হওয়াতে "ইন্দ্রপ্রস্থ" বলিয়া প্রকাশিত হইল। এতাদৃশ নগর মধ্যে রমণীয় কল্যাণকর স্থানে পাণ্ডবদের ধনপরিপূর্ণ ধনপতিসদৃশ প্রাসাদমণ্ডলী নভোমণ্ডলস্থ তড়িৎমালা সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।'

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভাস কৃষ্ণের প্রিয় স্থান। সমুদ্রোপকূলবর্তী এই স্থানটি প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। এখানকার স্নিগ্ধ বাতাস, নির্জন সমুদ্রতীর উন্মুক্ত নীল আকাশ, দিগন্ত লীন সমুদ্রের বিস্তার ও বিশালতা তাঁর ভাল লাগে। প্রভাস কৃষ্ণের বিশ্রামের ক্ষেত্র। এখানে আসেন অবকাশের আনন্দ উপভোগের জন্য, চিত্তের অশান্তি দূর করার জন্য। জট পাকানো জীবনের গভীর জটিল রহস্যের অনুসন্ধানের জন্য। এ এক আশ্বর্য সুন্দর জায়গা! স্বাদু প্রতি পদে পদে।

কৃষ্ণ সর্বক্ষণ থাকেন না এখানে। মাঝে মাঝে আসেন। কিছুদিন অবস্থান করে আবার ফিরে যান রৈবতকে। প্রিয়তমা স্ত্রী সত্যভামাকে নিয়েই বাস করেন এখানে। কৃষ্ণের নিঃসঙ্গ ও ক্লান্ত জীবনের একমাত্র প্রিয় সাথী তিনি। চন্দ্র কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ, মনোরম তাঁর সান্নিধ্য। তাঁর সাহায্য ছাড়া কৃষ্ণের চলে না একদণ্ড।

প্রশস্ত অলিন্দের একপ্রান্তে স্ফটিক নির্মিত বেদীতে কৃষ্ণ বসে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি দূর সমুদ্রের দিকে নিবদ্ধ।

কৃষ্ণকে একলা বসে থাকতে দেখে সত্যভামা এগিয়ে গেলেন সেদিকে। তন্ময় হয়ে চিন্তা করছিলেন কৃষ্ণ। তাই, সত্যভামা কখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল, জানতে পারলেন না। প্রভাসে আসলে কৃষ্ণ কেমন যেন হয়ে যান। ধরাছোঁয়ার বাইরে সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর কাছে যেতে বুক কাঁপে। কথা বলে সাড়া নিতে ভয় করে। কৃষ্ণের উপর তখন সত্যভামার দারুণ অভিমান হয়। কৃষ্ণের এরূপ আচরণের জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়। কৃষ্ণের প্রশান্ত মুখমণ্ডল ও স্থির শান্ত দুনয়নে এমনই একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে যে, তাকে কিছুতে উপেক্ষা করে থাকা যায় না। রাগ, অভিমান আপনা থেকে শিথিল হয়ে পড়ে। স্বামী তাঁর সাধারণ পুরুষ নয়; এ কথা মনে হলে, বুকের মধ্যে শুরু হয় এক অস্থির আলোড়ন। তখন আর অভিমান থাকে না। আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হয় মন।

মাথার উপর হাত রাখতেই চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন

সত্যভামার দিকে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সত্যভামা বললেন: বাব্বাঃ! সমুদ্রের তল আছে, পার আছে তার। কিন্তু তোমার চিন্তা ভাবনার কোন শেষ নেই। তোমাকে বোঝার সাধ্যও নেই আমার। এক অদ্ভুত মানুষ তুমি।

রহস্যগম্ভীর চোখের তারায় এক আশ্চর্য কৌতুক হাস্যের মাধুর্য সৃষ্টি করলেন কৃষ্ণ। ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন: তুমি আরও অদ্ভুত! বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি।

প্রেম মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসেন সত্যভামা। প্রসন্ন কৌতুকে তাঁর মুখমণ্ডল হল স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময়। কৃষ্ণের অধরোষ্ঠে মৃদু-মধুর হাস্যরেখাটি এক অপূর্ব ছন্দে ফুটে উঠেছিল।

কিছুকাল নীরব থাকার পর কৃষ্ণ পুনরায় বললেন—এখানে এসেছি বিশ্রামের জন্য। কিছুদিন দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে থাকার জন্য। কিন্তু ভুলতে পারছি কই? কেবলই মনে হয়, আমরা মানে এই যদুবংশীয়েরা, কত অসহায় আজ! চারদিকে শুধুই শত্রু। মিত্র বলতে কেউ নেই। পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর ভারতে এমন একটি রাষ্ট্র নেই যাকে বন্ধু বলে দাবি আমরা করতে পারি। অথচ, অগ্রজ বলরাম থেকে কোন যাদব প্রধানই সে-কথা চিন্তা করেন না। সুরা আর নারীতে তাঁরা এতই মত্ত যে রাজকর্তব্য ভুলে গেছেন। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধেও উদাসীন তাঁরা।

স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে সত্যভামা বলল—তুমি কী বলছ স্বামী! যাদবেরা তোমাকে ছাড়া যে কাউকে জানে না। তোমায় তারা সর্বস্ব সমর্পণ করে নিশ্চিন্তে কাল যাপন করছে। তাদের মঙ্গল চিন্তা তো তোমারাই কাজ।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। প্রিয়তমা পত্নীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললেন: ওগো সখি! জীবনের দীপখানি না জ্বালালে আমার একার সাধ্য নেই তাকে জ্বালিয়ে রাখি।

শিশুর মত অবোধ চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন সত্যভামা—কেন?

অবাক হলেন কৃষ্ণ।

সত্যভামার চটুল চাহনি অনুসরণ করে সকৌতুকে বললেন: বলিতে বাধা নাই প্রিয়ে। ভয় শুধু বিধবা হইবে পাছে।

একটুও বিচলিত হলেন না সত্যভামা। নিবিড় বাহুপাশে স্বামীর গলদেশ ধারণ করে সকৌতুকে বললেন: ভয় করি না তোমার মুখের বচন। স্বামী আমার বিপদভঞ্জন মধুসূদন।

সত্যভামার এই সরল বিশ্বাস ভাল লাগে কৃষ্ণের। সোহাগ জড়িত কণ্ঠে বললেন: এত জান তুমি, শুধু জান না শত্রু জরাসন্ধেরে। আমি যে সখি ভয় করি তাহারে। সে আমার ভয়ংকর শত্রু এই ভবে। মহাবল পরাক্রান্ত ভারত নৃপতি সব, মহারাজ জরাসন্ধের অনুগত বান্ধব। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করি, হয়েছে তারা আমাদের অরি।

হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। প্রগলভতা স্তব্ধ হয়ে গেল। চাহনি গেল

বদলে। চোখের দৃষ্টি হল রহস্যাচ্ছন্ন। সত্যভামার কটি হতে তাঁর বাহু স্খলিত হল। কৃষ্ণের এই ভাবান্তরের সঙ্গে সত্যভামা পরিচিত। এ সময় একা থাকতে ভালবাসেন তিনি। তাই সত্যভামাকে মনের দুঃখে প্রস্থান করতে হল।

কৃষ্ণ ভাবছিলেন, অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন সাম্য, প্রেম, মৈত্রী, শান্তি, সহযোগিতা ও সহবস্থানের এক রাজনৈতিক মঞ্চ স্থাপন করা। এই কার্য সফল হতে হলে অর্জুনের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, মনীষা ও বাহুবলের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। অর্জুনের অসামান্য লোকচরিত্র জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিতে পারে সাফল্যের গৌরব।

অনেক কাল অর্জুনের সাথে দেখা হয় না তাঁর। এক অসহায় ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করতে হল তাকে। কিন্তু দ্বাদশ বৎসর বনে অতিবাহিত না করে ভ্রমণ প্রিয় অর্জুন ঘুরে বেড়ালো বিভিন্ন দেশ। সমগ্র পূর্বাঞ্চল ঘুরে দক্ষিণদেশ হয়ে সে এল পশ্চিম সাগর তীরে সৌরাষ্ট্রে। চরের মুখে সে সংবাদ পূর্বেই পেয়েছিলেন কৃষ্ণ। এবং সেই মত তাকে প্রীতি অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রভাসে এলেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার সমস্ত সুফল কৃষ্ণের হস্তগত। কিন্তু সেটুকু সব নয়। রাজনৈতিক জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যাদব ও পাণ্ডবদের মৈত্রী সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া দরকার। পাণ্ডবদের জনপ্রিয়তা লোকরঞ্জনের ক্ষমতা, বীর্যবত্তা, সত্যনিষ্ঠা এবং ধর্মপরায়ণতা খ্যাতি ও গৌরবকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগানোর জন্য কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে এক নিবিড় আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপনের কথা বিশেষ করে চিন্তা করছিলেন। মধুভাষিণী মিষ্ট চরিত্রের মেয়ে, ভগিনী সুভদ্রাকে তাঁর বারংবার মনে পড়ল। রূপে-গুণে অর্জুনের যোগ্য সে। তার মত স্ত্রীরত্ন লাভ করলে অর্জুনও ধন্য হবে।

পথ ক্লান্ত অর্জুনকে সঙ্গে করে সত্যভামা তঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত বিহ্বল কৃষ্ণ। মুগ্ধ দৃষ্টি তাঁর চুম্বকের মতই আকর্ষণ করছিল অর্জুনকে। নির্বাক বিস্ময়ে অর্জুনও তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। বিস্ময়ের পর উভয়ের অধরকোণে সঞ্চারিত হল প্রীতিস্নিগ্ধ হাসি।

অর্জুনের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন কৃষ্ণ। তারপর, হাত ধরে পাশে বসালেন তাকে। কুশল প্রশ্নাদি জিগ্যেস করলেন একে একে। কিন্তু অর্জুন অনেক কিছুই বলার জন্য উৎসুক। কৃষ্ণ তাকে নিরস্ত করে বললেনঃ প্রিয়তম বন্ধু আমার। ও-সব কথা এখন থাক। দীর্ঘ পর্যটনে শ্রান্ত তুমি। এখন দরকার তোমার বিশ্রামের। বিশ্রামান্তে তোমার অভিজ্ঞতার গল্প শুনব। এখন বিশ্রামে যাও।

সম্মতির অপেক্ষা না করেই হাত ধরে তুলে দিলেন তাকে।

রাত্রে পাশাপাশি দুই বন্ধু শয়ন করলেন। কত কথা মনে পড়ল অর্জুনের কিন্তু সেসব এখন শুধু স্মৃতি, শুধুই স্বপ্ন! গঙ্গাতীরে নাগরাজ কৌরবের দুহিতা উলুপীর নিঃসংকোচ প্রেম নিবেদন, আত্মদান সেবাযত্নের অভিজ্ঞতা কিছুই ভোলেনি

অর্জুন। ভোলা যায় না বলেই বোধ হয় গাঁথা হয়ে গেছে। আদিম আর্য-কন্যা উলুপীর সাহসিকতা এবং সরলতার বিস্ময় এখনও অর্জুনকে পুলকিত করে। এদের আক্রমণ-কৌশল, সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতি, বন্দীর প্রতি মমতাপূর্ণ মানবিক ব্যবহার প্রভৃতি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী ও বর্ণনা কৃষ্ণকে শোনালেন অর্জুন। আপন মনেই আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন কৃষ্ণ।

অর্জুনের প্রসন্ন চোখ দুটিতে চাঞ্চল্য জাগল! বলতে বলতে চক্ষুদ্বয় তার আবেগে দীপ্ত হল।

তারপর গঙ্গা পিছনে রেখে পার্বত্য অঞ্চল ধরে আরও পূর্বদিকে গেলাম। অকস্মাৎ এক আশ্চর্য দৃশ্য নয়নগোচর হল আমার। অশ্বারূঢ় পরমাসুন্দরী সুগঠিত দেহ, পীনপয়োধরা উন্নত গ্রীবা এক রমণী রাজ-পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে সংকীর্ণ পার্বত্য পথ দিয়ে দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচলনা করে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম আমি। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য ইতিপূর্বে দেখেনি কখনও। বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি এই রমণী। বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেলাম। বীর্যবান পুরুষের মত ঋজু, অনায়াস রণকুশলী যোদ্ধার ভঙ্গী তার। অথচ কি এক আশ্চর্য সুকুমার দেহকান্তি তার। পুষ্পের মত পেলব ও কোমল তার দেহবল্লরী।

বলতে বলতে অর্জুন ক্ষণকালের জন্য মৌন হয়ে গেল। মেয়েটির পটুতা তার নয়নপটে বার বার প্রতিভাত হতে লাগল। অর্জুনের নীরবতা এবং আত্মবিস্মৃত ভাব তন্ময়তা নিয়ে একটু কৌতুক করার ইচ্ছা হল কৃষ্ণের। বললেনঃ সখার ব্রহ্মচর্য কি ভুবনমোহিনী কোন রমণীর কটাক্ষবাণে অবশেষে বিঘ্ন হল?

কৃষ্ণের ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ হল অর্জুনের হৃদয়। সম্বিৎ ফিরে পেলে দেখলেন কৃষ্ণের কৌতূহলী দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। অর্জুন অত্যন্ত লজ্জা পেল। স্মিতহাস্যে অধর যুগল প্রসারিত করে বলল—পুরুষের বেশে যুবরাজের মত রাজ্যশাসন করেন মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা! বিধাতার কর্মশালায় এক অপূর্ব সৃষ্টি সে।

কৃষ্ণের চোখেমুখে কৌতুক। ব্যঙ্গে তার মর্মস্থান বিদ্ধ করার জন্য কথাগুলি টেনে টেনে বিস্তৃত করে বললেনঃ প্রিয় সখী কৃষ্ণা অপেক্ষা কি অতুলনীয়া সুন্দরী তিনি! অসামান্যা!

কৃষ্ণের বিদ্রূপবাক্যে বিব্রত হল অর্জুন। কিন্তু সেজন্য তার আচরণে কোন কুণ্ঠার ভাব প্রকাশ পেল না। নিঃসকোচেই সে তার জীবন বৃত্তান্ত বলতে লাগল। কোমলে-কঠোরে, আবেগে-সংযমে, প্রেম-ত্যাগে, কর্তব্যে ও সেবায় অভিনব সে জীবন। তার তুলনা সে নিজেই। মণিপুর রাজ চিত্রবাহণের কাছে তাঁর প্রিয়দর্শিনী তথা চিত্রাঙ্গদার পাণি প্রার্থনা করলাম। কঠিন শর্ত মেনে তার ভর্ত্তা হলাম। সিংহের সিংহিনী সে। তাকে জীবনসঙ্গিনী না পেলে অনেক কিছুই অজ্ঞাত থেকে যেত। রাজকার্যে, রাজনীতিতে এবং যুদ্ধবিদ্যায় সে যেমন পারদর্শিনী তেমনি কুটবুদ্ধিও তার অধিগত। সে শুধু বীরাঙ্গনা নয়। গৃহকর্মে নিপুণাও বটে। দ্রৌপদী প্রেয়সী। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বন্ধু। সে পার্শ্ব সহচর। সর্বকার্যে জীবনসঙ্গিনী হওয়ার যোগ্য সে।

মনে মনে অনেক কিছু পুঙখানুপুঙখ বিচার করলেন কৃষ্ণ। যেন হিসাবের অঙ্ক

মিলিয়ে নিলেন। উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার পুত্রেরা যথাক্রমে নাগরাজ ও মনিপুরের ভাবী উত্তরাধিকার। পরিণয়সূত্রে তারা লাভ করল দুটি পূর্বদেশীয় রাজ্য। বিনা যুদ্ধেই পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত তাদের রাজ্য ও শক্তি বিস্তার করল। তৃতীয় পাণ্ডবের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা খুশী করল কৃষ্ণকে। অর্জুনের ভ্রমণের কথা যত চিন্তা করেন ততই তাঁর দৃষ্টি রহসাচ্ছন্ন হল।

পর্যটকের বেশে অর্জুন সমুদ্রতীর ধরে পূর্ব থেকে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে যাত্রা করেছে। প্রায় গোটা ভারতভূমি পরিক্রমা করেছে সে।

ভ্রমণটা তার চাতুরী মাত্র। আসলে নির্বান্ধব পাণ্ডবের মিত্র ও সমর্থক সংগ্রহ করা ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ও সৌভ্রাত্র স্থাপন করল। অথচ কোন শত্রু জানতে পারল না তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের সাফল্য।

দুর্যোধনের অভিসন্ধি যে মোটেই ভাল নয়, অর্জুন তা জানে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে এক বৃহৎ সংঘর্ষের আশংকা করছে। তাই অর্জুন প্রতিরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেই কর্ম ও নীতি নির্ধারণ করল। আর্যাবর্তে নবগঠিত পাণ্ডব রাজ্যের মিত্র হওয়া অনেক নৃপতির পক্ষেই অসম্ভব ছিল। এদের অনেকে জরাসন্ধের শক্তি শিবিরের সঙ্গে যুক্ত। নিরপেক্ষ রাজ্যগুলির পক্ষে জরাসন্ধের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করা কার্যতঃ বিপজ্জনক ছিল। এই অবস্থায় দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্বদেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সে যাত্রা করল। অর্জুনের সফরের ফলে, আর্যাবর্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সেখানকার পরাক্রমশালী নৃপতিবর্গের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি সম্বন্ধে এঁরা অবহিত হলেন। আর্যাবর্তের বাইরে প্রসারিত হল পাণ্ডবদের রাজনীতি ও গৌরব। অর্জুনের কাছে রাজ্য শুধু বাহুবলের সামগ্রী নয়। প্রীতিবলের দ্বারাও সে রাজ্য বহুদূর সম্প্রসারিত করা যায়। অর্জুন বিভিন্ন দেশ ঘুরে তার এক রাজনৈতিক আদর্শ স্থাপন করল। প্রীতি ও মৈত্রী কখনও প্রভুত্ব বিস্তার করে না। প্রভাবিত করে। বিজিতকে পদানত করা অর্জুনের রাজধর্ম নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করা, সমমর্যাদা দান করা, সংস্কৃতির বিনিময় করা, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করা পাণ্ডবদের রাজনৈতিক আদর্শ ও অন্যতম রাজধর্ম বলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জানল। রাজনীতির সঙ্গে হৃদয়ধর্ম যুক্ত করে অর্জুন এক নয়া রাজনীতিবাদ প্রবর্তন করল। অর্জুনের অনুসৃত নীতি 'দূরকে করিল নিকট বন্ধু পরকে করিল ভাই।' অর্জুনের এই সাফল্যের জন্য কৃষ্ণ গর্ববোধ করলেন। অখণ্ড ভারত রাজ্য গঠনের যে পরিকল্পনা তাঁর মনে রয়েছে অর্জুন যেন তারই এক বিজয় অভিযান সমাপ্ত করে ঘরে ফিরল।

অর্জুনের পর্যটন যে এমন রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করবে, কৃষ্ণ ভাবতে পারেননি কখনও। অর্জুনের এই অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য মনে মনে সহস্রবার ধন্যবাদ দিলেন তাকে।

পথশ্রান্ত অর্জুন গল্প বলতে বলতে একসময় নিদ্রাভিভূত হল। কিন্তু কৃষ্ণার চোখে নিদ্রা নেই। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নিদ্রিত অর্জুনের অনাবৃত সুঠাম

দেহের দিকে। মুগ্ধতার দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। সন্ধ্যাদীপশিখার মত স্নিগ্ধ, শান্ত লাবণ্যময়ী আপন সহোদরার নিষ্পাপ মুখখানি যেন নিদ্রিত অর্জুনের মুখাবয়বে প্রতিভাত হতে দেখলেন কৃষ্ণ। বিস্ময়ের অবধি রইল না তাঁর। মনে মনে বললেন ঃ সবই বিধি-নির্বন্ধ তাহলে। তবু, মনে হল বাধা অনেক।

অর্জুনের সমগ্র যাদবকুল এখনও ভাল করে জানে না। যাদবদের অনেকেই পান্ডুপুত্রদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে না। পান্ডবদের তারা দীনহীন ভিখারী বনবাসী বলেই জানে। ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে তাদের কোন রাজকীয় মর্যাদা ও গৌরব নেই। বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠত্বের আত্মাভিমানই সুভদ্রা ও অর্জুনের পরিণয়ের একমাত্র অন্তরায়। এ বাধা উত্তীর্ণ হওয়া খুবই কঠিন। কৃষ্ণ নিজেও জানেন, যাদব প্রধানেরা কেউই সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ অনুমোদন করবেন না। তথাপি কৃষ্ণের মনে হল, বিধাতা যেন সবার অলক্ষ্যে এই অসম্ভব মিলনকে খুবই আকস্মিক এবং দ্রুত সম্পন্ন করার কাজে ব্যস্ত আছেন।

কৃষ্ণের পরামর্শে, যাদব রাজ্যগুলি সম্মিলিতভাবে রাজধানী দ্বারকায় অর্জুনকে রাজনৈতিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের এক বিরাট আয়োজন করল। অর্জুন অবশ্য তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। যাদবদের মনে তার সম্পর্কে প্রীতি মিশ্রিত বিস্ময় ও সম্ভ্রমবোধ জাগানোর জন্যই কৃষ্ণ এই অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। এর ফলে, অর্জুন সম্বন্ধে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সকলের জানা ও চেনা সহজ হবে তাকে। এবং সে যে একজন সা... মানুষ নয় এই প্রতীতি জন্মাবে তাদের মনে। তাহলেই একটা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হবে সকলের অন্তরে। অর্জুনের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ গড়ে উঠবার আগেই যাদবেরা তাকে হৃদয়ের বন্ধু ও আত্মীয় বলে গ্রহণ করবে। তারপর, রৈবতকের ধর্মোৎসব। মেলামেশার উন্মুক্ত পরিবেশে সুভদ্রা ও অর্জুনের মিলন রাগিনীর সুর হয়ত বেজে উঠবে। জীবন জীবনে যোগ করার আহ্বান হয়ত সব নিষেধ ও শাসনের প্রাচীর ভেঙে ধূলিসাৎ করবে।

প্রভাসে কয়েকদিন বিশ্রাম উপভোগের পর কৃষ্ণ তাকে নিয়ে দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন। রথ যখন দ্বারকায় দ্বারদেশে পৌঁছল তখন অর্জুন বুঝতে পারল যে যাদবেরা তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য রাজপথ, নগর, বিপণি, গৃহ, পত্র-পুষ্পে ও পতাকায় সজ্জিত করেছে। নগরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে বড় বড় তোরণ নির্মিত হয়েছে। পথিপার্শ্বের গৃহগুলিও সুচারুরূপে সজ্জিত করা হয়েছে। অপেক্ষামান নারীরা শঙ্খধ্বনি করছে, উলু দিচ্ছে। পুষ্প বর্ষণ করছে।

কাঞ্চন নির্মিত রথে কৃষ্ণের পার্শ্বে অর্জুনকে উপবিষ্ট দেখে জনতা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল। হাজার অর্জুনের জয়ধ্বনি দিল। সে ধ্বনি পুনরুচ্চারিত হতে হতে বহুদূর পর্যন্ত কল্লোলিত হল। আবেগ ও উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে দুলে উঠল জনতার সমুদ্র। মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধ্বে উত্তোলিত করে তারা হর্ষ ও উল্লাস প্রকাশ করল। অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্য হল নিজেরা। বিস্ময়ে বিহ্বল হল অর্জুন। অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্য হল নিজেরা। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল চিত্ত। অন্ধক, সাত্বত, কুকুর, বৃষ্ণি বংশীয়দের অত্যন্ত প্রিয় আপনজন

মনে হল তার। ক্ষণে ক্ষণে সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তবু এই সম্বর্ধনার অর্জুন বিব্রত বোধ করল। লাজ-নম্র কণ্ঠে বলল ঃ সখা, কি হেতু এই র্ধনার আয়োজন!

মনের ভাব গোপন করে কৃষ্ণ বললেন, যাদবদের আত্মীয় তুমি! বহুদিন পর দেশ প্রত্যাগত হয়েছ। তাই, তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ঘরের ছেলেকে বরণ করার ন্য আয়োজন করেছে।

কিন্তু সখা, জনতার জয়ধ্বনি যে আমার রাজ্য জয়ের গৌরব বহন করছে। কিন্তু মি তো কোন বিজয়লাভ করিনি। তবে এ বিজয় সম্বর্ধনা কেন?

বাসুদেবের অধরে প্রসন্ন কৌতুক হাসি। স্বগতোক্তির মত করে বলল ঃ তোমার যদি সেই প্রশ্ন জাগে তাহলে অকারণে তোমার কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। দেশে শ ভ্রমণ করে তুমি তাদের চিত্ত জয় করেছ, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব ও মৈত্রী ন করেছ, তাদের অনেকের সঙ্গে তোমার বিখ্যাত বংশের রক্তধারার সংযোগ ছে। বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষের এক বিরাট অঞ্চল হৃদয়ের দ্বারা জয় করেছ। সহস্র যুদ্ধে, অজস্র লোকক্ষয়ে যা না হতে পারত, তোমার একার চেষ্টায় তার বেশি সম্পন্ন হয়েছে। এর চেয়ে বড় বিজয় আর কিছু আছে? তোমার ল্য ও কৃতিত্বে খুশী হয়ে তারা এই সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে।

ভাবাবেগে অর্জ্জুনের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। বিস্ফারিত নয়নদ্বয় বিস্ময়াভিভূত হল। বাক দৃষ্টি আরও অবাকতর করে কৃষ্ণের দিকে এক[illegible] কিয়ে রইল।

বিজয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য অর্জ্জুনকে দ্বারকায় এনেছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু রৈবতক ন্বন্ধে কৃষ্ণের কৌতূহল অধিক! সেখানে এখন উৎসবের জোয়ার। প্রশস্ত পথগুলি নাকীর্ণ। পথ পার্শ্বস্থ পানশালাগুলিতে মত্ত নর-নারীর ভীড়। সুরাপানের জন্য স্ত তারা। পথে অসংখ্য চলমান শিবিকা, রথ ও অন্যান্য যানবাহনে পরিপূর্ণ। থারীদের নিরাপত্তা উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারী কোন বীর সৈনিক দ্রুতগতিতে শকট য়ে গেল। যুবা ও প্রাচীন পুরুষ ও নারী কটিদেশ ধারণ করে, স্কন্ধে হস্ত করে নির্লজ্জের মত আনন্দ উপভোগ করছিল। লালসাচটুল বারবিলাসিনীদের র কটাক্ষের দীপ্তি, পুরস্ত্রীদের কজ্জললিপ্ত চক্ষের বিলোল চাহনি, উচ্ছ্বসিত র তরঙ্গ, দৃষ্টিকটু বেশবাস, শালীনতাবিহীন বক্ষবাস, পুরুষ ও নারীর অসংযম ংখল আচরণ অর্জুনকে বিস্মিত করল। সারা ভারত প্রদক্ষিণ করেও এমন জ্ঞতা সঞ্চার করেনি সে, এ এক বিচিত্র অদ্ভুত মত্ততা।

জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে অর্জুন মেলার মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে াচ্ছিল। অল্প বয়স্ক কতিপয় তরুণ পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে একটি দ্রুতগামী সজ্জিত শকটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছিল। তাদের লি অনুসরণ করে অর্জুন সেদিকে তাকাল। দেখল, সত্যভামা ও অন্যান্য ঙ্গনাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে একটি সুদর্শনা, মনোরমা, কিশোরীও চলেছে পুজার করণ বহন করে। কিশোরীটির শান্ত, স্নিগ্ধ কমনীয় রূপ ও লাবণ্যে বিমোহিত অর্জ্জুন। কন্দর্পবাণে জর্জরিত হল সে। স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকল তার গন্তব্য পথের দিকে। কন্যাটিও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে কৌতূহলী যুবা-পুরুষটিকে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারল না। তার সুগঠিত তনু, অপরূপ দেহলাবণ্য পলকে মুগ্ধ করল আঁখিদ্বয়। কন্যারগতি রুদ্ধ হল। তার সরল নিষ্পাপ মুখের স্নিগ্ধ চাহনি চুম্বকের মত আকর্ষণ করল অর্জ্জুনকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পরস্পরের দিকে তারা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ সবই লক্ষ্য করলেন। পশ্চাৎ থেকে তার স্কন্ধ স্পর্শ করলেন। অমনি শিহরিত হল অর্জ্জুনের কলেবর। কৃষ্ণকে দেখে বিস্মিত ও বিহ্বল হল অর্জুন। লজ্জায় রক্তিম হল তার মুখমণ্ডল। বিনম্র লজ্জায় কণ্ঠস্বর তার কোমল হল। বলল—এঁকে তুমি চেন সখা?

চিনি। আমারই ভগিনী। নাম সুভদ্রা।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হল অর্জুনের। আপনাকে ধিক্কার দিল সে। ছিঃ ছিঃ একি করল সে। কৃষ্ণ কি ভাবল তাকে? বিশ্রী লাগল তার কিছুতে প্রবোধ দিতে পারল না মনকে। কেবলই একটা অপরাধবোধ তাকে অহরঃ পীড়া দিতে লাগল। অর্জুনকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখে কৃষ্ণ বললেন—সুভদ্রা অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। সন্ধ্যাদীপের মত স্নিগ্ধ, শান্ত, নম্র। মধুরতর তা সান্নিধ্য।

ললনাপ্রিয় অর্জুন লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাল কৃষ্ণের মুখের দিকে। কৃ... চিত্ত-দৌর্বল্যের জন্য সখা তাকে নিয়ে পরিহাস করছে কিনা বুঝতে চেষ্টা কর। ঈষৎ বক্র কৌতুক হাস্যে কৃষ্ণের অধর বিস্তৃত হল। ধীরে ধীরে বললেন: সখা আমার ভগিনীতে অনুরক্ত? অবশ্য, ভগিনী আমার অনুরক্তা কি না জানি না। পি যদি সুভদ্রার সাথে সখার বিবাহে অসম্মত হয়, তা হলে? সুভদ্রাকে বধূরূপে লাভ করার জন্য সখা কোন পথ গ্রহণ করবে? ভেবে স্থির করতে হবে তোমায়। তবে সাবধান! কোন ঝুঁকি না নিয়েই সুভদ্রাকে জয় করতে হবে। আমার শুভেচ্ছা ও সাহায্যের কখনও অভাব হবে না।

চলতে চলতে তারা প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হল। অর্জুনকে তার কক্ষে পৌঁছে দিয়ে কৃষ্ণ অন্যত্র গমন করলেন।

সুভদ্রার আকর্ষণ ক্রমে দুঃসহ হল অর্জুনের কাছে। মনে হল, এমন নারীকে সহধর্মিনীরূপে না পেলে জীবন নিরর্থক হবে। নিঃসঙ্গ জীবনের বড় সাথী মনে হল তাকে। শূন্যতার যন্ত্রণা, নিঃস্বতার দুঃখ ভোলানোর মন্ত্র যেন তার অধি...। কিন্তু তাকে লাভ করার বাধা অনেক। ধনুর্দ্ধর অর্জুনের কাছে কন্যাহরণের বাধা কিছু নয়। সখা কৃষ্ণও জানেন তা। তবু সুভদ্রাকে হরণের পরামর্শই তিনি। আবার ভাবতেও বললেন। কেন? ভেবে আকুল হল অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা, দ্রৌপদীর কথাই কি চিন্তা করেছেন কৃষ্ণ? উলুপী, চিত্রাঙ্গদা তার হৃদয়ে উন্মাদনা জাগিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রেমের চেয়ে বন্ধনই ছিল অধিক। শুধু তাই নয়, স্বরাজ্য পরিত্যাগ করে তারা কেউই হয়নি অর্জুনের। তার পারিবারিক জীবনে তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

কি দ্রৌপদীর কথা চিন্তা করেছেন কৃষ্ণ? কিন্তু দ্রৌপদীর সঙ্গে যে অন্যের তুলনা চলে না সে তো পাণ্ডব সখা কৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়! দ্রৌপদী যদিও জয়লব্ধা তার, তবু পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক। তাকে একান্ত ব্যক্তিগত বলে কোন দিনই দাবী করাতে পারব না। সে বন্ধু, সে বয়স্যা, সে মহিষী, সে কর্ত্রী। জীবনের সর্বকার্যে সর্বদা সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্য নয় সে। কিন্তু বাঁচতে গেলে প্রতিমুহূর্তে একজন নারীর সাহচর্য প্রয়োজন। নইলে জীবন ক্লান্ত হয়। চলার বেগ যায় ফুরিয়ে। বোঝার মত জীবনটাকে তখন টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। সুভদ্রা সর্বগুণে গুণান্বিত। পুরুষের মর্মসঙ্গিনী সে। প্রেয়সী এবং অর্ধাঙ্গিনী। তার কাছে পাওয়া যায় জীবনের শান্তি, আনন্দ, সুখ ও পূর্ণতা।

সুভদ্রাকে পাওয়ার পথে যে বিঘ্নই আসুক, অর্জ্জুন তাকে জয় করতে কৃতসংকল্প হল। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে ঝুঁকির কথা বলল কেন? রাজনৈতিক বিপদের আশংকা করে কি তাকে নিবৃত্ত করতে চাইল? সুভদ্রা বসুদেবের নয়নের মণি, ভ্রাতাদের সর্বাধিক প্রিয় ভগিনী। তস্করের মত তাকে হরণ করলে বৃষ্ণিরা ক্রুদ্ধ হবে। তাদের মর্যাদা বোধ আহত হবে। বংশগৌরব রক্ষার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়ে পাণ্ডবদের আক্রমণ করবে। মোহের আগুনে পাণ্ডব রাজ্য ছারখার হবে। শত্রুরা হাসবে। বৃষ্ণিদের সাথে মধুর হৃদ্য সম্পর্কের ইতি ঘটবে। সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করলে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার রাজনৈতিক আশ্বাস থেকে তারা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হবে। এজন্য সত্যকারের এক সুহৃৎ হারাবে তারা। সব দিক দিয়ে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। জীবন ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। পাণ্ডব রাজ্যের প্রতিরক্ষার ভার তার উপর ন্যস্ত। সুতরাং, তার মত একজন দায়িত্বশীল রাজকর্মচারীর এরূপ রাজনৈতিক হঠকারিতা কোনমতেই শোভা পায় না।

কৃষ্ণের শিক্ষাই হল সব কিছুকে রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে দেখা ও গ্রহণ করা। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা হৃদয় ধর্ম ও আবেগ দ্বারা চালিত হয়েছে বলেই দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছে জীবনে। প্রভাসে অবস্থানকালে কৃষ্ণ তাকে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইতিহাস শুনিয়েছিল। থেকে থেকে সেই কথাই বারংবার মনে পড়ল।

মগধরাজ জরাসন্ধ, শূরসেন রাজ্যের অধিপতি কংস এবং বৃষ্ণি; সত্রাৎ, অন্ধক ও ভোজ বংশীয়দের সঙ্গে ত্রিকোণ ক্ষমতার লড়াই এর ফলে পাণ্ডুপুত্রেরা রাজ্যচ্যুত বনবাসী হয়েছিল। যাদবদের রাজনৈতিক প্রাধান্য যাতে খর্ব হয়, বিপুল শক্তি ধ্বংস হয়, সেজন্য জরাসন্ধ সুকৌশলে কংসকে তার দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিল। প্রাসাদ বিদ্রোহ ঘটিয়ে পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে কংস হল শূরসেনের অধিপতি। জরাসন্ধের প্ররোচনায় কংস ধ্বংস করল যাদবদের গণতন্ত্র। তাদের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি পর্যন্ত নষ্ট হল। দেশ ও জাতির শত্রুরূপে আত্মপ্রকাশ করল সে। তার ও জরাসন্ধের মিলিত শক্তি যাদবদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। শূরসেনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুরুরাজ্যের সঙ্গে যাদবেরা যাতে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে, সেজন্য কুরু ও পাণ্ডবদের বিভেদ খাড়ানো হল। যদুবংশীয় কন্যা কুন্তীর পুত্রেরা যাতে কুরু-রাজ্যের সিংহাসনের অধিকার না পায় সেজন্য জরাসন্ধ কুরুপতি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে

বোঝাল যে আয়তনে ক্ষুদ্র কুরুরাজ্য দু'টুকরো হলে দুর্বল হয়ে পড়বে। আত্মকলহে উভয়ের শান্তি নষ্ট হবে। তাছাড়া জ্যেষ্ঠের সন্তানরাই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী।

জরাসন্ধের বাক্য ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধরল। তাই তিনি পাণ্ডুপুত্রদের রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য বারণাবতে জতুগৃহে পাঠালেন। অতীতের সেকথা মনে হতে অর্জুনের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চোখ দুটি তার জ্বালা করতে লাগল। হাত দিয়ে ঘাম মুছল। রাজনীতি যে এত জটিল এবং দুরধিগম্য আগে জানত না অর্জুন।

কৃষ্ণ আরও বলেছিলেন, কুরুরাজ্যের নিকটবর্তী রাজ্য পাঞ্চাল। কুন্তীভোজের সঙ্গে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের অভিন্ন মিত্রতা! এবং কুরুরাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই সৌহার্দ পূর্ণ। সেজন্য কংসের দুশ্চিন্তার শেষ নাই। বৃষ্ণিরা তার ক্ষমতা বৃদ্ধির পথে একমাত্র অন্তরায়। পাঞ্চালরাজ তাদের বন্ধু এবং কুন্তীপুত্রেরা আত্মীয়। এ অবস্থায় তারা ও বৃষ্ণিরা একত্রিত হলে জরাসন্ধ ও কংসের বিপদ বাড়বে। তাদের স্বার্থও ক্ষুন্ন হবে। তাই এক কুৎসিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল কংস ও জরাসন্ধ। কংস জীবিত থাকতে পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং যাদবেরা কখনও মিলিত হতে পারেনি। তার মৃত্যুর বহু পরে সে মিলন সম্পন্ন হল।

কৃষ্ণের এসব কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু তাকে এসব কথা বলেছিলেন। কিন্তু কেন? মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতা, এবং জীবনধারণের প্রয়োজনে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদে মানুষ যা করে থাকে তার প্রতি সতর্ক হওয়ার জন্যই কি তাকে এসব কথা বলেছিলেন?

সবদিক চিন্তা করে অর্জুন সুভদ্রা হরণের ইচ্ছা ত্যাগ করল। তাকে এ জীবনে আর বধূরূপে পাওয়া হল না বলে তার বুক ফাটতে লাগল। চেষ্টা করেও সুভদ্রার সেই ঢুলু ঢুলু আঁখির আকর্ষণ ভুলতে পারছিল না অর্জুন। সে চক্ষুদ্বয় প্রেমলাজে লজ্জিত। মৃদু মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত।

উৎসবের আর একটি মাত্র দিন বাকি। যাদবেরা এখন উৎসবে মত্ত। কোনদিকে ফিরে তাকানোর অবসর নেই তাদের। কোথায় কি ঘটছে তাও জানে না তারা। কেবল কৃষ্ণই একা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করছেন। সুতরাং, সুভদ্রা হরণের এই হল শ্রেষ্ঠ সময়। বৃথা কালক্ষয় করা তার উচিত নয়। কিন্তু ধর্মবোধ ও কর্তব্যবোধে দ্বিধাগ্রস্ত হল সে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কেবলই বিলম্ব হচ্ছিল। কৃষ্ণের অভাব দুঃসহ হল তার কাছে। কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছুই স্থির করতে পারছিল না। অসহ্য উত্তেজনায় কক্ষের মধ্যে তীরবিদ্ধ পাখীর মত ছটফট করতে লাগল।

এমন সময় কৃষ্ণ তার কক্ষে প্রবেশ করল।

কৃষ্ণকে পেয়ে অর্জুন যেন অকূলে কূল পেল। ব্যাকুল কণ্ঠে অনুনয় করে বলল: সখা, হৃদয় যন্ত্রণায় কাতর আমি। সুভদ্রার জন্য হৃদয় আমার অস্থির হয়েছে। কিন্তু বন্ধুত্বের বিশ্বাস ভেঙ্গে প্রেমের অমরাবতী আমি চাই না। কর্তব্যবুদ্ধি এবং

সংশয়ের দ্বারা প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট হচ্ছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর কৃষ্ণ। সুভদ্রাকে পত্নীরূপে লাভ করলে কৃতার্থ হব আমি। সে আমার তৃষ্ণার বারি, প্রেরণার প্রদীপ। তুমি আমায় উপায় বলে দাও।

অর্জুনের কাঁধে হাত রাখলেন কৃষ্ণ। বড় মধুর সে হাতের স্পর্শ। মুখে তাঁর বিগলিত হাসির প্রসন্নতা। চোখের তারায় নির্ভয় প্রশ্রয়। ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন ঃ

ভাল যদি লেগে থাকে সখা, নিয়ে যাও তবে।
ভয় করিও না বন্ধু, আছে কৃষ্ণ তব সাথে॥

সুভদ্রা হরণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। অর্জুনের আচরণে যাদবেরা ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হল। নানা কটুবাক্যে তারা তিরস্কার করতে লাগল। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজ বংশীয় সব প্রধানেরা রণসজ্জায় প্রস্তুত হলেন। সারথীরা রথে আরোহণ করলে। কেবল, কৃষ্ণই কিছু করলেন না। শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলের মধ্যে। ক্রুদ্ধ যাদবদের রোষ, ক্ষোভ, ক্রোধ, অহংকার, তর্জন-গর্জন সব শুনলেন কৃষ্ণ। তবু নির্বিকার তিনি। কৃষ্ণের নীরবতায় সকলে বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলরাম জিগ্যেস করলেন ঃ—কৃষ্ণ, তুমিতো কিছু বললে না! তোমার প্রিয় সখা অর্জুন বিশ্বাসঘাতক। কুলাঙ্গার। আতিথ্যের অমর্যাদা করে সমগ্র যাদব পরিবারের মুখে সে কালি লেপন করল। সকলের কাছে আমাদের হাসাস্পদ করল। তার কি প্রতিবিধান তুমি করবে? বল-বল কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় রহস্যময় হল। চোখে তার বিহ্বলতা। কণ্ঠস্বর সুতীক্ষ্ণ আবেগের লেশমাত্র নেই তাতে। কৃষ্ণ তার সম্মোহন ক্ষমতা নিজের মধ্যে আহরণ করে নিয়ে বললেন ঃ আপনাদের উত্তেজনায় আমি বিস্মিত! অর্জুন পাত্র হিসাবে যে কোন সম্ভ্রান্ত রাজবংশের যোগ্য। আশা করি এ বিষয়ে আপনারা সকলে আমার সঙ্গে একমত হবেন। কুন্তীভোজের দৌহিত্র সে। ভরতবংশীয় সন্তান। একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। রাজনীতিজ্ঞ। সমরকুশলী। বিচক্ষণ। যথার্থ বীর বলেই সুভদ্রাকে হরণ করতে সাহস পেয়েছে। কন্যা হরণ ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় কর্ম। সুভদ্রাকে হরণ করা তার অন্যায় হয়নি। রাজনীতির দিক থেকেও তার কার্য সমর্থনযোগ্য।

পানোন্মত্ত দৃষ্টিতে বলরাম তাঁর দিকে তাকালেন। একটা ঢোক গিলে বললেন ঃ তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির কথাটা ভাল করে গুছিয়ে বল।

অর্জুনের রাজনীতি চোখে দেখা যায় না। হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। মানুষের হৃদয় রাজ্য জয় করে সে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। সম্প্রতি দ্বাদশ বৎসর নির্বাসনের কাল

শেষ হল তার। সত্যরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছিল। নিজ রাজ্যের অনতিদূরেই তার নির্বাসিত জীবন কাটাতে পারত। কিন্তু তা করল না সে। সমগ্র ভারত পর্যটনে যাত্রা করল। বিভিন্ন দেশের মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ-জীবন পদ্ধতি, যুদ্ধ-রাজনীতি, প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে সে দেখল। আর্যত্বের অভিমান ত্যাগ করে সব শ্রেণীর ও সব বর্ণের মানুষের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করল। তাদের বন্ধু ও আত্মীয় হল। শুধু প্রীতি ও সৌহার্দ্যের দ্বারাই সে এক বিরাট ভারত রাজ্য জয় করল। সহস্র যুদ্ধ যা পারে না অর্জুন একার চেষ্টায় সেই জয় সম্পূর্ণ করল। অর্জুনের এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রশংসা করি আমি। তার মত বীর প্রাজ্ঞ রাজনীতিককে পতিরূপে পাওয়া আমাদের ভগিনীর পরম সৌভাগ্য। অর্জুন আত্মীয় হলে আমাদেরও মর্যাদা গৌরব বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে আমাদের রাজনৈতিক লাভের কথাটাও বিবেচনা করতে হবে। এই বিবাহের ফলে পাঞ্চাল, পাণ্ডব, ও পূর্ব দেশীয় নাগরাজ মণিপুর এবং দক্ষিণ দেশীয় মিত্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যাদবদের একটা অভিন্ন সম্পর্ক গড়ে উঠবে। জরাসন্ধের ভীতি ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। যাদবেরা নিরাপদ হবে। তাই, আমার মত হল, শত্রুরা জানার আগে অর্জুনের সঙ্গে ভগিনী সুভদ্রার যথারীতি শাস্ত্রীয় মতে বিবাহকার্য সম্পাদন করা আশু কর্তব্য। আর, সেটাই হবে শোভন। তার ফলে, আমাদের কুলের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় যাদব প্রধানেরা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হলেন। সবিস্ময়ে একদৃষ্টে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখের পলক পড়ল না কারো। এমন বিস্ময়কর খবর আগে কখনও শোনেনি তাঁরা। তাই অবাক হলেন প্রত্যেকে। বিস্ময়! শুধুই বিস্ময়! ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত হল। সহস্র ক্ষোভের মধ্যেও কিছুটা তৃপ্তি লাভ করল প্রত্যেকে।

বলরাম বললেনঃ কৃষ্ণ বেশ বলেছে। কথাগুলো হেলাফেলার নয়। তাহলে মিছেমিছি আর হৈ-চৈ করে লাভ কি? তার চেয়ে বরং অর্জুনকে ডেকে সুভদ্রার সঙ্গে বিয়েটা দেয়া হোক্।

চতুর্থ অধ্যায়

বিরাট সৈন্যদল বেষ্টিত হয়ে যদুবংশের বীরদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম, সুভদ্রাও অর্জুনকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন।

একযুগ পরে কৃষ্ণ এসেছেন ইন্দ্রপ্রস্থে। তবু খাণ্ডবপ্রস্থ বদলায়নি একটুও। যেখানে ছিল সেখানেই আছে থেমে। তার কোন রূপান্তর হয়নি। সেই গ্রামই আছে। মায়ের কোলে মাথা রেখে যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে ইন্দ্রপ্রস্থ। তার

অরণ্যের ঘুম ভাঙেনি এখনও। সব শান্ত স্তব্ধ। ইন্দ্রপ্রস্থের এই দীন দশা প্রত্যক্ষ করতেও কষ্ট হল কৃষ্ণের। কিন্তু তার জন্য দোষী বা অপরাধী করলেন না পাণ্ডবদের। পাণ্ডুপুত্রেরা ভোগ, বিলাস ও আড়ম্বরের পক্ষপাতী নয়। সরল সাদাসিধা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। তাদের কেউই অলস ও বিলাসী নয়। সেজন্য ভোগ-বিলাসের কোন পরিবেশ গড়ে ওঠেনি নগরে। সকল ক্ষেত্রে উদ্যম ও উদ্যোগকে তারা সকল সৌভাগ্যের মূল বলে মনে করেছে। সেজন্য বাধাপ্রদানকারী অশুভ শক্তিগুলোকে জীবন থেকে বহুদূরে সরিয়ে রেখেছে। জনসাধারণের শিক্ষালাভের জন্য তারা আপন জীবনটাকেই করেছে পাঠ্যপুস্তক। এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তাদের মর্মের বন্ধন। কৃষ্ণ তাই যুধিষ্ঠিরকে গণদেবতা মনে করেন। জনগণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের ভাবী অধিনায়ক তিনি এবং তাঁর অনুগামী ভ্রাতারা। মূঢ়, মূক বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব পাণ্ডুপুত্রেরা দিতে পারে বলে, কৃষ্ণের মনে হ'ল। তাই কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক-রূপে বরণ করলেন তাদের।

জনগণমন বিধায়ক হওয়ার জন্যই ভারতের ভাবী অধীশ্বররূপে পূজিত হবেন যুধিষ্ঠির। রাজ্যপ্রাপ্তির অনতিকাল মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে এবং চরিত্রগুণে যেভাবে মানুষের হৃদয় জয়ে সমর্থ হলেন তাতে খুব শীঘ্রই, সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁর বশীভূত হবে। প্রেম-প্রীতি ডোরে বন্ধ হবে সমগ্র ভারতভূমি। সেদিন আর খুব বেশী দেরী নেই বলে মনে হল কৃষ্ণের।

এই খাণ্ডবের মাটিতেই তার ভিত্তি স্থাপনের কথা ভাবলেন কৃষ্ণ। এবং সেই মত সমগ্র কর্মনীতি স্থির করলেন।

সম্মুখে মহাজীবনের আহ্বান। অনেক দায়িত্ব তাঁর। মহাযজ্ঞের সব আয়োজন তাঁকেই করতে হবে। রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে ইন্দ্রপ্রস্থের নবরূপ দিতে হবে। ভারত অধীশ্বরের গৌরব ও মর্যাদাবৃদ্ধির উপযোগী করেই খাণ্ডবপ্রস্থের নগর গঠন আশু প্রয়োজন। একাজে পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বন্ধুর হিতার্থে তাকেই নিতে হবে দুরূহ দায়িত্বভার। অরণ্য সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে তুলতে হবে এক নতুন মানব সভ্যতা। মানুষের শৌর্য-বীর্যের কীর্তিস্তম্ভ। নগরের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি উপযুক্ত সুউচ্চ স্থান নির্বাচন করে এক অত্যাশ্চর্য রাজপ্রসাদ নির্মাণ করতে হবে, যা সর্বতোভাবে ভারতভূমির ভাবী অধীশ্বরের উপযুক্ত হবে। বিপুলতায়, বৈভবে, সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে শুধু অভিনব হবে না, শ্রেষ্ঠতর হবে পৃথিবীর সর্বৈশ্বর্য বস্তুরূপে। একেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম্। ভারতখ্যাত দানব স্থপতি ময়ের উপর তার সবভার অর্পণের কথা চিন্তা করলেন কৃষ্ণ। কিন্তু কোথায় পাবেন তাকে? খাণ্ডবের বনে অনেকেই তাকে আত্মগোপন করতে দেখেছে। তাকে খুঁজে বের করা এখনই দরকার। অতঃপর কালক্ষেপ না করে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন সেখানে।

নগরীর প্রান্তসীমায় রথ রেখে পদব্রজে তাঁরা যমুনা নদীর তীর ধরে বরাবর পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এ দিকটা মনুষ্য চলাচলের উপযুক্ত নয়। সর্বত্র ঘন জঙ্গলে আবৃত। ভীষণ নির্জন আর নিস্তব্ধ। বন্যজন্তু চলাচলের রাস্তা ধরে

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রবেশ করলেন অরণ্যের গভীরে। যেতে যেতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন তাঁরা।

নিদাঘের প্রতপ্ত সূর্য সব রস নিঙরে নিয়েছে খাণ্ডব বনের। কোথাও নেই এতটুকু সরসতা, এক কণা সবুজের আঁচড়। পাতা নেই, লতা নেই, বনভূমিতে বন নেই। আছে বনের ছাতিফাটা তৃষ্ণার কান্না আর সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। গাছগুলি আঁকাবাঁকা শুকনো কতকগুলো কাঠির কঙ্কাল। রুক্ষ, শীর্ণ, রিক্ত এলোমেলো ডাল-গুলো আকাশের দিকে মুখ করে যেন করুণা ভিক্ষা করছে। কিন্তু সূর্যদেব ক্রুদ্ধ। তাঁর নয়নবহ্নি থেকে কেবলই অগ্নি নির্গত হচ্ছে। এখনই যেন সমগ্র বনভূমিকে ভস্মীভূত করবেন তিনি। বনস্থলীর ডালে ডালে যেন সে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বন্য-প্রাণীরাও সতর্ক। তারা খুব ভয়ে ভয়ে বিচরণ করছে। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে তারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। তাই তাদের স্বভাব ও আচরণ খুব উগ্র ও হিংস্র হয়েছে। চতুর্দিকে চোখ রেখে খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলেন কৃষ্ণার্জ্জুন।

বৃহৎ একটি শিলাখণ্ডের পাশে অনেকখানি ফাঁকা জমি। চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সুন্দর মসৃণ শিলাখণ্ডে উপবেশন করলেন। মনে হল, এখানে কোন পুরাতন আবাসভূমি ছিল এককালে। শিলাখণ্ডগুলিও সাধারণ শিলাখণ্ডের মত নয়। এগুলির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অর্জ্জুন। খুব আশ্চর্য লাগল তার। প্রতিটি প্রস্তর গাত্রে মনুষ্যকৃত বিবিধ শিল্পাঙ্কনে ভূষিত। কোন প্রাচীন দেব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলে মনে হল তার। অন্তত প্রস্তরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দেখে তাই মনে হল অর্জ্জুনের।

শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের প্রতি অর্জ্জুনের ঔৎসুক্য দেখে হাসেন কৃষ্ণ। এখানে এমন অনেক বিস্ময় ছড়িয়ে আছে। অর্জ্জুনের বিস্মিত চক্ষুদ্বয় অনুসরণ করে কৃষ্ণ বললেন ঃ সখা এ অরণ্যভূমি ছিল অনার্যদের বাসভুমি। নাগরাজ তক্ষকের রাজ্য। সম্ভবত এটি একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এসব দেখার জন্য এখানে আসিনি আমরা। অরণ্যভূমি শীঘ্রই অগ্নি কবলিত হবে—

বলতে গিয়ে থামলেন কৃষ্ণ। অর্জ্জুন অন্যমনস্ক। অনতিদূরে পতিত একটি বৃহৎ প্রাচীন শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যশিল্পের মধ্যে ভ্রমণপ্রিয় অর্জ্জুন কি যেন অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিল। বিস্ময়ে তার চক্ষুদ্বয় স্থির হয়ে রইল। তাই, কৃষ্ণের আগমন সে জানতে পারল না।

শিলাগাত্রে খোদিত অদ্ভুতাকৃতির একটি রথ দেখে বিস্মিত হল অর্জ্জুন। এমন রথ ইতিপূর্বে দেখেনি সে। রথের চূড়ায় শার্দুলের ন্যায় ভয়ংকর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিশালদেহে একটি বানর স্থাপিত। ধ্বজে বিবিধ বৃহৎ জীবজন্তুর প্রতিমূর্তি। গন্ধর্ব ও অশ্বগণ রথে সংযোজিত রয়েছে। এবং আশ্চর্যজনক যুদ্ধোপকরণে রথটি সুসজ্জিত। রথটি শুধু সুন্দর নয়, বৃহৎ যুদ্ধের খুব উপযোগী বলে মনে হল। ঐ শিলাখণ্ডে একটি ধনুকও খোদিত রয়েছে। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, এটি একটি বিশাল পশুর মেরুদণ্ডে নির্মিত। এ-ছাড়া আরও একটি অদ্ভুত ধরনের চক্রপাণিও খোদিত রয়েছে। এবং সেই চক্র শত্রুসৈন্যের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

মুণ্ডহীন অসংখ্য দেহ ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। এতদ্ব্যতীত গদা, শঙ্খ প্রভৃতিও রয়েছে।

অর্জুনের তন্ময়তায় বিস্মিত হলেন না কৃষ্ণ। তার মত সমরকুশলী বীরের পক্ষে এরূপ বিস্ময় খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষ্ণ সেজন্য একটুও অবাক হলেন না। বরং মনে হল এমন একটা অত্যাশ্চর্য সংবাদ যেন পূর্বেই জানতেন তিনি। জেনেশুনেই যেন এসেছেন সেখানে। ঠিক জায়গায় পৌঁছনোর আত্মপ্রসাদে তাঁর চোখ মুখ আনন্দে দীপ্ত হল।

ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি ইতিহাস কৃষ্ণের নখদর্পণে। ভূগোল, দর্শন, শাস্ত্র তাঁর অধিগত। খাণ্ডব বনের অভ্যন্তরে প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব এবং তার লুকনো গোপন সম্পদের কথা কৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়। অর্জুনকে তার সাথে পরিচিত করানোর জন্যেই যেন এখানে এনেছেন। কিন্তু অর্জুন তা জানে না। তবে এ-কথা বুঝেছিল যে ভ্রমণ কিংবা পশু শিকারের জন্য কৃষ্ণ আসেনি এখানে। অন্য কোন উদ্দেশ্যেই এসেছেন তিনি।

ভগ্ন মন্দিরের কাছাকাছি একটি গুহা ছিল। সেখানে লুকনো আছে শিলাখণ্ডের উপর খোদাই করা রথ, ধনুক, চক্র, গদা, তুণ সব। অরণ্যভূমিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার আগে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে। তাই কালক্ষয় না করে অর্জুনের কাঁধে হাত রাখলেন কৃষ্ণ। তাঁর কোমল হস্তের স্পর্শে চমকে উঠল অর্জুন। কৃষ্ণের মুখে হাসি, চোখে কৌতুক। বিস্মিত অর্জুনের বাক্যস্ফূর্তি হল না। কৃষ্ণ তার মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন কৌন্তেয়, প্রস্তর খোদিত যে রথও অস্ত্র দেখে তুমি বিস্মিত হচ্ছ, তা তোমার হাতের কাছেই রয়েছে। ইচ্ছা করলে তুমি তা গ্রহণ করতে পার।

বিস্মিত অর্জুন বলল ঃ কি বলছ সখা। আমায় নিয়ে এরূপ পরিহাস করা তোমার কদাচ উচিত নয়। এমন করে আমাকে অপমানিত না করলে কি তোমার চলত না ?

শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বললেন কৃষ্ণঃ তোমায় পরিহাস করা আমার ইচ্ছে নেই। সব কাজই আমার উদ্দেশ্যমূলক। কার্য আরম্ভের পূর্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করি তার। তারপর কর্মের সিদ্ধান্ত নিই। এটি একটি প্রাচীন মনুষ্য সভ্যতার বাসভূমি। কালের গর্ভে সে সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে গুপ্ত আছে উন্নত অনার্য সভ্যতার কতকগুলি অমূল্য সম্পদ। তোমার সম্মুখে শুকনো জট-পাকানো ঐ গুল্মলতায় ঢাকা গুহার মধ্যে লুকানো আছে কপিধ্বজ রথ, গণ্ডারের মেরুদণ্ডে তৈরী গাণ্ডীব ধনু আর সুদর্শন চক্র। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর এ ধরনের রণসম্ভার তৈরী হয়নি।

নির্বাক হল অর্জুন। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তার চিত্ত। বিস্ময়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চলে গেল গুহার মধ্যে।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান এখানে শেষ নয়। আরও একজন বাকী। তাকে খুঁজে বার করতে হবে কৃষ্ণকে। কিন্তু কোথায় পাবেন তারে ? এই বনেই আছে সে। কারণ,

এই বন তার নিরাপদ আশ্রয়। বিশ্বের অদ্বিতীয় শিল্পী ময় একজন অপ্সরীর রূপমুগ্ধ হওয়ার জন্য ইন্দ্র তার প্রতি ক্ষুব্ধ। তাকে হত্যা করার জন্য ত্রিভুবন সন্ধান করে বেড়াচ্ছে ইন্দ্র। কিন্তু কোথাও পেল না তাকে। কৃষ্ণের ধারণা ময় এই গহন অরণ্যেই আত্মগোপন করতে পারে। কারণ, এই জনহীন অরণ্য ইন্দ্রের অন্যতম বন্ধু তক্ষকের রাজ্য। এস্থান তার আত্মগোপনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বন্ধুবর তক্ষকের রাজ্য ময়ের নিরাপদ বাসভূমি নয় মনে করেই ইন্দ্র তাকে খুঁজল না সেখানে। এ থেকে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই অরণ্যের কোথাও না কোথাও সে লুকিয়ে আছে। অরণ্য প্রজ্জ্বলিত না হওয়া অবধি তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। তবে বনভূমিতে আগুন লাগলে এই সুরঙ্গ পথেই পালাতে হবে তাকে। তাই সুরঙ্গের মুখে কৃষ্ণ নিজেই অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকবেন বলে স্থির করলেন।

হঠাৎ জ্বলে উঠল আগুন। প্রলয়ংকর লেলিহান অগ্নিশিখা চারদিকে লক্ লক্ করে উঠল। সাপের জিহ্বার মত হিস্‌হিস্ করতে লাগল বাতাসে। বাতাসের ফলে অগ্নি বিস্তৃত হল দ্রুত। ক্ষুধার্ত পাবক শিখা বেষ্টন করল সমগ্র খাণ্ডববন। সপ্ত-শিখা মেলে রাক্ষসের মত নির্বিচারে ভক্ষণ করতে লাগল সব।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রাণান্তকর চেষ্টায় অবশেষে উদ্ধার হল আশ্চর্য আশ্চর্য রণসম্ভার। নিরাপদ স্থানে রেখে এলেন সেসব। এদিকে আগুন ক্রমেই বিস্তৃত হতে লাগল। অরণ্যচারীদের আত্মগোপন করা কোনমতে সম্ভব হল না আর। ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে লাগল সকলে। ধাবমান প্রাণীরা নগরে এবং লোকালয়ে প্রবেশ করলে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। সেজন্য কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় দুই মহাবল তার পাহারায় নিযুক্ত রইলেন। এবং নির্বিচারে সকল বন্যপ্রাণীদের বিতাড়িত করে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

সহসা লতাগুল্ম আচ্ছাদিত একটি গর্ত থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো দানবাধিপতি ময়। তারস্বরে আপন প্রাণভিক্ষা চাইল অর্জুনের কাছে। কৌন্তেয় রক্ষা কর, রক্ষা কর আমায়! আমি দানবাধিপতি ময়। মর্তের বিশ্বকর্মা বলে খ্যাত। আমায় বাঁচাও তুমি। আমি তোমার শরণাগত।

কৃষ্ণের কোনো ভাবান্তর নেই। চোখে মুখে কোন কৌতূহল প্রকাশ পেল না। আরক্ত চক্ষুর দৃষ্টি কঠিন ও কুটিল হল। অন্যান্য বনচারীর মত ময়কে শমন ভবনে পাঠানোর জন্য অর্জুনকে শর হানতে নির্দেশ করলেন। কিন্তু এ ছিল তাঁর নিছক কপট অভিনয়। অর্জুন কৃষ্ণের মনোভাব জানত না। তাই, নিবৃত্ত হওয়ার জন্য তাঁকে বললেন ঃ সখা শরণাগতের প্রতিপালক তুমি। রক্ষা কর ময়দানবে। পাণ্ডবের শরণাগতকে প্রাণহরণ করে সত্যভঙ্গ কর না আমার!

পার্থের ব্যগ্র ব্যাকুল আহ্বানে বিস্মিত করল কৃষ্ণকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। হাসিতে উদ্ভাসিত হল তাঁর মুখমণ্ডল। স্বস্তি ও তৃপ্তিতে ভরে গেল বুক। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস পড়ল। মনে মনে বললেন ঃ সবই নিয়তি। বিধির বিধান কে বুঝিতে পারে? নইলে, অর্জুন ময়ের জন্য এত মমতা ও দরদ অনুভব করবে কেন?

একদৃষ্টে অর্জুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন ঃ তোমার ইচ্ছাই তাহলে পূর্ণ হোক সখা।

ময় দানবকে পেয়ে কৃষ্ণ ভীষণ খুশী হলেন। তার অনুসন্ধানের জন্যই খাণ্ডবপ্রস্থে এসেছিলেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে-কথা জানতে পারেনি কেউ। কৃষ্ণ আপন উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেন না কখনও। এমনকি প্রাণের বন্ধু অর্জুনও জানে না তাঁর মনের গতিবিধি। প্রাকৃতিক কারণে যদি খাণ্ডব দাহ না হত, তাহলে, ময়কে খুঁজবার জন্য এবং ইন্দ্রপ্রস্থের নতুন নগর নির্মাণের জন্য নিজের হাতেই অগ্নি সংযোগ করতে হত। ঈশ্বর সেই পাপাচারণ থেকে রক্ষা করেছেন তাঁকে।

ময়ের প্রাণ রক্ষা পেল। প্রাণের প্রতি তার অসীম মমতা। প্রাণের জন্যই সে আশ্রয়হীন। সুবর্ণ নির্মিত রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যের গভীরে গুল্মলতা জালে আচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে কণ্ট-শিষ্টে আত্মগোপন করে আছে। ইন্দ্র তার পত্নী উর্বশী হেমাকে প্রমোদের সঙ্গিনী করার জন্য বলপূর্বক হরণ করেছিল। ময় তার স্ত্রীকে ইন্দ্রের কাছে দাবি করলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়। এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন ময় ইন্দ্রের কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাণ্ডবপ্রস্থে আশ্রয় নিল। অর্জুনের শরণাগত হওয়ার ফলে তার জীবন হল নিরাপদ এবং সর্ব বিপন্মুক্ত। কৃতজ্ঞতায় ময়ের অন্তর ভরে গেল।

কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জুনের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসল। মাথা হেঁট করে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। তারপর, সবিনয়ে বলল ঃ মহাত্মা অপরাধ নেবেন না। আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও মহাশিল্পী। আপনার কোন প্রিয়কার্য সাধনের অধিকার দিয়ে আমাকে চরিতার্থ করান। আপনি তুষ্ট হবেন, এমন কোন কাজ করতে পারলে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হই।

চোখের ইশারায় কি যেন ইঙ্গিত করলেন কৃষ্ণ। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অর্জুন বলল ঃ হে দানবাধিপতি, তুমি কৃতজ্ঞ। এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে কিছু করানো আমি অপছন্দ করি। তবে, সখা কৃষ্ণের জন্য যদি কিছু কর তুমি, তাহলে সে হবে আমারই প্রত্যুপকার।

ময় তখন কৃষ্ণের সম্মুখে নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে বলল ঃ আদেশ করুন তাহলে কেশব।

কৃষ্ণ যেন এরূপ প্রস্তাবের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না এমন ভাব দেখাল। চিন্তার ভাণ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন ঃ শিল্পীবর একান্তই যদি পাণ্ডবদের প্রিয় কার্য সাধনে তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে এই খাণ্ডবপ্রস্থে এমন এক নগর ও রাজপ্রাসাদ স্থাপন কর, যা হবে পৃথিবীর এক অন্যতম আশ্চর্য সম্পদ, ঈর্ষার বস্তু এবং মানুষের অনুকরণের অসাধ্য। মনে রেখ এ হবে, তোমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। কালের ধ্বংস মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সে যেন যুগ-যুগান্তর ধরে তোমার ঋণ শোধের সাক্ষী হয়ে থাকে। তোমার কীর্তি খ্যাতি, গৌরবকে অমলিন রাখে। তাহলে সার্থক হবে তোমার শ্রম।

ময় নত মস্তকে কৃতাঞ্জলি পুটে কৃষ্ণের প্রস্তাবকে সম্মতি জানাল।

কিছুকাল গত হলে ময় সবিশেষ চিন্তার পর সভানির্মাণে উদ্যোগী হল। পুণ্য-দিবসে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স ও বহুবিধ ধনরত্ন দিয়ে তুষ্ট করে ময় ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী ও রাজপ্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল কৃষ্ণের। মনে হল, বহুকালের পর তাঁর কল্পনার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল ইন্দ্রপ্রস্থে। যদিও ভবিষ্যৎ তার অনিশ্চিত, লক্ষ্য অনেক দূরে, তবু সাফল্যের এই প্রথম প্রয়াসটুকু তাঁর অন্তরে প্রথম সন্তানবতী নারীর মত হর্ষ, সুখ গর্ব ও স্বপ্নে বিভোর করে রাখল।

সমগ্র ভারতভূমির উপর জরাসন্ধ আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তাই সুপরি-কল্পিত উপায়ে সে অগ্রসর হচ্ছিল। পরাক্রমশালী নৃপগোষ্ঠীর অন্যতম শিশুপাল ডিম্ভক, ভীষ্মক, পৌণ্ড্রক, দুর্যোধন প্রমুখদের সহায়তায় জোটবন্ধ এক রাজনীতির সূচনা হল। এর ফলে, সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা তীব্র হল। দুর্বল ও নিরপেক্ষ নৃপবর্গ [illegible] আশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। শান্তি-রক্ষার জন্য [illegible] পশ্চিম দিকে হটে যেতে বাধ্য হল। রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এমনই জরাসন্ধ বিরোধী জোট নিরপেক্ষ রাজাগুলির সঙ্গে একটি আঁতাত গড়ে তোলা, অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ল। পাণ্ডব কুলতিলক যুধিষ্ঠিরকে মধ্যমণি করে কৃষ্ণ এক নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনে তৎপর হলেন। কিন্তু খুব সংগোপনে। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ জানল না তার গতিবিধি। জরাসন্ধের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির প্রতিরোধ এ ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সম্ভব নয় কৃষ্ণ তা জানেন।

কৃষ্ণ আরো জানেন, যুধিষ্ঠির এমনই একজন মহামান্য ব্যক্তি যে তাঁর প্রতি সর্ব-সাধারণের অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা। তাঁর সততা, ন্যাযপরায়ণতা ও কর্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে কারও মনে সংশয় নেই। তিনি অকপট, নির্লোভ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর মত নিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব সব রাজন্যবর্গই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন। নতুন রাজনৈতিক সংঘের মূল আদর্শ হবে, বিশ্বাস, আনুগত্য, বন্ধুত্ব, মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহবস্থান। 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই হবে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য। ময় ইন্দ্রপ্রস্থে তার ভিত্তি স্থাপন করল। কৃষ্ণের তাই আনন্দের পরিসীমা নেই। 'অদ্য আমি জয়ী' এই কথা ভাবতেই তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হল।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মণিময় সভার নির্মাণকার্য অবশেষে সমাপ্ত হল। অপূর্ব! অদ্ভুত! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হীরামুক্ত মাণিক্যে খচিত এই মণিময় সভার অনুপম ও বিস্ময়কর সৌন্দর্য মর্তে এক নব ইন্দ্রলোক সৃজন করল। 'সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে

প্রশান্ত পাষাণে' দানবাধিপতি ময় সর্বধ্বংসী কালকে ফাঁকি দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলিকে কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল করে রাখল ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার তুলনা নেই।

ঔজ্জ্বল্যে ও দীপ্তিতে সূর্যপ্রভাত ম্লান হয়ে গেল তার কাছে। নবোদিত বিশাল রাজসভা গিরিশিখরের ন্যায় আকাশব্যাপ্ত করে রইল। তার প্রকার ও তোরণ শুভ্র। অভ্যন্তরভাগ বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য রত্ন ও দ্রব্যে সুশোভিত। এবং চিত্র অলংকৃত। 'ময়দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিক নির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস ও কূর্মে শোভিত। সভাস্থলের সকল দিকেই পুষ্পিত বৃক্ষ শোভিত।

অত্যাশ্চর্য মনোহর রাজগৃহের খ্যাতি অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল ভারতের সর্বপ্রান্তে। দেশ-দেশান্ত থেকে এল বহু সম্ভ্রান্ত বণিক, ধনী, এবং রাজপুরুষেরা। ইন্দ্রপ্রস্থের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে তারা আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হল। বিশাল রাজপ্রাসাদ নবোদিত মেঘের মত আকাশ ব্যাপ্ত করে রইল। [illegible] প্রাসাদ চূড়া সকলের ঊর্ধ্বে শোভা পেতে লাগল। মনে হল, পাণ্ডবের রাজমর্যাদা ও গৌরব এবং তাদের উন্নত মস্তক বহুজনকে বহুদূর থেকে [illegible] জন্যই শুভ্র [illegible] গম্বুজ যেন স্পর্ধাভরে আকাশকে স্পর্শ করে রইল।

ময়ের কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি যুধিষ্ঠিরের মনে [illegible] করল। শত্রুর ঈর্ষা, সক্ষোভ দীর্ঘশ্বাস তাঁকে আনন্দিত করল। তবু [illegible] বৈভবের মধ্যে একটা নিত্য অভাব তাঁর চিত্তপীড়ার কারণ হল। কেবলই মনে হতে লাগল, কি যেন পাওয়া হল না তাঁর। তাকে না পাওয়ার জন্য জীবনটা মরুভূমির মত রিক্ত মনে হল। না পাওয়ার সেই অব্যক্ত ব্যাকুলতা হাহাকার তীব্র হল অন্তরে। নৃপতিদের বিস্ময়, প্রশংসা, উপঢৌকন, সবিনয় সম্ভাষণ যুধিষ্ঠিরের অহংকার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করল। সকল নরপতির অধীশ্বর হওয়ার বাসনার তাঁর চিত্ত অহরহ পীড়িত হতে লাগলো। সেজন্য মন চঞ্চল হল।

যাঁর পরামর্শ ও নির্দেশ ছাড়া যুধিষ্ঠির কোন কার্য করেন না, সেই কৃষ্ণের দেখা নেই এখনও। তাঁকে আনার জন্য দ্বারকায় বিশেষ দূত গিয়েছিল। তবু আসতে অযথা বিলম্ব করছিলেন তিনি। তাঁর অহেতুক দেরী, যুধিষ্ঠিরকে অসহিষ্ণু করল। মনের মধ্যে কেবলই উদ্বেগ বাড়ছিল। তবে কি, কোন কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন কৃষ্ণ ? ময়ের ভিত্তি স্থাপন শেষ হলে তিনিও ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর, চৌদ্দমাস দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে ময় নির্মাণ কার্য শেষ করল। এর মধ্যে একটি বারও এলেন না কৃষ্ণ। যদিও বার বার দূত পাঠানো হয়েছিল তাঁর কাছে। তবুও নয়। অজ্ঞাতসারে এমন কী অন্যায় করলেন ; যে জন্যে কৃষ্ণ তাঁদের পরিত্যাগ করল। দুঃখ অনুশোচনায় কাতর হলেন যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ তাঁর দুঃসহ হল। তাঁকে না পাওয়ার জন্য অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন যুধিষ্ঠির।

এদিকে গোপন কামনার আগুনে অহরহ দগ্ধ হচ্ছিল তাঁর অন্তঃকরণ। চিত্তের অস্থিরতা দূর করার জন্য উন্মুক্ত আকাশতলে এসে দাঁড়ালেন। মৃদু মলয়ে দেহ

প্রশান্ত হল। চিত্ত হল প্রফুল্লিত। মনের বাসনা দূরে আকাশের বুকে স্বচ্ছ দর্পণের মত প্রতিফলিত হল। নীলাকাশে সঞ্চারমান মেঘ মণ্ডলের মধ্যে হঠাৎ স্বর্গত পিতাকে আবিভূর্ত হতে দেখলেন। প্রশান্ত মুখমণ্ডলে তাঁর স্বর্গীয় দীপ্তি। নয়নে মুগ্ধতা। প্রশান্ত দৃষ্টিমেলে তিনি তাকিয়ে রইলেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। রোমাঞ্চিত আবেগে তাঁর সর্বশরীর মুহুর্মুহুর্ শিহরিত হল।

মেঘের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন যুধিষ্ঠির। তারপর করজোড়ে পিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। অমনি আকাশ থেকে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন পাণ্ডু। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেনঃ প্রিয় পুত্র আমার! তুমি পৃথিবী জয়ে সমর্থ। ভ্রাতারা তোমার অনুগত। বৃথাই তুমি মনঃকষ্ট পাচ্ছ। দ্বিধা সংশয় ত্যাগ করে কর্তব্য স্থির কর। শ্রেষ্ঠ নরপতির জন্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। কালমাত্র আর বিলম্ব কর না। এই বলে পাণ্ডু মিলিয়ে গেলেন মেঘের অন্তরালে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যুধিষ্ঠির। অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে। আত্মসম্বিৎ ফিরে এলে দেখতে পেলেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে সম্মুখে। ওষ্ঠাধারে তাঁর চিরপরিচিত সেই মধুর হাসি। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এই অকৃত্রিম বন্ধুটির দেখা পান যুধিষ্ঠির। তাঁকে দেখে আনন্দ ও অভিমানে যুধিষ্ঠিরের চোখে জল এল। কণ্ঠস্বর হল রুদ্ধ। মৃদু অনুযোগ করে বললেনঃ এতদিন কোথায় ছিলে কৃষ্ণ? তুমি ছাড়া আমি অসহায়। আমাদের সঙ্গে তুমি যদি না থাক, তবে এ রাজ্যে লোভ নেই আমার। এ কুবেরের ঐশ্বর্যে আমার কাজ নেই। এই থাকল তোমার রাজ্য, সিংহাসন। আমাকে মুক্তি দাও তুমি।

যুধিষ্ঠিরের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিলেন না কৃষ্ণ। ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল এক স্নিগ্ধ রহস্যময় হাসির রেখা।

এমন অনুযোগ ও অভিযোগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন কৃষ্ণ। তাই সভাগৃহের মনোরম দৃশ্য ও সৌন্দর্য, অনুপম ভাস্কর্য, চারু ও কারু কলার চরমোৎকর্ষ দর্শনের প্রশংসা ও বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি তাঁকে অন্যমনস্ক করে দিলেন। যুধিষ্ঠিরের এত কালের দুর্ভাবনা উদ্বেগ ও ক্ষোভ দূর হল।

পরিবেশ মানুষকে গড়ে নবরূপে, নববেশে। যুধিষ্ঠিরের মত শান্ত নিরীহ, নিস্পৃহ স্বভাবের উদাসীন মানুষের বুকে আজ সম্রাট হওয়ার বাসনা জেগেছে। পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে। ইন্দ্রপ্রস্থ মণিময় সভা নির্মাণের পূর্বে এ বাসনা উদ্রেক হয়নি চিত্তে। এজন্যে কৃষ্ণ বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। কারণ এটাই স্বাভাবিক এবং জীবের স্বধর্ম। ধর্মরাজও প্রবৃত্তির অধীন।

কৃষ্ণের মনীষা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও কর্তৃত্বের ক্ষমতার উপর যুধিষ্ঠিরের অসীম আস্থা। কৃষ্ণকে তাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর কাছে মনের গোপন বাসনা উদ্ঘাটিত না করা অবধি যুধিষ্ঠির শান্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু, বলতে তাঁর সংকোচ হচ্ছিল। বলি বলি করেও দ্বিধা উত্তীর্ণ হতে পারছিলেন না যুধিষ্ঠির। কারণ কৃষ্ণ তাঁকে নির্লোভী বলেই জানে। এখন লোভীর মত লোভ প্রকাশ করতে তাঁর লজ্জা করছিল।

তাঁর অবরুদ্ধ কামনা বাসনার কথা জানলে, কৃষ্ণ কি মনে করবেন, ভেবে আকুল

হলেন যুধিষ্ঠির। তিনি নিজেও জানেন লোভ থেকে অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতার জন্ম, এবং পরিণামে তা অনিবার্য সংঘর্ষের সূচনা করে।

পাণ্ডবদের বৈরাগ্যদীপিত জীবনচর্চার প্রশংসা করে কৃষ্ণ কতবার বলেছে—"জান হে ধর্মরাজ! এই অলস ঐশ্বর্যভোগীরা শুধু আপনাকে নিয়ে মত্ত। কোনদিন তারা দেশ ও জাতির ভাল চায় না। জাতিকে আত্মকলহে লিপ্ত রেখে তারা নিশ্চিন্ত মনে ক্ষমতা ভোগ করে। এরা শুধু চায় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব। ভোগ ও বিলাসিতায় জীবনটাকে বাজে খরচ করতে। দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে উৎপীড়নকেই ভাবে রাজধর্ম। বাহুবলকে মনে করে ক্ষাত্রশক্তি। ধর্ম, ন্যায়, নীতি এদের হাতে বন্দী। এদের ধ্বংস না হওয়া অবধি দেশ ও জাতির মুক্তি বা শান্তি নেই।" শুনতে শুনতে যুধিষ্ঠির কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। সে কথা চিন্তা করে যুধিষ্ঠিরের অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। তার অবস্থা দেখে কৃষ্ণের অধর প্রান্ত মৃদু কৌতুকে বক্র হচ্ছিল। নীরবতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণ বললেন: বন্ধু এত চিন্তা কিসের? আমি তো সর্বক্ষণ আছি তোমাদের সাথে। তোমাদের সব দায়-দায়িত্ব আমিই নিলাম, তোমাদের কল্পনা ভাবনার রূপায়ণের দায়িত্বও আমার। এজন্য তোমাকে কুণ্ঠিত হতে হবে না। নিশ্চিন্তে তোমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করতে পার। আমি কিছুই মনে করব না।

যুধিষ্ঠির খুশি হলেন। সংকোচ দূর হল। বুক থেকে যেন পাষাণ নেমে গেল। মনটা হাল্কা প্রসন্ন হল। কৃষ্ণের হাত দুটি ধরে আবেগ গাঢ় স্বরে বললেন, আমাকে লোভ থেকে বাঁচাও তুমি। আমাকে দুর্ভাবনা মুক্ত কর। তোমার হাতেই আমার মুক্তি, আমায় শুধু পথ বলে দাও।

যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মাত্মার পক্ষে এরূপ বিহ্বলতা খুবই স্বাভাবিক। তাই কৃষ্ণ কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হলেন না। তাঁর আকুল করা জিজ্ঞাসার রহস্য কৃষ্ণ অনুমান করতে পারেন। তবু, না বোঝার ভাণ করে বললেন, মহাত্মা! আপনি এত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? নির্ভয়ে বলুন। আমি আপনার উৎকণ্ঠা দূর করব।

কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাসে আশ্বস্ত হলেন যুধিষ্ঠির। প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন: গোপেশ, দেহ ধারণ করলে মানুষ ষড়রিপুর অধীন হয়। আমিও রিপুর বশবর্তী হয়ে চিন্তা করি পূর্ব-পুরুষদের মত রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সকল নরপতির অধীশ্বর তথা সম্রাট হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করি। আমার স্বর্গত পিতা মহারাজ পাণ্ডু মেঘমণ্ডলে আবির্ভূত হয়ে আমাকে সেরূপ পরামর্শই দিলেন। এখন তুমি বল, এই দুরূহ কর্ম কী উপায়ে আমি সম্পন্ন করব? তোমার পরামর্শ এবং সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে একসঙ্গে কথাগুলো বলল যুধিষ্ঠির। কথা শেষ হওয়ার পরেই কেমন একটা লজ্জায় রাঙা হল তাঁর মুখ। যুধিষ্ঠিরের সবিনয় আত্মসমর্পণে মুগ্ধ হলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য বললেন: এ তো অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব। রাজার মত কথা। এতক্ষণ এই চিন্তা করেই ব্যাকুল হচ্ছিলেন আপনি?

একমুহূর্ত থামলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। কৃষ্ণের এই ভাবান্তরের সঙ্গে

যুধিষ্ঠির পরিচিত। তবু, ভয়ে ভাবনায় অস্থির তিনি। ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন: কৃষ্ণ, ভাই আমার!

যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে বেশী দেরী হল না তাঁর। প্রসন্ন কৌতুকে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় প্রসারিত হল। বললেন,—কৌন্তেয়, আমার কথাটি আপনি জানলেন কেমন করে? রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তাব আমিই দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। সে সামান্য সাধটুকু পূরণের সময় পর্যন্ত পেলাম মা।

যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন: অমন করে বল না, ভাই কৃষ্ণ। তুমিই সব। তোমার জন্যে এত সব হয়েছে। তোমার জন্য রাজ্য ফিরে পেয়েছি। তোমার ব্যবস্থাপনাই আমাদের গৌরবান্বিত করেছে। পাণ্ডবদের মুকুটমণি তুমি। তোমাকে বাদ দিয়ে পাণ্ডবেরা ভাবতে পারে না কিছুই। তুমি তাদের একমাত্র আশ্রয়। অজ্ঞাতবশত যদি অপরাধ করে থাকি, তাহলে, হে পাণ্ডব সখা, ক্ষমা কর তারে।

যুধিষ্ঠিরের বিনয় বচনে অভিভূত হলেন কৃষ্ণ। আশ্চর্য মানুষ যুধিষ্ঠির। শিশুর মত সরল সহজ। সামান্য কৌতুক পর্যন্ত বোঝেন না। লঘু ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই কৃষ্ণ নিজেই লজ্জায় পড়লেন। তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরের হাত দুটি ধরে বললেন: মহারাজ, আপনার দুঃখ প্রকাশের কোন কারণ নেই। আমি কেবল কৌতুক করছিলাম মাত্র।

কৃষ্ণকে খুব গম্ভীর দেখাল। দৃষ্টি বক্র হল। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ললাটে।

পাণ্ডবদের হৃদয় জয়ে কৃতকার্য হয়েছেন কৃষ্ণ। তাদের জীবন ও কর্মে কৃষ্ণ এখন অপরিহার্য। কৃষ্ণের পরামর্শ ও সাহায্য ব্যতীত পাণ্ডবেরা কিছু চিন্তা করে না। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কৃষ্ণের উপর তারা অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণও সেকথা জানে। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁকেই। পাণ্ডবদের হিতসাধনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি নীতি-নির্ধারণের পক্ষপাতী। ভারতের রাজনীতি কলুষিত করছে জরাসন্ধ। শুধু তাই নয়, সকল নৃপতির আতঙ্ক সে। তার অমানবিক কার্যকলাপ থেকে অসহায় নৃপবর্গকে রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে তাঁকে। যদিও জরাসন্ধের প্রবল প্রতাপ ও প্রতিপত্তি, বিপুল যশ কৃষ্ণকেও ঈর্ষান্বিত করে। একদিন এই জরাসন্ধের ভয়ে পিতৃ-পিতামহের রাজ্য মথুরা ত্যাগ করে তাঁকে পশ্চিমতটের গিরিদুর্গ রৈবতকে পালাতে হয়েছিল। পলায়নের সেই লজ্জা, গ্লানি, বেদনা এখনও ভুলতে পারেননি কৃষ্ণ। সে কথা মনে হলে প্রবল প্রতিহিংসা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁকে অধীর করে তোলে। পুরানো শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কত পরিকল্পনা কত আয়োজন লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁকে করতে হয় নিত্য। অথচ কেউ তার সন্ধান পর্যন্ত রাখে না। সব কাজই ঠিক সময়ে ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। ইন্দ্রপ্রস্থের ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। এখন বাকী সামান্যই। যুধিষ্ঠিরের সম্রাট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তবে কি সেই মহালগ্ন সূচনা করল? অমনি রোমাঞ্চিত হল তাঁর তনু মন। অনেকক্ষণ ধরে তার পুলকানুভূতি উপভোগ

করলেন। দিব্য চোখে, অনাগত ভবিষ্যতের এক ছবি তিনি কল্পনা করে নিলেন। তারপর, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ধর্মরাজ! রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী আপনি নন। সম্রাট ভিন্ন অন্য কেউ রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী হয় না। আপনি সামান্য একজন নৃপতি মাত্র। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাকে জয় না করা অবধি আপনার রাজসূয় যজ্ঞের কোন অধিকার নেই। এটাই শাস্ত্রীয় বিধান।

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল সেই কক্ষে। কৃষ্ণের মুখে রূঢ় কথা শোনার জন্য যুধিষ্ঠির মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই, কৃষ্ণের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অখণ্ড নীরবতা নামল সেখানে। যুধিষ্ঠিরের আশার দীপ যেন এক ফুৎকারে নিভে গেল। অতঃপর, কি ভেবে দিশাহারা হল যুধিষ্ঠির। তাহলে, রাজসূয় যজ্ঞ হবে না। পিতার বাসনা পূর্ণ হবে না? যুধিষ্ঠিরের বুকের ভেতরটার হাহাকার করে উঠল।

ভীম ও অর্জুন সে সময়ে উপস্থিত হল সেখানে। কৃষ্ণের জলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি তাদের কর্ণে প্রবেশ করল। বিস্মিত ভীমার্জুন পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। এক দুর্মর প্রতিজ্ঞায় তাদের হাতের পেশী ফুলে উঠল। কিন্তু কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির ভীষণ মৌন। মানব-দানব বলে খ্যাত জরাসন্ধকে কৃষ্ণও ভয় পায় তাহলে! আশ্চর্য লাগল ভীমের। যুধিষ্ঠিরের নিরুত্তর অবস্থা মোটেই সহ্য হল না তার। অসহিষ্ণু হয়ে ভীম বলল: একটি লোককে এত ভয় পাওয়ার কি আছে? কে সে? কৃষ্ণ, ভীমার্জুনকে ভয় করে না?

ভীমের শিশুসুলভ আস্ফালন কৃষ্ণের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। কিন্তু তার গর্ব ও অহংকারে আঘাত করলেন না কৃষ্ণ। তিনি মৃদুস্বরে বললেন: একা নয় সে মধ্যমপাণ্ডব। সে বহু। সে বিরাট। সকল রাজাকে পরাস্ত করে, বশীভূত করে শ্রেষ্ঠ নরপতির সম্মান ও গৌরব অর্জন করেছে সে। এখন সম্রাট সে। অসীম তার বাহুবল। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই তাঁর অধীন। প্রতাপশালী জরাসন্ধের সেনাপতি। 'করূষ দেশের রাজা মহাবল বক্র, করভ, মেঘবাহন প্রভৃতি রাজা এবং আপনার পিতার সখা মুর ও নরক দেশের অধিপতি বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্ত, এঁরা সকলে জরাসন্ধের অনুগত। বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কিরাতের রাজা পৌণ্ড্রকও জরাসন্ধের পক্ষে। ভোজবংশীয় মহাবল ভীষ্মকও জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বহু দেশের রাজারা জরাসন্ধের ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।'

এত সব সংবাদ অজ্ঞাত ছিল পাণ্ডবদের। কৃষ্ণের মুখে জরাসন্ধের শৌর্যবীর্যের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির ইতিবৃত্ত শুনে যুধিষ্ঠির সহ ভীম ও অর্জুন অত্যন্ত বিস্মিত হল। হতাশ হয়ে কৃষ্ণকে জিগ্যেস করলেন: জরাসন্ধ জয়ে তুমিও অশক্ত কৃষ্ণ?

যুধিষ্ঠিরের মুখে এতবড় একটা প্রশ্ন শুনবার জন্য কৃষ্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। তাই একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খুব অল্পক্ষণের জন্য। কতকটা উদাসীনের মত যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বললেন: আপনার মত সরল সত্যবাদীই এরূপ প্রশ্ন করতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই, চেষ্টা করেও মহাবীর্যশালী মহামতি জরাসন্ধকে পারেনি পরাস্ত করতে। কিন্তু সেজন্য একটুও লজ্জিত বা অনুতপ্ত নই আমরা। বরং তার মত প্রবল প্রতিপক্ষকে বারংবার প্রতিহত করার

ক্ষমতা ও শক্তি যাদবদের ছিল বলে গর্ব অনুভব করি। ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও সাত্বতদের কেউই জরাসন্ধের সঙ্গে অগ্রে বিবাদে লিপ্ত হয়নি। সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাই ছিল শান্তিকামী যাদবদের রাষ্ট্রনীতি। কিন্তু দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য কংসবধের প্রয়োজন হয়েছিল। তারপর থেকেই জরাসন্ধের আক্রমণের লক্ষ্য হল যাদবেরা। কারণ কংসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যাদব রাজ্যগুলির উপর তাঁর সকল কর্তৃত্বের অবসান হল। যাদব রাজ্যগুলি হল মুক্ত ও স্বাধীন। এতবড় একটি রাজনৈতিক পরাজয়কে জরাসন্ধ নীরবে মেনে নিতে পারল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাদব রাজ্যগুলি একত্রিত ও সংহত হওয়ার পূর্বেই তাদের আক্রমণ করল সে। কিন্তু জরাসন্ধের রাজনৈতিক মতলব সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম। তাই সব ব্যবস্থা আগে থাকতে তৈরী ছিল। সে কারণে যাদব রাজ্য অবরোধ করেও পারল না পরাস্ত করতে। তখন, জরাসন্ধ সাময়িকভাবে তার বিপুল সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিল। কিন্তু সে ছিল তার রণকৌশল। তাই কিছুদিন পর, আবার মথুরা আক্রমণ করল। তার আক্রমণ এবার ছিল আমার বিরুদ্ধে। তাই যাদবেরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, জনগণের যাতে বিপদ না হয় সেজন্য পলায়নই উচিত মনে করলাম। কেন জান? জরাসন্ধের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে তিনশত বৎসর একাদিক্রমে যুদ্ধ করলেও তাকে পরাস্ত করতে পারব না। অকারণ রক্তক্ষয় সার হবে। তাকে নিরস্ত করার জন্য মথুরা ত্যাগ করলাম।

এই অবধি বলে থামলেন কৃষ্ণ। স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। অতি সুন্দর, মনোহর সে দৃষ্টি। যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ মনে হল। শূন্যদৃষ্টি মেলে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির সম্রাট হওয়ার বাসনা বিসর্জন দিল। মনের মধ্যে তাঁর অসংখ্য প্রশ্ন। যাদব রাজ্যগুলি একত্রিত হয়ে যেখানে মহাবল জরাসন্ধকে পরাস্ত করতে সক্ষম হল না সেখানে কোন মন্ত্রবলে তাকে জয় করবেন তিনি? বাহুবলও ভরসা বলতে ভীম, অর্জুন ও কৃষ্ণ। সহায় দ্রুপদরাজ। কিন্তু দ্রুপদরাজ এখনও অর্জুনের গুরুদক্ষিণার বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে উঠতে পারেনি। যুধিষ্ঠির নিজে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। মিত্র রাজ্যগুলি তাঁর দূর-দূরান্তে অবস্থিত। এরূপ অবস্থায় মহাবল পরাক্রান্ত মগধাধিপতিকে জয় করা অসম্ভব। সম্রাট হওয়ার চিন্তা দুরাশা মাত্র। পূর্বাপর বিবেচনা না করে কৃষ্ণের কাছে সম্রাট হওয়ার উচ্চাশা প্রকাশের জন্য যুধিষ্ঠির ভীষণ লজ্জা অনুভব করল। কৃষ্ণের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সংকোচ হচ্ছিল তাঁর। লজ্জায় অনুশোচনায় হতাশায় তাঁর অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হতে লাগল।

কিন্তু ভীমার্জুনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তারা নির্বিকার। মুখে তাদের কোন উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনার রেখা পর্যন্ত পড়েনি। মনে হল, জরাসন্ধের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল তারা এবং কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করেছিল। কৃষ্ণ থামতেই ভীম ও অর্জুন সমস্বরে প্রশ্ন করল: থামলে কেন কেশব? বল, কি চিন্তা করছিলে তুমি?

কৃষ্ণ বললেন ঃ যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ দু'উপায়ে করা যায়। এক অস্ত্রের দ্বারা আর এক কৌশলের দ্বারা। অস্ত্র যুদ্ধে সম্মুখে সমরে জরাসন্ধকে পর্যুদস্ত করা ভীষণ কঠিন এবং অসম্ভব। বাহুবলে যে কাজ অসম্ভব, বুদ্ধিবলে বা কৌশলে সে কাজ করা অনেক সময় সহজ হয়। তাই জরাসন্ধকে দুর্বল করার জন্য নানারকম কৌশল করতে হল আমাকে।

জরাসন্ধের শক্তির দুই স্তম্ভ হল হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল। অস্ত্রাঘাতে কোনদিনই হত্যা করা যায় না তাদের। সুতরাং তাঁদের মৃত্যু জরাসন্ধকে দুর্বল ও হতোদ্যম করতে পারে। ঠিক তখনই হংস নামে এক নরপতিকে সংগ্রামে সংহার করেছিল বলরাম। ডিম্ভক লোকমুখে শুনেছিল হংস নিহত হয়েছে। নাম সাদৃশ্য এই মিথ্যা প্রচারে ডিম্ভক অত্যন্ত মর্মাহত হল। বন্ধুবিয়োগে কাতর হয়ে অবশেষে যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন করল সে। পরে, হংস জানতে পারল যে তার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করে পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্ভক জীবন বিসর্জন দিয়েছে। তখন শোকার্ত হংস বন্ধুর বিরহে উন্মাদ হয়ে যমুনায় আত্মসমর্পণ করল। দুই মহাবলের মৃত্যু-সংবাদে জরাসন্ধ অত্যন্ত শোকার্ত ও উদ্বিগ্ন হল। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে হল তার। তবু বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৎক্ষণাৎ মথুরা আক্রমণে সাহসী হল না। এই অবকাশে যাদবরাও বৃন্দাবন ছেড়ে আরও পশ্চিম দিকে চলে গেল। এবং রৈবতক পর্বতে তাদের রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করে তথায় বাস করতে লাগল।

যুধিষ্ঠির আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন ঃ কৃষ্ণ, তুমি নিজে যখন জরাসন্ধকে ভয় কর তখন আমি কি করে নিজেকে তোমার চেয়ে অধিক বলবান মনে করব? সম্রাট হওয়ার সাধ আমার মিটেছে।

বিস্ময়ে হতবাক হল ভীম। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করে বলল—সে কি! একটি মাত্র লোকের জন্য পণ্ড হবে জ্যেষ্ঠের বাসনা? না, কিছুতেই নয়।

হাসি পেল কৃষ্ণের। মৃদুস্বরে বললেন ঃ তোমার মত বলদর্পীর এ অধীরতা প্রশংসনীয়। কিন্তু বিবেচনাহীন কর্মের পরিণাম দুঃখজনক।

প্রত্যুত্তরে ভীম বলল ঃ তুমি ভয় পাচ্ছ কৃষ্ণ। তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করছো।

ভীমের নির্ভয় চক্ষুদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন কৃষ্ণ। বললেন ঃ কারণ আছে বন্ধু। রাজসূয় যজ্ঞ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ একার্থক নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে বশ্যতার ফাঁকি ধরা পড়ে। কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞে তা হবার উপায় নেই। এখানে রাজাকে প্রকাশ্য অধীনতা স্বীকার করতে হয়। তাকে শ্রেষ্ঠ নরপতির সম্মানের জন্য অর্থের প্রণামী দিতে হয়। নিয়মিত রাজস্ব পাঠাতে হয়। নৃপতির অধীনতা তাই আর গোপন থাকে না। সব দিক ভেবেচিন্তে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আর সেজন্য দরকার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

একটু ইতস্তত করে যুধিষ্ঠির বললেন ঃ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বলতে—তুমি কি, কোন ছলনার কথা বলছ কৃষ্ণ?

কৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হল। উষ্মা প্রকাশ করে জোরের সঙ্গে বললেন ঃ আপনি যাকে ছলনা মনে করেন আমি তাকেই বলি কৌশল। কৌশল জীবের স্বভাব ধর্ম। দেহ ধারণ করলে প্রাণরক্ষা করতে হয়। প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণীকে নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়। আমি একেই কৌশল বলি। কৌশল মানেই সর্বদা ছলনা বা মিথ্যাচারণ নয়। তবু, ছলনা, প্রতারণা কৌশলের অঙ্গ। শাস্ত্রে আছে কৌশলের দ্বারা যদি কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়, তবে তার তা করা উচিত। আর, রাজনীতি তো কৌশল ছাড়া অচল। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতি মুহূর্তে নিত্য নতুন কৌশল বদলাতে হয় রাজনীতিতে। রাজনীতি হল বুদ্ধির খেলা। কৌশলের সময়োচিত সঠিক প্রয়োগই রাজনীতির সাফল্যের চাবিকাঠি। রাজনীতিজ্ঞের কৌশল করা তাই অন্যায় বা অধর্ম নয়। রাজনীতিতে কপটতার আশ্রয় নেওয়া দোষের নয়।

অর্জুন তৎক্ষণাৎ বলল ঃ কৃষ্ণের সঙ্গে আমি একমত। রাজনীতির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ নীতিবোধগুলোকে এক করে দেখা ঠিক নয় : রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

যুধিষ্ঠির নিরুৎসাহ হয়ে বললেন ঃ রাজসূয় যজ্ঞ করা যখন এতই কঠিন, তখন আমি সে অভিলাষ ত্যাগ করলাম।

কৃষ্ণ অবাক হয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অত্যন্ত দুর্বলচিত্তের ব্যক্তি যুধিষ্ঠির। সেজন্য কৃষ্ণ সর্বদাই উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মাঝে মাঝে এমন অবিজ্ঞোচিত কাজ করেন যুধিষ্ঠির যা তাঁর মত দায়িত্বসম্পন্ন রাজার পক্ষে আদৌ শোভন নয়।

যুধিষ্ঠিরের উক্তি ভীমার্জুনকে বিস্মিত করল। জ্যেষ্ঠের মত পরিবর্তনে ভীম ক্রুদ্ধ হল। উষ্মা প্রকাশ করে বলল ঃ যে রাজা যুদ্ধ পরাঙ্মুখ এবং নিজেকে দুর্বল ও উপায়শূন্য ভেবে অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট থাকে, বলবান হওয়া সত্ত্বেও সে প্রতাপশালী নৃপতির অধীনস্থ হয়।

ভীমের বচন অনুসরণ করে কৃষ্ণ বললেন ঃ ভারতকুলপ্রদীপ মগধাধিপতি জরাসন্ধ যুদ্ধ পরাঙ্মুখ দুর্বল ছিয়াশিজন নৃপকে সহজেই পরাভূত করে রাজধানী গিরিব্রজে বন্দী করে রেখেছে। জরাসন্ধ ঘোষণা করেছে আর মাত্র চোদ্দজন নৃপ পেলে শত সংখ্যা পূর্ণ হবে তার। তখন ঐ একশত বন্দী নৃপগণকে সে বলি দেবে মন্দিরে। শুধু নারকীয় উল্লাস চরিতার্থতা করতে একশত নিরীহ শান্তিকামী নিঃসহায় নৃপ-বর্গকে পশুর মত বধ করবে। আর, নিবীর্যের মত আমরা দাঁড়িয়ে তা দেখব। হায়, ধিক, এই মনুষ্যজীবনের। এতগুলি প্রাণনাশের জন্য আপনার হৃদয় কি একটুও বিচলিত হচ্ছে না? মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দী রাজাদের মৃত্যুর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার দুঃসহ যন্ত্রণা এবং বিষণ্ণ বেদনার কথা চিন্তা করে কি আপনার হৃদয় অস্থির হচ্ছে না? গিরিগুহার অভ্যন্তরে বন্দী মানবাত্মার অসহায় বিলাপধ্বনি আপনার হৃদয়কে কি বিদীর্ণ করে না? তাদের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রাণভিক্ষার করুণ আবেদন আপনি কি শুনতে পান না? নরাধম পশুর হাত থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য আপনার করণীয় কি কিছুই নেই? আপনার মানবিক সহানুভূতি আশা করা তাদের অন্যায় কি?

কৃষ্ণের প্রশ্নবাণে যুধিষ্ঠির জর্জরিত হলেন। অনুশোচনার মর্ম বেদনায় কাতর হল তাঁর হৃদয়। বেদনায় টনটন্ করতে লাগল বুক। আর স্থির থাকতে পারলেন না যুধিষ্ঠির। ব্যাকুল হয়ে বললেনঃ থাম থাম কৃষ্ণ। আর সইতে পারছি না। উঃ কী বীভৎস! কী কুৎসিত! বলে, দু-হাতে মুখ ঢাকলেন যুধিষ্ঠির।

দুশ্চিন্তার অবসান হল কৃষ্ণের। একটু একটু করে শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এল যুধিষ্ঠির। নির্ণিমেষ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণ। চোখে তাঁর মুগ্ধতা। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বললেনঃ মহারাজ। পাষণ্ড জরাসন্ধের মনুষ্যত্ববিরোধী বীভৎস হত্যার বিরুদ্ধাচরণ না করলে, ছিয়াশি জন বন্দী নরপতি সহ আরও চোদ্দ জন বন্দীর প্রাণ রক্ষা হয় না। তাদের উদ্ধারের জন্যেই জরাসন্ধের সঙ্গে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়েছে। হে মহাত্মা! যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের পাপ অভিসন্ধি ব্যর্থ করতে সক্ষম হবে, তার যশোরাশি ভূমণ্ডলে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ভারত সাম্রাজ্যের সে অধীশ্বর হবে। ছিয়াশিজন বন্দী নরপতি হবে তার অনুগত বান্ধব ও পরম মিত্র। তাঁদের সৈন্য, সম্পদ ও ঐশ্বর্য হবে তার সহায়। সুতরাং, এ অভিযানের রাজনৈতিক তাৎপর্য খুবই বেশী।

অর্জুন বলল: রাজন! শ্রেষ্ঠ ধনু শর, অক্ষয় তুণ, গদা, রথ আমাদের হস্তগত। বলবীর্যের অধিকারী হয়ে কি কারণে আমরা দুর্বল ভীরু কাপুরুষের মত যুদ্ধ-বিমুখ হব? কৃষ্ণ আমাদের সহায়। কৃষ্ণ আমাদের পথ প্রদর্শক।

ভীম বলল—কৃষ্ণ, অর্জুন এবং আমি এই তিনজনে মিলে সহজেই জরাসন্ধকে জয় করব। আপনি অকারণ উদ্বিগ্ন হবেন না।

তবু যুধিষ্ঠিরের সংশয়ের শেষ নেই। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেনঃ ভীমার্জুন আমার দুই চোখ, কৃষ্ণ আমার মন। যুদ্ধবিলাসী দুরাত্মা জরাসন্ধের কাছে এদের পাঠিয়ে আমি কি করে জীবন ধারণ করব? কি হবে আমার রাজসূয় যজ্ঞ করে? ক্ষমা কর কৃষ্ণ! জরাসন্ধের শত্রুতা আমি চাই না। চাই না আমি সম্রাট হতে।

সুমিষ্ট বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে কৃষ্ণ বললেনঃ মহারাজ, আপনি উতলা হচ্ছেন অকারণে। স্বার্থপর ব্যক্তির মত আপনি শুধু নিজের কথাই ভাবছেন। আপনার আচরণে মনের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে। জরাসন্ধের বিরুদ্ধে অভিযান করলে আপনার গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সর্ব সাধারণের উপকার ও কল্যাণ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আপনি ভুলেও তা চিন্তা করছেন না। কিন্তু আমি করছি। রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গত পিতার পরামর্শ পালনের জন্যে আমি কোন উপদেশ দিতে আসিনি। বন্দী নরপতির পরিজনদের গভীর দীর্ঘশ্বাসে আমার রাতের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। দিনের কর্মের ব্যাঘাত ঘটে। আমার সমস্ত হৃদয় আজ তাদের জন্য দুঃখকাতর। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ আজ আপনার মতই ভীরু, দুর্বল এবং অবলম্বনহীন। এইসব দুঃখী, দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মত মানুষ নেই। দুর্দিনে বন্ধু হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি নেই। তাই, রাজন, প্রতিবিধানের জন্য মহাবল ভীম ও অর্জ্জুনের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আপনার অনুমতি পেলে তাদের নিয়ে যাত্রা করতে পারব। মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজের মঙ্গলের জন্য তাকে বধ করা

দরকার। জরাসন্ধ নিহত হলে ধর্ম রক্ষা পাবে। সর্বজনের হিতকর কার্যের আশীর্বাদ আপনাকে যশস্বী করবে।

কৃষ্ণের বাগ্মীতায় আশ্চর্য হলেন যুধিষ্ঠির। অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটা সুন্দর অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় পরিপ্লুত হল। কৃষ্ণের কথায় যুক্তি ছিল। সত্যিই স্বার্থপরের মত তিনি নিজের কথাই ভেবেছেন শুধু, অন্যের কথা একবারও মনে হয়নি তাঁর। জরাসন্ধের অত্যাচারের বিভীষিকা তাঁকে সন্ত্রস্ত রেখেছে। তাই, সর্বজনের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা উদয় হয়নি তাঁর মনে। এই বিস্মৃতির জন্য তাঁর হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হল। কৃষ্ণ যথার্থই পাণ্ডব সুহৃৎ। তাই রাজকর্তব্য স্মরণ করে দিলেন তাঁকে। স্বধর্ম ভ্রষ্ট হওয়ায় আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা করলেন। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় ভরে গেল তাঁর অন্তর।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যুধিষ্ঠির বললেনঃ দেবকীনন্দন, তুমি ঠিক বলেছ। অধম বলে, তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। মূঢ় আমি, আমায় তুমি ক্ষমা কর ভাই। সংশয় আমার দূর হয়েছে। ভয় গেছে ঘুচে। এখন অনুমতি দিতে আর বাধা নেই। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

সবিনয়ে কৃষ্ণ উত্তর করলেন—অমন করে লজ্জা দেবেন না আমায়। অধীনকে আজ্ঞা করে কৃতার্থ করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন—কৃষ্ণ তোমার সব কথাই রহস্যময়। কেমন যেন হেঁয়ালীপূর্ণ! ভাল করে বুঝতে পারি না সব। আমিতো ভাবতেই পারছি না। মহাবল জরাসন্ধের সঙ্গে তোমরা তিনজন যুদ্ধে কি করে জয়ী হবে?

অভয় হাস্যে কৃষ্ণের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হল। স্মিত হেসে বললেনঃ জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশি। তাদের সঙ্গে সংগ্রামের কোন ইচ্ছাই আমাদের নেই। আমরা দ্বৈরথ যুদ্ধ করব জরাসন্ধের সঙ্গে। সেই আমাদের শত্রু। দুরাত্মাকেই দিতে হবে পাপের দণ্ড। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনীর লোকজনেরা তো কোন অপরাধ করেনি। পাষণ্ড জরাসন্ধের দুষ্কৃতির জন্য নিরপরাধ, নির্দোষ সৈনিকেরা দণ্ডভোগ করবে কেন? একজন স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী দুরাত্মা সম্রাটের জন্য তাদের ঘরের শান্তি নষ্ট হবে কেন? মা কেন বিলাপ করবে সন্তানের জন্য? স্ত্রী কেন তার স্বামী হারাবে? পুত্র পাবে না কেন তার পিতাকে? দোষ যখন জরাসন্ধের তখন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হবে।

যুধিষ্ঠির বললেনঃ এতো খুবই উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু জরাসন্ধ তার সৈন্য-বাহিনীকে বাদ দিয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে কেন?

কৃষ্ণের ওষ্ঠপ্রান্তে বক্র হাসির রেখা ধারালো হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বললেনঃ সম্রাট জরাসন্ধকে সুকৌশলে দ্বৈরথ সংগ্রামের আহ্বান করব আমরা। অপযশের ভয়ে জরাসন্ধ কখনই তা প্রত্যাখ্যান করবে না। সেই যুদ্ধেই তাকে যেতে হবে শমন ভবনে। কারণ, শারীরিক বল, সাহস শিক্ষা ও রণকৌশল যার বেশী আয়ত্ত, সেই হবে জয়ী।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন কৃষ্ণ। কিন্তু যুধিষ্ঠির তার এক বর্ণও

বুঝলেন না। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর পূর্বে হয়নি কখনও। তাই, যৎপরনাস্তি বিব্রত ও অপ্রতিভ হয়ে কৃষ্ণকে ধরা গলায় জিগ্যেস করলেনঃ দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বানের হেতুটা কি ?

কৃষ্ণের উত্তর প্রস্তুত ছিল। জবাব দিতে তাই দেরি হল না। প্রসন্ন চিত্তে বললেনঃ রাজন! আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সবিনয়ে নিবেদন করব জরাসন্ধকে। বন্দী মুক্তি অথবা রণ, দুটোর একটা বেছে নিতে বলব তাকে। জরাসন্ধ বীর। যুদ্ধ প্রস্তাবই গ্রহণ করবে সে। কিন্তু মল্ল যুদ্ধেই বধ করতে হবে তাকে।

যুধিষ্ঠিরের মনে তবু সংশয়। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। তার ব্যাকুলতা দেখে কৃষ্ণ বললেনঃ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে আমরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জরাসন্ধের প্রাসাদে প্রবেশ করব। তস্করের মত গোপনে নয়; বীরের মত প্রকাশ্যে। ফটক দিয়ে রাজগৃহে প্রবেশ করব না, অদ্বার দিয়ে শত্রুভাবেই ঢুকব।

যুধিষ্ঠিরের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন মল্ল যুদ্ধই যে হবে তুমি কি করে জানলে ?

এ আমার নিছক অনুমান। জরাসন্ধ আপনার বাহুবল সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত। সেখানে অর্জ্জুন বা আমার সঙ্গে কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না। নিজের বীর্যবত্তার এক নব দিগন্ত উন্মোচনের জন্য মল্লযুদ্ধকেই সে বেছে নেবে। এবং সর্বাপেক্ষা বলবান ভীমসেনকেই তার যোগ্য যোদ্ধা রূপে গ্রহণ করবে।

কৃষ্ণের চাতুর্যপূর্ণ উক্তি যুধিষ্ঠিরকে অভিভূত করল। পাপিষ্ঠ জরাসন্ধকে শাস্তির কি সুন্দর কৌশলই না ক'রেছে কৃষ্ণ! যত ভাবেন ততই আশ্চর্য হন। যুদ্ধ না করে লোকক্ষয় না ঘটিয়ে প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট জরাসন্ধকে পরাস্ত করার এই আয়োজন তাঁকে কৃতজ্ঞ করল। দু'হাত তুলে কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করলেন। স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করে বললেনঃ তোমার যাত্রা শুভ হোক কৃষ্ণ। জয় হোক তোমার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাদব সমবায় সংঘের অন্যতম শত্রু জরাসন্ধ ভীমের হাতে নিহত হল। বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা জরাসন্ধ বধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শেষ হল না কৃষ্ণের কাজ। বৃহৎ কর্মযজ্ঞের একটি পর্ব কেবল সমাপ্ত হল। এখনও বাকী অনেক। ধীরে সুস্থে কাজ করবার মত একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরী হল। এখন থেকে পাণ্ডবদের রাজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এবং এক অখণ্ড ভারতরাজ্য গঠনের জন্য অনেক বেশি সময় দিতে পারবেন তিনি।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক দূর হল। এখন তাঁর সম্রাট হওয়ার আর কোন অন্তরায় রইল না। তবু তা সহজে সম্পন্ন হবে বলে কৃষ্ণের মনে হল না, গোলযোগ করা যাদের স্বভাব তারা ইতিমধ্যেই তা শুরু করে দিয়েছে।

কৃষ্ণকে জরাসন্ধের মৃত্যুর জন্য তারা দায়ী করল। কৃষ্ণ এবং যাদবদের উপর জরাসন্ধ গোষ্ঠীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। বিশেষ করে জরাসন্ধের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত স্নেহভাজন নৃপতি ও সেনাপতি শিশুপাল এখনও জীবিত। শিশুপাল কৃষ্ণকে আদৌ পছন্দ করে না। প্রচণ্ড কৃষ্ণ বিদ্বেষী সে। যদিও কৃষ্ণ তার আত্মীয়, তথাপি কৃষ্ণ প্রধান শত্রু তার।

জরাসন্ধের মিত্রপক্ষেরা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাণ্ডবদের স্বপ্নপুরী ইন্দ্রপ্রস্থকে যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। কারণ অন্তরে তারা যাদবদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করলেও পাণ্ডবদের তারা খুবই সমাদর করে। তবু অগাধ কৃষ্ণপ্রীতির শাস্তিস্বরূপ তারা আক্রান্ত হতে পারে। পাণ্ডবদের উপর এরূপ একটা বিপরীত চাপ সৃষ্টির আশংকা প্রবল বলে কৃষ্ণের মনে হল। সেজন্য উদ্বিগ্নও তিনি।

এই অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকার্য বিপন্ন হতে পারে। বাহু বলে অথবা প্রীতিবলে অন্য রাজ্য জয় করলে সে বাধা সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কৃষ্ণ তার উপায় চিন্তা করছিলেন। কালবিলম্ব না করে পাণ্ডবদের রাজ্য দিগ্বিজয়ে যাত্রা করা দরকার। শত্রু বোঝার আগেই তারা যদি চতুর্দিক থেকে একযোগে আঘাত হানে তাহলে চকিতে হতভম্ব হয়ে পড়বে তারা। জরাসন্ধ গোষ্ঠীরা এখনও অভিভাবকহীন। সমগ্র ঘটনা ভাল করে পর্যালোচনা করে উঠতে পারেনি তারা। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। এই সময় পাণ্ডবেরা ঝটিকার বেগে দিগ্বিজয়ের অভিযান আরম্ভ করলে বিপক্ষীয়রা দলবন্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে না। প্রত্যেক নৃপতি নিজ নিজ রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত থাকবে। এ অবস্থায় কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। ঐক্যবন্ধ হওয়ার কোন সুযোগও পাবে না। এই পরিস্থিতিতে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় অভিযানে যাত্রা করলে শুভ ফল হবে বলেই তাঁর মনে হল।

জরাসন্ধের মৃত্যুতে নেতৃত্বের সংকট দেখা দিল। একচ্ছত্র সম্রাটের ক্ষমতাভোগের আসনটিও শূন্য এখন। ঐ স্থানটি দখলের জন্য জরাসন্ধ-গোষ্ঠীর পরাক্রমশালী রাজন্যবর্গের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই-এর সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হল। জরাসন্ধের সেনাপতি চেদীরাজ শিশুপাল একচ্ছত্র সম্রাটের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য গোপনে যে প্রস্তুত হচ্ছে না—কে বলতে পারে ?

সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণ বললেন, পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়ের অভিযানের প্রকৃষ্ট সময় এটা।

কৃষ্ণের আদেশ পাওয়া মাত্র ভীম, অর্জ্জুন নকুল সহদেব নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে যাত্রা করল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্যই এই অভিযানের দরকার ছিল। দিগ্বিজয়ের অভিযান ব্যতীত কেউই অধীনতা কিংবা বশ্যতা স্বীকার করে না। উক্ত কার্জটি পূর্বাহ্নে সম্পন্ন করা সব দিক দিয়ে ভাল বলে মনে হল কৃষ্ণের। এই অভিযানের ফলে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। তাদের বাহুবল ও সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সকল রাজ্য অবহিত হবে। এবং বিজিত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক

আস্থা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যের সীমানাও বর্ধিত হবে। অধীনস্থ রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের প্রতিপাল্য ও প্রতিপালকের সম্বন্ধ হবে স্থাপিত। অপরদিকে, বিজিত দেশগুলির কাছ থেকে প্রাপ্য রাজ-সম্মানের করে পূর্ণ হবে রাজকোষ। এই দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য কখনই ধর্মযুদ্ধ করা নয়, কিংবা কোন সাম্রাজ্য শাসনও নয়, রাজপ্রতাপ বৃদ্ধি এবং রাজকোষাগার পূর্ণ করা।

চতুর্থ পাণ্ডব যে যুদ্ধে বিজয়ী হবে সে সম্পর্কে কৃষ্ণের মনে কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু দুর্ভাবনা থাকল। প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্ত, চেদীরাজ শিশুপাল, অঙ্গরাজ কর্ণ, হস্তিনাপুরের যুবরাজ দুর্যোধন প্রমুখ নৃপতিবর্গ, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করবে কিনা তাই নিয়ে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন ও সংশয় দিল। সত্যই কি তারা যুধিষ্ঠিরকে নিয়মিত কর প্রদানে সম্মত হবে? যুদ্ধ যদি তাদের সঙ্গে অনিবার্য হয় তাহলে কর্ণ ও শিশুপালের সঙ্গে ভীম কি উপায়ে যুদ্ধ করবে? তার পরিণামই বা কি হবে?—এই সব ভেবে আকুল হলেন কৃষ্ণ।

আর, এই সব দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকায় যাত্রা করলেন।

ভারতত্রাস জরাসন্ধ নিহত হওয়ার সংবাদ দ্বারকাতে পেঁছিতে বিলম্ব হল না। যাদবেরা কৃষ্ণকে বিজয় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য নগর সজ্জিত করল। বিশাল রাজপথ আম্র ও দেবদারু পল্লবে এবং পুষ্পে সজ্জিত করা হল। প্রশান্ত রাজপথের সন্নিকটস্থ অট্টালিকাগুলিও বিচিত্র বর্ণের পতাকা ও পুষ্পে শোভিত করল।

নগরের সর্বত্র উৎসবে আড়ম্বরে কোলাহলে পূর্ণ। শ্বেত প্রস্তর নির্মিত নগরের প্রধান ফটককে নানা বর্ণের পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হল। এছাড়া রাজপথে স্থানে স্থানে অনেক তোরণ নির্মিত হল। প্রত্যেকটি তোরণই ছিল নয়নাভিরাম।

উজ্জ্বল রঙীন রেশমী রজ্জুতে বাঁধা পুষ্পমাল্যে চন্দ্রাতপ রাজপথের মধ্যেস্থলে ঝুলন্ত অবস্থায় শোভা পাচ্ছিল। এ ধরনের নগরসজ্জা সাধারণত যুদ্ধবিজয়ী রাজার বিজয় সম্বর্ধনার জন্যই করা হয়। জরাসন্ধ নিহত হওয়ার সংবাদে হর্ষোৎফুল্ল যাদব বাসীরা বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে বিজয়ী বীরের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এই আয়োজন করেছিল।

রাজপথের দুধারে জনাকীর্ণ। জনতা উন্মুখ হয়ে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। দূরে পতাকা শোভিত কৃষ্ণের রথের চূড়া দেখে অপেক্ষমান জনতা বিপুল হর্ষে কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিল। তাদের উল্লসিত কোলাহল ও চীৎকার বহুদূর হতে শোনা গেল। নিক্ষিপ্ত পুষ্পে আবৃত হল রাজপথ। ব্রাহ্মণরা উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ এবং স্বস্তিবচন উচ্চারণ করতে লাগল। শঙ্খধ্বনি ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের মধুর ঝংকারের মধ্যে ডুবে গেল তাদের কণ্ঠস্বর।

অভ্যর্থনার এই বিপুল আয়োজন কৃষ্ণকে চমৎকৃত ও অভিভূত করল। যাদবদের ভালবাসায় তাঁর হৃদয় হল রঞ্জিত। অকারণ লজ্জায় রক্তিম হল তাঁর আনন। লজ্জাবনত বদনে কৃষ্ণ বলরামকে জিজ্ঞেস করলেন: যাদববাসীর এই বিজয়োৎসব কিসের জন্য? অকারণ আমাকে সে সম্মান দেখানর জন্য বড় বিব্রত বোধ করছি।

পরম প্রীতভরে বলরাম গদগদ কণ্ঠে বললেন: কৃষ্ণ! যাদবদের গর্ব তুমি।

তাদের পরম আশ্রয়স্থল। তুমি কূটজ্ঞ ও কৌশলী। তোমার কৌশলেই জরাসন্ধ নিহত হয়েছে। তুমি যন্ত্রীর মত ভীমকে যে নির্দেশ দিয়েছ যন্ত্রের মত সে তাই করেছে। ভীম অপেক্ষা তোমার কাজ ছিল শতগুণ কঠিন। বীরের মত, ক্ষত্রিয়ের মত, তুমি যুদ্ধ করেছ তার সঙ্গে। কৌশলে নিজেকে তুমি আবৃত করেছ কিন্তু গোপন করনি আপন অভিপ্রায়। সিংহের গুহায় প্রবেশ করে যে দুঃসাহস তুমি দেখালে তাতে বৃষ্ণিবংশের গৌরব বৃদ্ধি পেল। সমগ্র যদুকুলের মুখ উজ্জ্বল হল। বিনা লোকক্ষয়ে এমন যুদ্ধ এবং রাজ্যজয় চোখে দেখলেও প্রত্যয় হয় না। জরাসন্ধ বধের সব কৃতিত্বই তোমার। যাদবদের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রধান শত্রুকে বধ করে তুমি তাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছ। আজ থেকে নির্ভয়ে, নিরাপদে তারা জীবন যাপন করতে পারবে। তারই বিজয় উৎসব এ। তাদের অন্তরের কৃতাঞ্জলি। এজন্য তোমার সংকোচ করা উচিত নয়।

বলরামের প্রশংসায় কৃষ্ণ সংকুচিত হল। জ্যেষ্ঠের আবেগ-উচ্ছ্বাস যাতে কথায় কথায় না বাড়ে সেজন্য মাথা নীচু করে রইলেন। চতুর্দিকে উৎসবের আনন্দ। মাসাধিক কাল ধরে চলল তার উন্মত্ততা। রাজপুরী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গৃহস্থ পর্যন্ত সকলেই নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন-যাপনের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

জরাসন্ধের ভীতি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদবদের জীবনে উচ্ছৃংখলতা প্রকাশ পেল। সুরাসক্তি প্রবল হল তাদের। তরুণ, প্রবীণ নির্বিশেষে ন্যায় ও নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে সুরা আর নারীতে প্রমত্ত হল। নৃত্যগীত, নাটকাদির অভিনয় দেখে স্ফূর্ত্তি করে তারা কালযাপন করতে লাগল। সংগ্রামী পরিশ্রমী যাদবদের জীবন যে দ্বারকায় এসে এরকম বদলে যাবে ভাবতে পারেননি কৃষ্ণ। তাই জরাসন্ধের মৃত্যু তাকে নিশ্চিন্ত করার পরিবর্তে হতাশ করল। সুরা আর নারী এক নতুন দুর্গ্রহরূপে উপস্থিত হল তাদের জীবনে। যাদবদের অধঃপতন মর্মাহত করল কৃষ্ণকে।

বর্তমানকে সুদে আসলে ভোগ করতে ব্যস্ত যাদব সম্প্রদায়। ভবিষ্যতের ভাবনা নেই তাদের মনে। অথচ, একটু নিরাপদ নয় তাদের রাজ্য। সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় আছে তারা। ভুলেও চিন্তা করে না সে কথা। প্রচণ্ড কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধের সেনাপতি শিশুপালের প্রবল রোষ যে কোন সময় সমগ্র যাদব সমবায় রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেজন্য একটুও দুর্ভাবনা নেই তাদের। রাজ্য রক্ষা ও প্রতিপালনের সব ভার কৃষ্ণকে অর্পণ করে আত্মকেন্দ্রিক সুখ ও ভোগে নিমজ্জিত তারা। জাতীয় জীবনের এই দুর্গতি কৃষ্ণকে ভীষণ হতাশ করল। এই সব আলস্য-ভোগী বিলাসীদের কাছে কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না। অথচ, এতবড় একটা বিশাল সমৃদ্ধশালী দেশকে একার চেষ্টায় ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে রক্ষা করা দিন দিন কঠিন হল। তাই, চরম দুঃসময়ের উষালগ্ন থেকে তিনি পাণ্ডবদের আঁকড়ে ধরলেন।

যতদিন যাচ্ছে ততই পাণ্ডবদের ওপর তাঁর নির্ভরতা বাড়তে লাগল। সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তি তারা। যুধিষ্ঠির আদর্শ রাজা। রাজর্ষির মত রাজকার্য পরিচালনা করেন। রাজকোষ ধনে পূর্ণ থাকলেও ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস সুখ ও আনন্দের জন্য কখনও তার একটি কানাকড়ি অপব্যয় করে না। ধন ও সম্পদে প্রজার অধিকার স্বীকার

করেন যুধিষ্ঠির। তাই রাজার ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের সুখের জন্য ব্যয় করেন না প্রজাদের সম্পদ। সহজ সরল বিলাসহীন জীবনযাপনের পক্ষপাতী পঞ্চপাণ্ডব।

কৃষ্ণকে বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখে সত্যভামা পায়ে পায়ে মাটি মাড়িয়ে পিছনে এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণের কোন সম্বিৎ ছিল না। তাই সত্যভামার আগমন টের পেলেন না। পিঠে নরম হাতের কোমল স্পর্শে চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। অধরে সত্যভামার চটুল হাসি। চোখে বিলোল কটাক্ষ।

কৃষ্ণের ঘন কাজল চোখ বেদনায় থম থম করছিল। সত্যভামার প্রগলভতা দূর হল এক নিমেষে। মনটা তার জন্যে হঠাৎই হু হু করে উঠল। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ অমন করে তুমি তাকিয়ে আছ কেন ? চোখ দুটি তোমার বেদনায় টনটন করছে। কিছু হয়নি তো ? বল-না লক্ষ্মী, সোনা আমার।

সত্যভামার আকুলতায় কৃষ্ণের চমক ভাঙ্গল। অপ্রতিভের মত ফিক্ করে হাসলেন। বড় সুন্দর মধুর সে হাসি। প্রশান্ত মুখমণ্ডল তাঁর উজ্জল হল হাসিতে। দু'বাহু দিয়ে উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুলিত, সত্যভামাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন ঃ ও-গো সখি, তুমি আছ, তাই গৃহবাসে আছে রুচি নহিলে, দ্বারকা ছেড়ে যেতাম চলে ইন্দ্রপ্রস্থে।

বাহুবন্ধনে বন্দী সত্যভামা কৃষ্ণের মুখে ঠোনা দিয়ে বলল ঃ কত ঢঙই জানো তুমি ! কি ভয়টাই না ধরিয়ে দিয়েছিলে—বাব্বা !

অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করল ঃ তাই বুঝি ? আমার জন্য খুব ভাব, তাই না ?

সত্যভামার দু'ইচোখে দুষ্টুমি। মুখে মিষ্টি হাসি। ভ্রূযুগল নাচিয়ে বলল ঃ উহুঁ ! একটুও না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল ঃ বলব কেন ?

তবে, আড়ি—আড়ি। অধরে বঙ্কিম হাসি কৃষ্ণের।

ঠোঁট উল্টে বলল সত্যভামা ঃ আড়ি তো বয়েই গেল।

মুখ ঘুরে দাঁড়াল সে। কৃষ্ণ তার বাহুমূল আকর্ষণ করে নিজের দিকে মুখটাকে ঘুরিয়ে নিল। চোখে চোখ রাখল। ঠোঁটে ঠোঁট। সত্যভামা ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বলল ঃ ছাড়। খুব হয়েছে। এবার আসল কথাটা বল দেখি ? কার ভাবনায় এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলে তুমি ? সেই কথাটা শুনবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছি।

কৃষ্ণের প্রেমমুগ্ধ আঁখিযুগল বিস্ময়ে বিহ্বল। বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয়ে কৌতুকের মাধুর্য। কৃষ্ণের রহস্যময় অদ্ভুত চাহনি সত্যভামাকে বিব্রত করল। আশংকায় তার বুক দুর দুর করে উঠল। সত্যভামার অপ্রভিত অবস্থা দেখে বিচিত্রভঙ্গী করে হাসল কৃষ্ণ। কৌতুক করে ধীরে ধীরে বলল ঃ যদি আরও একটি পত্নীর সংখ্যা বাড়ে, আমার সত্যভামা কি অভিমানিনী হবে ? আমার সাথে তাহলে কি আড়ি হয়ে যাবে ?

কৃষ্ণের বলার ভঙ্গী দেখে সত্যভামা হেসে ফেলল। ছোট্ট করে একটা চড় মারল তাঁর গালে। বলল ঃ আহা ! সব তাতেই রহস্য তোমার। কত যেন সাধু ! গুণেরতো সীমা নেই। একটা নয়, দুটো নয় ষোড়ো'শ—

ফিক করে হাসল সত্যভামা। বলল ঃ আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। সত্যি করে বলতো কি ভাবছিলে তুমি ?

একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কৃষ্ণের। প্রিয়তমা মহিষীর দিকে তাকিয়ে মধুর কণ্ঠে বলল ঃ তুমি বল, আমি শুনি।

আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত হল সত্যভামার মুখমণ্ডল। বলল ঃ বলব ?

কৃষ্ণের চোখের দিকে তাকাল সে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে কৃষ্ণের মনের তলাটি যেন খুঁজতে লাগল। তারপর, কৃষ্ণের বুকের উপর মাথা রেখে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল ঃ মহাবীর জরাসন্ধ নিহত। তাঁর অনুগত রাজন্যবর্গের সঙ্গে যাদবদেব রাজনৈতিক সম্পর্ক কি দাঁড়াবে, সেই কথা ভাবছিলে তুমি। যদুবংশের প্রতিটি মানুষ ভোগ সুখে মত্ত। রাজা ও অমাত্যবর্গ রাজকার্যে অমনোযোগী। তাই তাদের উপর আর নির্ভর করতে পারছ না তুমি। তাই না ?

আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। বাক্‌রুদ্ধ হল তাঁর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সত্যভামার দিকে। আবেগে, অনুরাগে শ্রদ্ধায়-আস্থায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হল।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবতন্ময়তার মধ্যে কাটল। তারপর ধীরে ধীরে বললেন ঃ তোমার অনুমান যথার্থ। আমার মনটাকে তুমি চুরি করলে অথচ আমি কিছুই তার জানতে পারলাম না ! আশ্চর্য ! সত্যিই অতুলনীয়া তুমি !

স্বামীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সত্যভামা। শ্রদ্ধা ও কৌতুক মেশানো প্রেমপূর্ণ এক অদ্ভুত বিজয়ীর হাসি তাঁর ওষ্ঠে।

খেদোক্তি করে বললেন কৃষ্ণ ঃ তুমি ঠিক বলেছ সত্যভামা। তাই, এক এক সময় হতাশ হয়ে পড়ি আমি। নিজেকে তখন বড় ক্লান্ত, অসহায় লাগে। কিছু ভাল লাগে না। বিরক্তি লাগে। সব ছেড়ে দিয়ে আর পাঁচজনের স্তরে নেমে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কে যেন বাধা দেয় আমাকে। নেশাগ্রস্ত মানুষের মত আমাকে আমার কর্মের জগতে ফিরিয়ে আনে। তখন ভাবি, একার পরিশ্রমে এই বিশাল ভারতবর্ষের অগণিত মূক মানুষের দুঃখ, বিড়ম্বনা ভরা নির্যাতিত জীবনের অবসানের স্বপ্ন-সাধনা কি সিদ্ধ করতে পারব ? পারব কি ধর্মরাজ্য স্থাপন করে মানুষকে অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে মুক্ত করে সুখী, আনন্দময় নিরাপদ জীবনের অংশীদার করতে ? পারব কি, মানুষের হৃদয়ের এককোণে ছোট্ট একটুখানি স্থান।

কৃষ্ণের ব্যাকুলতায় সত্যভামা অভিভূত হল। স্বামীকে অভয় দিয়ে বলল ঃ তুমি দীনবন্ধু, পতিতপাবন—তোমাকে যে পারতেই হবে। নিজের জন্য কিছুই কামনা নেই তোমার। পরের মঙ্গল ও কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু ভাব না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বন্ধু ও সহচর। ধর্মযুদ্ধে তোমাকে নিরাশ করবে কে ?

যথার্থ বলেছ প্রিয়ে। পাণ্ডু পুত্রেরা উদ্যমী কর্মযোগী পুরুষ। অলস, বিলাসী ভোগীদের মত সুখ ও নিরাপদ তারা চায় না জীবনে। তারা চায় বিস্তার। আকাঙ্খাও ক্ষুদ্র নয় তাদের। মহতের বন্ধু তারা, অসৎ এর শত্রু। আমার মত তারাও চায় অত্যাচারীর দমনপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। অধর্মের বিরুদ্ধে তাই নিত্য সংগ্রাম তাদের। আমার স্বপ্নের ধর্মরাজ্যের বিজয়কেতন যে একদিন তারাই বিশ্বময় উড়িয়ে দেবে সেই বিশ্বাস নিয়ে বসে আছি।

একা থাকতে ভাল লাগে কৃষ্ণের। নির্জন কক্ষে গবাক্ষের দিকে চোখ মেলে, দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কি ভাবেন। এমন চিন্তায় কত রজনী তাঁর কেটেছে। প্রধানা মহিষী রুক্মিণী ছাড়া অন্য কেউ জানে না সে সংবাদ। সবাই যখন রাত্রে নিজ নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে থাকে, তখন চুপিসারে রুক্মিণী আসে স্বামীর সন্ধানে। কৃষ্ণের নিজস্ব কক্ষে সব সময় পাওয়া যায় না তাঁকে। তবু শয্যা গ্রহণের পূর্বে একবার রুক্মিণী আসে তাঁর কক্ষে। এটা তার অভ্যাস। না এলে নিশ্চিত হয়ে ঘুমুতে পারে না সে।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল।

রুদ্ধ দুয়ারে হাত দিতেই খুলে গেল। কৃষ্ণবর্ণ কষ্টিপাথরে নির্মিত একটি আরাম কেদারায় দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসেছিল। প্রদীপের মৃদু আলোক শিখায় কাঁপছিল তাঁর ছায়া। তাঁকে দেখে রুক্মিণীর মায়া হল ভীষণ। মনে হল, কৃষ্ণ ভীষণ দুঃখী, একা, পরিশ্রান্ত। নিঃসঙ্গ।

পা টিপে টিপে কৃষ্ণের শিয়রের পাশে এসে দাঁড়াল। খুব সন্তর্পণে হাত রাখল তাঁর বাবরী চুলে। পদ্মকলির মত আঁখি পল্লব ধীরে ধীরে উন্মীলিত হল। মৃদু আলোয় দেখলেন রুক্মিণীর কল্যানীয়া রূপ। বড় স্নিগ্ধ, বড় পবিত্র। ইশারায় ডাকলেন কাছে। কেদারায় বাহুমূলে আদর করে বসালেন তাকে। বললেন ঃ এখনও ঘুমোও নি তুমি ?

মাথা নীচু করে রুক্মিণী বলল ঃ তুমিও তো জেগে আছ।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। রুক্মিণী একদৃষ্টে বন্ধ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে সকাতরে জিজ্ঞেস করল ঃ কি হয়েছে নাথ !

কৃষ্ণ কোন উত্তর দিলেন না। বন্ধ চোখ দুটি তাঁর জলে ভেজা। আলোয় চিক্ চিক্ করছিল আঁখিদ্বয়। মনে হল, এক দুঃখের বোঝা যেন একলা বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। নিস্পলক চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রুক্মিণী। চম্পকের মত অঙ্গুলিগুলি দিয়ে কৃষ্ণের চুলের মধ্যে বিলি কাটতে লাগল। অনেকক্ষণ পর কৃষ্ণ বলল ঃ কিছু বলবে তুমি ?

না।

কেন ?

পরিশ্রান্ত তুমি।

তাতে কি হয়েছে ? তোমার সান্নিধ্যে আমার সব শ্রান্তি দূর হয়, মনটা খুশীতে ভরে ওঠে।

তাহলে শোও তুমি। আমি মাথায়-হাত বুলিয়ে দিই।

দরকার হবে না। বেশ আছি। কাছে বস তুমি।

বসছি। বল, এবার কি ভাবছিলে ?

অনুমান করে তুমিই বল না ?

চিন্তার ভাণ করল রুক্মিণী। কৃষ্ণের শায়িত দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে বললঃ বলব ?

কৃষ্ণের প্রেমমুগ্ধ আঁখিদ্বয় আরও রহস্যময় হল। কৌতুক হাস্যে বক্র হল অধরদ্বয়। খুশীভরা মন নিয়ে বললেনঃ বল, আমি শুনি।

জরাসন্ধের কথাই ভাবছ তুমি।

বিদ্যুতের মত চমকে উঠল কৃষ্ণ। আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ সে কি! তুমি জানলে কেমন করে ?

তোমার চোখে জল কেন ? অশ্রু বর্ষণের তো কোন কারণ ঘটেনি। তবু দু'চোখে তোমার জল টল টল করছে।

অপ্রতিভ হল কৃষ্ণ। তবু নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য বললেনঃ সত্যিই মহীয়সী তুমি। শত্রুকে হত্যা করে কেউ কাঁদে কখনও ?—শুনেছ তুমি ?

অন্যের কথা বলতে পারব না। কিন্তু আমার স্বামী মহাত্মা। তার হৃদয় শিশুর মত। শত্রু-মিত্র জ্ঞান নেই তাঁর। মানুষের দুর্গতি, দুর্দশা তার শোচনীয় পতন, কাতর করে তাঁকে। মহতের বন্ধু তিনি কিন্তু অধমের যম। তথাপি, অধমের মৃত্যুতে শোকার্ত হন তিনি। পাপকে ঘৃণা করেন কিন্তু পাপীকে কখনও নয়।

রুক্মিণীর কথা শুনে খুশী হলেন কৃষ্ণ। কোমল করদ্বয় আপন হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন আবেগে। বললেনঃ এ বিশ্বাস তুমি পেলে কোথা থেকে ?

মুগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রুক্মিণী বললঃ আমার মত তোমাকে বেশি কে জানে ? সেবা পরায়ণা কনিষ্ঠা ভগিনী সত্যভামাও ভাল করে জানে না তোমায়।

উদাস দৃষ্টিতে কৃষ্ণ তাকালেন আকাশের দিকে। চাঁদের আলোয় বনস্থলী রহস্যময় হয়ে উঠেছে। রুক্মিণী যেন তার মতই রহস্যময়ী। মায়ামন্ত্রবলে সে যেন মনের গহনে প্রবেশ করে তাঁর কান্না ও যন্ত্রণার সব রহস্য অবগত হয়েছে। তার অনুভব ক্ষমতা কৃষ্ণকে আশ্চর্যান্বিত করল।

কেমন যেন হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। বহুদূর থেকে যেন চিন্তার বাণীগুলো আহরণ করে আনলেন তিনি। এক আশ্চর্য মুগ্ধতা প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠস্বরে। বললেনঃ জান রুক্মিণী, মাঝে মাঝে নিজেকে জিগ্যেস করি ; আমি কে ? কি জন্যে আমার জন্ম ? কেন এসব করছি ? এসব করে কি হবে আমার ? আমি তো এর কেউ নই। আমি তো রাজা নই। রাজার ক্ষমতা আমার নেই। রাজা হওয়ার কোন বাসনাও নেই মনে। তবু রাজার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয় কেন আমাকে ? এসব আমাকে দিয়ে কে করাচ্ছে ; বলতে পার তুমি ? বলতে পার; তার উদ্দেশ্যের কথা ?

স্বামী! মানুষের হৃদয়ের রাজা তুমি। দুঃখী, অসহায়, পতিত মানুষকে উদ্ধারের জন্য, প্রতিপালকের জন্য, সর্ব বিপদ, ভয়, অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষার জন্য করুণাময় ভগবান পাঠিয়েছেন তোমায়। তিনিই তোমার শক্তি। তাঁর নির্দেশ তুমি পালন করছ। সব কাজ তাঁর। তুমি করুণাময় ভগবানের প্রতিনিধি মাত্র।

অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টিতে তাকালেন কৃষ্ণ। দু'চোখ তাঁর আনন্দে উজ্জ্বল হল। অনাস্বাদিত তৃপ্তি ও সুখে আচ্ছন্ন হল তাঁর চিত্ত।

তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। তবু মাঝে মাঝে লোকনিন্দা, লোক অপবাদ শুনে মনে হয় তবে কি ভুল হল কিছু? মহাবল জরাসন্ধ পশুপতির মহাভক্ত। দেব-দ্বিজে তার ভক্তি অপরিসীম। সে সরল, সে মহৎ, সে নির্ভীক! প্রকৃত ক্ষত্রিয় সে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ তাকে দাম্ভিক করল। দম্ভেই তার মৃত্যু। তার মত বীরের মৃত্যুর জন্য আমার হৃদয় কাঁদে। জরাসন্ধ যাদবদের চিরশত্রু। তবু তার মত বীরত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বিস্ময়কর সাংগঠনিক দক্ষতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তার মত নিষ্ঠুর রাজা যেমন হয় না, তেমনি মহাপ্রাণও খুব বিরল। ভীমার্জুন এবং আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হত্যা করল না। বন্দীও করল না। বরং, আমাদের প্রার্থনানুযায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজী হল। আশ্চর্য হলাম। মনে হল, জরাসন্ধের মহত্বের কাছে আমি হেরে গেলাম।

না, না স্বামী। তা নয়। তুমি মহৎ বলেই অপরের মহত্ব উপলব্ধি কর। তোমার চিরশত্রু হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ কর না তুমি। ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে সে পরাজিত নৃপগণকে পশুর মত হত্যার জন্য যখন গিরিগুহায় বন্দী করল তখন তার অন্যায়, অধর্ম কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করলে তুমি। তাকে শত্রুরূপে গণ্য করলে। কিন্তু ভুলেও প্রতিশোধ নিলে না। তোমার মনে যাই থাকুক, তাকে হত্যার কোন চেষ্টা করনি তুমি। বান্ধব পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের অন্যতম প্রতিবন্ধক যখন হল তখন তারাই বধ করল তাকে। তুমি নিমিত্ত মাত্র। জরাসন্ধের কাল পূর্ণ হয়েছিল। মহাকাল সুকৌশলে মৃত্যু দূত পাঠিয়ে ছিল তার ঘরে। নিয়তিই বধ করল জরাসন্ধকে। তুমি কেউ নও।

সবিস্ময়ে স্বগতোক্তি করল কৃষ্ণ: ঠিক বলেছ, রাণী। নিয়তি!

কৃষ্ণের আত্মগ্লানি দূর করার জন্য রুক্মিণী দৃঢ় কণ্ঠে বলল: হাঁ, নিয়তিই। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তাকে। সে রাজা। ভোগ-বিলাসে তার শরীর নমনীয়! ভীমের মত বলশালী মল্লযোদ্ধাকে আত্মশ্লাঘা করে আহ্বান করা তার ভুল হয়েছিল। জরাসন্ধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী শক্তিমান সম্রাট। একজন সাধারণ মল্লযোদ্ধার স্তরে নেমে এসে তাঁর দ্বৈতসংগ্রাম করা অবিবেচনাপ্রসূত কাজ হয়েছিল। আর সেই বিবেচনাহীন কাজের মূল্য পরিশোধ করতে হল জীবন দিয়ে। এজন্য তোমার আত্মগ্লানি ভোগের কোন কারণ নেই।

রুক্মিণীর সান্ত্বনাবাণীতে পরিতুষ্ট হলেন কৃষ্ণ। রুক্মিণীর বাগ্মীতা আশ্চর্য করল তাঁকে। অদ্ভুত তার যুক্তি। ইতিপূর্বে এরূপ বিশ্লেষণ প্রধানা মহিষীর কাছে শোনেননি কখনও। রুক্মিণীর বাক্যে শান্ত হল কৃষ্ণের তাপিত হৃদয়। মন থেকে একটা বিরাট পাথর সরে গেল তাঁর। মনে মনে রুক্মিণীর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। গদ্ গদ্ কণ্ঠে বললেন: অত্যাশ্চর্য তুমি! তুমি অনন্যা! এতদিনে আমার দর্পচূর্ণ হল। তোমাকে আমার—

রুক্মিণী ক্ষিপ্রহস্তে তার দু'খানি হাত ধরে ফেলল। বিলোল কটাক্ষ হেনে, মধুর হেসে বলল: খুব হয়েছে। রাত দুপুরে আর নাটক করতে হবে না।

সপ্তম অধ্যায়

দিগ্বিজয় সম্পন্ন করে পাণ্ডুপুত্রেরা ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, এ সংবাদ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বহু আগেই পেয়েছিলেন। এবং সেই মত দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা এবার ছিল না কৃষ্ণের। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে নিমন্ত্রণ পৌঁছানোর পূর্বেই তাদের একজন পরম হিতাকাংখী বন্ধু ও আত্মীয়রূপে সেখানে যাত্রা করলেন। এজন্য রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও সৌজন্যের নিয়ম-রীতিও মানলেন না। এমনটা কখনও হয়নি এর আগে। কুটুম্বের সামাজিক নিয়ম রক্ষা করেই ইন্দ্রপ্রস্থে এতকাল যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু এবারের ব্যস্ততার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকে কৃষ্ণ নিজেরই কাজ বলে মনে করলেন। খণ্ড ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে একটা সম্পূর্ণ অবয়ব লাভ করবে। তাই যজ্ঞকার্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার প্রতিই অধিক মনোযোগ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই এর উদ্যোক্তা। রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রযোজক যুধিষ্ঠির নয়, অনুষ্ঠাতাও তিনি নন। তিনি শুধু উপায়স্বরূপ। এবং কার্যের ফলভোগী।

রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন ও সমারোহ বিরাট। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রদের তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কৃষ্ণকে একা তার সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একথা জেনেই তিনি পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়েছিলেন। দ্বারকায় একটি দিনও তাঁর আরামে কাটেনি। অবকাশের দিনগুলি আনন্দ-বিলাসে মধুময় হয়ে ওঠেনি। সর্বক্ষণই চিন্তায় চিন্তায় কেটেছিল তাঁর। কল্পনা করে নিতে হয়েছিল যজ্ঞের জন্য কি কি করা তাঁর আবশ্যক।

এত বড় একটা বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করার জন্য বহু প্রস্তুতির আবশ্যক। অনেক রকম আয়োজন আছে তার। এসব কার্য-সম্পন্ন করতে সময় ও ব্যয় হয় প্রচুর। সকল কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় সেজন্য একটি পরিকল্পনা পূর্বাহ্ণেই করার দরকার হয়। যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করতে হয় প্রতিটি কাজের দায়িত্ব। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে পরিতুষ্ট করার একটা গুরুদায়িত্বও বহন করতে হয়। এটাই সর্বাপেক্ষা দুরূহ ও জটিল কাজ। বহু বিচার বিবেচনাও সেজন্য প্রয়োজন। প্রতিটি ব্যাপার আদ্যপান্ত বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হয়। খুবই সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই, পাণ্ডবেরা যখন চতুর্দিকে বিজয় অভিযানে মত্ত তখন দ্বারকায় সমুদ্র তীরবর্তী বিশ্রামকক্ষে বসে তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠানিক কর্ম এবং দায়-দায়িত্ব বণ্টনের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিলেন।

কৃষ্ণ জানে এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পথে বিঘ্ন অনেক। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের বিজয় অভিযান সম্পন্ন হলেও শেষ মুহূর্তে যজ্ঞের কার্যে নানা সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে। সেজন্য সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, শত্রুর

শত্রুতা সর্বাবস্থাতেই সম্ভব। হিংস্র চিতাবাঘের মত সুযোগের প্রতীক্ষা করবে তারা। শিশুপালকে সবচেয়ে ভয় কৃষ্ণের। কৃষ্ণদ্বেষী সে। জ্যোতিষীর বচন অনুসারে কৃষ্ণই তার মৃত্যুর কারণ। তাই, শিশুপাল জননীর কাছে তার শত অপরাধ ক্ষমা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তিনি। শত সংখ্যা পূরণ হতে আর সামান্যই বাকি আছে। কৃষ্ণ তাই দুশ্চিন্তামগ্ন।

শিশুপালের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। পাণ্ডবদের মত সেও তাঁর পিতৃস্বসার পুত্র। সম্পর্কে কৃষ্ণের ভাই। কিন্তু সেই মধুর আত্মীয় সম্বন্ধ বিস্মৃত হল শিশুপাল। কৃষ্ণের বৈরীতাই কাম্য হল তার। জরাসন্ধ তার প্রচন্ড কৃষ্ণ-বিদ্বেষ কাজে লাগানোর জন্য সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেছিল। এবং কংসের সমান তার মর্যাদা দিল। যাদব সমবায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও অনৈক্য বাড়ানোর জন্যে এবং তাদের স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টির জন্যে তাকে জরাসন্ধ অত্যন্ত সমাদর করত।

যাদবদের সঙ্গে এক নতুন ধরনের স্নায়ুযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল জরাসন্ধের। তার ফলে বৃষ্ণিসংঘ তথা যাদব প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু শিশুপাল জরাসন্ধের কূট রাজনীতির তাৎপর্য না বুঝে মূঢ়ের মত নিজ আত্মীয়দের স্বার্থবিরুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হল। জরাসন্ধের এই পাপ সহচর সম্পর্কে কৃষ্ণকে তাই সতর্ক থাকতে হয়।

পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় অভিযানে শিশুপাল অবশ্য বিনা যুদ্ধেই তাদের কর দিতে রাজী হয়েছিল। তবু, কৃষ্ণ তার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। সে অত্যন্ত ক্রুরমনা, নিষ্ঠুর এবং কপট। তার মত কপটের আনুগত্য স্বীকার নিছক ছলনা হতে পারে। কিংবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন কৌশলও হতে পার। কৃষ্ণ তাই, অত্যন্ত বিচলিত এবং অস্থির হয়ে পড়লেন। কেননা, রাজসূয় যজ্ঞকার্যে যখনই সে কৃষ্ণের সীমাহীন আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করতে দেখবে তখনই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের স্বার্থবিরুদ্ধ কার্যে লিপ্ত হবে। এমন কি যজ্ঞ পণ্ড করতেও তার বিবেকে বাধবে না। এখন তাঁর জন্য পাণ্ডবদের কোন বিপদবাধা আসুক, কৃষ্ণ কখনো তা চান না। পাণ্ডবদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়া মানেই তাঁর নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া। এ অবস্থায় ইন্দ্রপ্রস্থে শিশুপালের উপস্থিতি খুবই উদ্বেগের। তথাপি রাজনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষার জন্য তাকে আক্রমণ করতে হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে দায়িত্ব বন্টনের তালিকা তৈরী করলেন তিনি। বিবাদ এবং বিতর্ক পরিহার করার জন্যেই নিজের নাম তালিকাভুক্ত করলেন না। ইচ্ছা করেই পরিহার করলেন।

যুধিষ্ঠিরের জন্যই কৃষ্ণকে বিপুল দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হল। জটিল রাজনীতি বোঝেন না যুধিষ্ঠির। কূট বুদ্ধিতেও পারঙ্গম নয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত সাহস, শক্তি, আত্মবিশ্বাসও নেই তাঁর। শিশুর মত পরমুখাপেক্ষী। জননী যেমন শিশুর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় কৃষ্ণও তেমনি যুধিষ্ঠিরের একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ ছাড়া অচল তিনি। কৃষ্ণ ব্যতিরেক যুধিষ্ঠির অসহায় এবং অক্ষম। কৃষ্ণই তাঁর শক্তি। কৃষ্ণের ভরসায় ও পরামর্শে রাজসূয় যজ্ঞ করছেন। কৃষ্ণই তার সর্বময় কর্তা।

জরাসন্ধের মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতিতে যে পালাবদল আসন্ন হল তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পান্ডবদের হাতে রাখার জন্যেই এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। সেজন্য পান্ডবদের কার্য আগে সম্পন্ন করা হল। যেসব রাজ্য দুর্বল এবং অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিল তারা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পান্ডবদের অধীনতা স্বীকার করল। শক্তিশালী রাজ্যগুলির উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাদের বশীভূত করা হল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্যবর্গের মধ্যে মিত্রসুলভ রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে জরাসন্ধের দুষ্টসহচররা সহজেই কোণঠাসা হয়ে পড়ল। প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে পান্ডবদের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হল। কিন্তু এখনও তা সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক রূপ লাভ করেনি। রাজসূয় যজ্ঞেই তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে। তখন যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এক নতুন রাজনৈতিক আঁতাত। অখন্ড ভারত রাজ্য গঠনেব তখন হয়ত আর কোন বাধা থাকবে না। শান্তি, মৈত্রী এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের উপর গড়ে উঠবে এক নতুন ভারতবর্ষ।

কৃষ্ণের অনুমান ছিল নির্ভুল। বিনা যুদ্ধেই শিশুপাল, কর্ণ দুর্যোধন প্রমুখ রাজগণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমর্থন করল এবং তার মনোরঞ্জনের জন্য প্রচুর ধনরত্ন ও উপঢৌকন দিল। যুধিষ্ঠির ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী হওয়ার জন্য কৃষ্ণের নয়া রাজনৈতিক আঁতাত গঠনের উদ্যোগ হল সহজ। যুধিষ্ঠিরের মত সরল সাধু ব্যক্তির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সকলেই অনুমোদন করল। কারণ তাঁর রাজ্য দিগ্বিজয়ের অভিযান সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণ করেনি। বরং প্রতিপাল্য ও প্রতিপালকের সম্বন্ধ স্থাপনের আগ্রহ তাতে প্রকাশ গেল।

পান্ডবদের দিগ্বিজয় অভিযান যুধিষ্ঠিরের যে রাজনৈতিক ভাবমূর্তি গড়ল তার ফলে কৃষ্ণের অখন্ড ভারতরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন সফল হওয়ার পথ সুগম হল। রাজসূয় যজ্ঞে তারই ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে।

ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণকে এত খুশী এর আগে দেখেনি কেউ। বিভিন্ন কাজের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি। পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজই দ্রুত এগিয়ে চলল। কৃষ্ণ নিজেই তার তদারক করতে লাগলেন। এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সমাপ্ত হল ঃ নিমন্ত্রণ, উৎসব, অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি এবং অতিথি সৎকারের কাজগুলি। বিবিধ সাজে সজ্জিত হল নগরী। খুশীর ঢেউ লাগল সারা শহরে। সর্বত্রই উৎসবের আড়ম্বরের সমারোহ ও মুখরতা। রাজপথগুলি বিভিন্ন রাজ্যের পতাকা দ্বারা শোভিত। সুগন্ধী পুষ্পের মাল্য দ্বারা নির্মিত হল চন্দ্রাতপ। চন্দন, অগুরুর সৌরভে বাতাস হল সুবাসিত। অতিথিদের বাসভবনগুলি মনোরম ও রমণীয়। গবাক্ষ সকল সুবর্ণ তন্তুজালে জড়িত। দ্বার সকল কারুকার্য মন্ডিত। গৃহগুলি সুগন্ধে আমোদিত।

আমন্ত্রিত নৃপতিগণ তাদের পদমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী অতিথি শিবিরে স্থান লাভ করলে। তাঁদের অনুচর, সেবক, দাস-দাসীরও থাকার ব্যবস্থা হল। প্রত্যেকেই একটা ছোটখাট বাহিনী নিয়ে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ফলে, লোকসংখ্যা বিপুল আকার ধারণ করল। অনুমানের চেয়ে অনেক বেশী লোক

সমাগম হওয়ায় নতুন নতুন অতিথিশালা খুব দ্রুত নির্মিত হল। অতিথিদের আপ্যায়ন এবং তদ্বির তদারকের দায়িত্ব পঞ্চপাণ্ডবে মিলে গ্রহণ করল। অন্যের উপর দায়িত্ব অর্পণ করল না তারা। কেননা এর সঙ্গে অতিথিদের এবং যুধিষ্ঠিরের নিজস্ব মান-মর্যাদা জড়িয়ে ছিল। তাই কর্তব্যের এবং সমাদরের যাতে কোনো ত্রুটি না হয় তার প্রতি সকলে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। অতিথিদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকের অনুষ্ঠান যেমন করা হল, তেমনি সুরা নারীরও ব্যবস্থা রাখা হল।

যজ্ঞের দিন যত নিকটতর হতে লাগল কৃষ্ণ ততই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করতে লাগলেন। কার্যে পূর্বের আগ্রহ ও উৎসাহ ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল। কোন কাজেই তাঁর মনোযোগ নেই। সব ব্যাপারেই উদাসীন এবং নিস্পৃহ। অনাত্মীয়ের মত সর্বদা দূরে দূরে অবস্থান করছেন। কৃষ্ণের আচরণের এই আকস্মিক পরিবর্তন যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলল। তবে কি, অজান্তে তারা কোন ত্রুটি করল। কিন্তু সে ত্রুটি কি? কৃষ্ণের মত মহৎ হৃদয়বান ব্যক্তি তা ক্ষমা করতে পারল না? ভেবে আকুল হল পাণ্ডুপুত্রেরা। পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হল তৃতীয় পাণ্ডব। সপরিবারে কৌরব ভ্রাতাগণ সহ দুর্যোধন এবং শিশুপালের আগমনের পর থেকে কৃষ্ণের আচরণ কেমন যেন বদলে গেল। পঞ্চপাণ্ডবের সংস্পর্শ পরিহার করে সর্বদা দূরে দূরে সরে থাকতে চাইছেন। সর্বদা এড়িয়ে চলছেন তাদের। অবাঞ্ছিতের মত একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোন কিছুতে তাঁর আগ্রহ নেই। কেমন একটা অনাসক্ত ভাব। জিজ্ঞেস করলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। কি যেন ভাবেন? দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে উত্তর দেন। মনোমালিন্য হলে মানুষ যেমন আচরণ করে থাকে অনেকটা সেইরকম। ধরা ছোঁয়ার বাইরে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। নিমন্ত্রিত অতিথিরা যখন থেকে আসতে শুরু করেছে তখন থেকে কৃষ্ণের আচরণ হল অস্বাভাবিক এবং রহস্যময়। কৃষ্ণের এরূপ আচরণ নিছক কোন আত্মাভিমান জাত নয় বলেই যুধিষ্ঠিরের ধারণা। নিশ্চয়ই কোন সুগোপন উদ্দেশ্য আছে কৃষ্ণের মনে। নইলে, পাণ্ডবদের এই অকৃতিম সুহৃৎ কখনো তাদের সঙ্গে হৃদয়হীন আচরণ করতে পারত না। এ কথা মনে হতেই সে আর কৃষ্ণের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করল না। এবং ভাইদেরও নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দিল। কৃষ্ণের মতিগতি অর্জুন বোঝে ভাল। তাই এ নিয়ে আর কেউ প্রশ্ন করল না। তারাও কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলতে লাগল সর্বদা। কৃষ্ণও এরকমটা চাইছিলেন।

কৃষ্ণের দুরবস্থা দেখে কৃষ্ণ-বিদ্বেষী রাজন্যবর্গ অত্যন্ত হৃষ্ট ও পুলকিত হল। তবু পাণ্ডবদের অকৃতজ্ঞ বলে মনে মনে গালি দিতে লাগল। যে মানুষেয় ঐকান্তিক চেষ্টায় তারা সর্বোচ্চ রাজপদ ও গৌরব লাভ করল তাঁকে সুখের দিনে পরিত্যাগ করার জন্য মহামান্য অতিথিরা নানারূপ কূট মন্তব্য করতে লাগল। পাণ্ডবদের কৃতঘ্নতায় বিস্মিত হল তারা। কৃষ্ণের প্রতি তাদের রূঢ় আচরণকে প্রসন্ন মনে কেউ গ্রহণ করতে পারল না। একটা অকারণ বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় ভরে গেল তাদের চিত্ত। কিন্তু মনের সেই অপ্রসন্নভাব এবং ক্ষোভ বাইরে প্রকাশ করল না কেউ।

দুর্যোধন অনেকক্ষণ ধরেই কিছু একটা বলার জন্য ছটফট করছিল! অবশেষে

ধৈর্য ধরতে না পেরে উপস্থিত নৃপবর্গকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ কৃষ্ণের মত সখা পেয়েছিল বলেই যুধিষ্ঠির ভারতের অধিপতি হল। এতে পাণ্ডবদের গৌরবের বা আত্মশ্লাঘার কিছু নেই। কিন্তু তারা এমনই অকৃতজ্ঞ এবং দুরভিসন্ধিপরায়ণ যে সুসময়ে পরম বন্ধু কৃষ্ণকে ত্যাগ করল। হায়রে অদৃষ্ট! কৃষ্ণের প্রয়োজন তাদের কাছে ফুরিয়ে গেছে। তাই জীর্ণবস্ত্রের মত তাকে ত্যাগ করতেও তাদের বিবেক কুণ্ঠিত হল না। যুধিষ্ঠির যে এত স্বার্থপর এবং নীচ ভাবাই যায়নি!

গান্ধার রাজকুমার সুবল নন্দন শকুনি বলল ঃ আহা! বেচারা কৃষ্ণ! দেখলে মায়া হয়। বলে জিহ্বায় চুক্‌ চুক্‌ করে কয়েকবার শব্দ করল।

সক্রোধে উত্তর করল শিশুপাল। বলল ঃ বন্ধু দুর্যোধন! কৃষ্ণকে অতবড় করে দেখলে পাণ্ডবদের উপর অবিচার করা হয়। বিশেষ করে, ভীম ও অর্জুন যথার্থ বীর ও সাহসী। প্রকৃত যোদ্ধা। কর্মে তারা দ্বিধাহীন। প্রতিজ্ঞায় আত্মবিশ্বাসে অটল তারা। সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জুনেরও কম নয়। সংকটকালে সিদ্ধান্ত নেয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে যুধিষ্ঠিরের। তিনি অত্যন্ত ধীর স্থির ও বিচক্ষণ। রাজনৈতিক সখ্য স্থাপনের যোগ্য পাত্র তারা। তাই কৃষ্ণ নিজের স্বার্থে তাদের মিত্র হয়েছে। সে ভীরু এবং কাপুরুষ। জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস নেই তার। নিজের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে অত্যন্ত নীচ উপায়ে এবং জঘন্য ভাবে সম্রাট জরাসন্ধকে বধ করেছে। নিজে নয়, ভীমকে দিয়ে! ক্লীব না হলে এমন ঘৃণ্য আচরণ কেউ করে?

শিশুপালের বিদ্বেষপ্রসূত উক্তির প্রতিবাদ করে অঙ্গরাজ কর্ণ বলল ঃ চেদীরাজের সঙ্গে একমত হতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু না হওয়ায় দুঃখও কম নয়। আসলে, কৃষ্ণ কৌশলী। তীক্ষ্ণধী। তাঁর নিজের করার কিছু প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও মনীষা দ্বারা খুব সহজেই কার্য সম্পাদন করেন তিনি। খুব প্রয়োজন না হলে নিজে কখনো অস্ত্র ধরেন না।

কর্ণের কথায় কর্ণপাত করল না চেদীরাজ। নিজের অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করার জন্য পুনরায় বলল ঃ অঙ্গরাজ, এখনও বালক তুমি। তার কুহক বিদ্যায় আচ্ছন্ন তোমার চিত্ত। তাই চোখ খুলে দেখতে পাও না তাকে। আমার আত্মীয় সে। ভাল করেই জানি তাকে। তার মত কুচক্রী, হীন, নীচ, স্বার্থান্বেষী, নরাধম পৃথিবীতে খুব কম জন্মে। আসলে, সে যে একজন দক্ষ যাদুকর, এ সংবাদ অনেকে রাখে না। সম্মোহন ক্ষমতার বলে সে অনেক অসম্ভব কার্য সম্পাদন করে। তাকেই, তোমরা মনে কর ব্যক্তিত্ব, মনীষা,—

চেদীরাজকে থামিয়ে দিয়ে ভীষ্ম বললেন ঃ চেদীরাজ আপনি বীর। কিন্তু কৃষ্ণ শুধু বীর নন, বুদ্ধিমান রাজনীতিক।

ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে উঠল শিশুপাল। বলল ঃ মিথ্যে কথা। সে ভণ্ড। সে লম্পট। সে যাদুকর। কুহক বিদ্যায় লোককে বিভ্রান্ত করে। একে তার জয় বলে গৌরব করবেন না বৃদ্ধ পিতামহ।

ক্ষমা করবেন চেদীরাজ। আপনি যে কুহক বিদ্যার কথা বললেন, জরাসন্ধ

তাকেই করেছিল তার রাজনীতির হাতিয়ার। এ বিদ্যা অন্যের আয়ত্তের সুযোগ ছিল না। কৃষ্ণেরও নয়। কিন্তু মহাবীর কৃষ্ণ, অঘাসুর বকাসুর বধকালে ঐ বিদ্যা জেনেছিল।

পিতামহ ভীষ্মের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল শিশুপাল। ক্রোধে স্থান পরিত্যাগের কথা ভাবল। কিন্তু অন্যদের চোখে তা খুবই বিসদৃশ হবে মনে করে, সেখানেই বসে রইল। ক্রোধে কম্পিত ওষ্ঠাধর বারংবার দন্তদ্বারা পীড়ন করতে লাগল। তার অসহায় অবস্থা অনেকেই কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছিল। কিন্তু ভীষ্ম চুপ করলেন না। বললেনঃ আপনার কথা মেনে নিলে বলতে হয় ভারতের অগণিত রাজন্যবর্গকে জরাসন্ধও তার কুহক মন্ত্রে মুগ্ধ করে রেখেছিল। বিশাল ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কর্তৃত্ব শুধু কুহক বিদ্যা দিয়ে অর্জন করা যায়? বলুন চেদীরাজ? নিরুত্তর কেন?

ঈষৎ বঙ্কিম হাস্যে ভীষ্মের অধর যুগল স্ফুরিত হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বললেনঃ চেদীরাজ, আমি মনে করি, জরাসন্ধ তার ব্যক্তিত্ব ও মনীষার দ্বারাই ভারতের অধিপতি হয়েছিলেন। কৃষ্ণের অসাধারণ বুদ্ধিবল, ব্যক্তিত্ব ও মনীষাকে তেমনি জোর করে উপেক্ষা করা যায় না।

কুশল বার্তা শুধানোর জন্য দুর্যোধন ও কর্ণের দিকে আসছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু তাঁকে নিয়ে উত্তেজিত বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল শুনে সেখানেই থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সেখান থেকে গোপনে গাত্রোত্থান করলেন।

কৃষ্ণকে চুপিসারে চলে যেতে দেখে, সহদেব বালকোচিত কৌতূহল সম্বরণ করতে পারল না। ব্যাকুল হয়ে জিগ্যেস করলঃ সখা, তোমার বিরস বিষণ্ণ মূর্তি দেখে আমার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। অথচ, এই আয়ত্তাতীত বিশাল যজ্ঞকার্যের মূলে হোতা তুমি। তুমিই এর কেন্দ্রমণি। পঞ্চপাণ্ডব তোমার বাহু। দশ হাতে তারা লক্ষ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করছে তোমার নির্দেশে। তুমি তাদের বল ও ভরসা। অথচ, এমন আনন্দের দিনে কোন্ অপরাধে ত্যাগ করলে তাদের? আর কেনই বা নিজেকে এইসব ব্যক্তিদের সমালোচনার বিষয় করে তুললে? কেন?

অভিমানে সহদেবের কণ্ঠস্বর আবেগরুদ্ধ হল। নীলকান্ত মণির মত নীলাভ নয়নদ্বয় তার অশ্রুতে টলটল করতে লাগল। এক আশ্চর্য সুন্দর মুগ্ধতা ও মমতা নিয়ে কৃষ্ণ তাকালেন তার দিকে। কৃষ্ণের চোখ দুটো আগ্রহের প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। কৃষ্ণ তার কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেনঃ ভাবাবেগের সময় নয় এখন। সব কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই। উত্তর দিতেও নেই।

কৃষ্ণ আর দাঁড়ালেন না। সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যুধিষ্ঠির-আত্মীয়-কুটুম্ব পরিজন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করলেন ইন্দ্রপ্রস্থের মন্ত্রণাকক্ষে।

মণিময় সভাকক্ষের অনুপম রূপ ও সৌন্দর্য দেখে আত্মীয় ও কুটুম্বেরা বাকরুদ্ধ হল। তাদের মুখের বর্ণান্তর হল। পাণ্ডবদের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যে ঈর্যান্বিত হলেন

অনেকে। অন্তরালে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ তাদের মুখ নিরীক্ষণ করে একজাতীয় সুখ অনুভব করলেন। এবং তাদের প্রত্যেকের মানসলোকের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর খুব কাছে ছিল দুর্যোধন। মুখ তার আগুনের মত গন্ গন্ করছিল। বিস্ময়ে তার চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছিল। মনে হল, তার দৃষ্টি যেন দগ্ধ করছিল মণিময় সভার রূপ ও সৌন্দর্য। থেকে থেকে কেবলই দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল তার। তাপিত হৃদয়ের দুঃখ ও হাহাকার ক্রমে দুঃসহ হল তার কাছে। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাকেই সর্বাপেক্ষা অন্যমনস্ক মনে হল কৃষ্ণের। পাণ্ডবদের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের চিরশত্রু করে রাখল।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দেখছিলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। সকৌতুকে তার মুখের রূপ ও রঙের পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। আর মনে মনে হাসছিলেন। অনেকক্ষণ পর সকৌতুকে লঘু স্বরে ফিস্ ফিস্ করে জিগ্যেস করলেনঃ ধৃতরাষ্ট্র নন্দন, আপনি কি পীড়িত? অত্যন্ত বিষণ্ণ, ও ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে। আপনার বোধ হয় বিশ্রামের আবশ্যক।

কৃষ্ণের আকস্মিক কুশল প্রশ্নে বিব্রত হল দুর্যোধন। স্বেদ বিন্দু দেখা দিল তার কপালে। এক অজ্ঞাত ভীরুতায় ও সংশয়ে কেঁপে উঠল তার বক্ষদেশ। মনে হল, কৃষ্ণের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে।

দুর্যোধনের আত্ম-সম্বরণ করতে তাই একটু সময় লাগল। লাজুক অপ্রতিভতায় বিব্রত বোধ করল। মৃদু হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারল না সহজে। দ্বিধায় কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল। না। কৈ? না—তো! আমি তো সুস্থ। বিশ্রাম করব কেন?

তার কথা বলার ধরন দেখে হাসি পেল কৃষ্ণের। কিন্তু হাস্য সম্বরণ করলেন অতি কষ্টে। উদ্বিগ্ন হয়ে পুনরায় জিগ্যেস করলেনঃ তবে কি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়েছেন?

দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করল দুর্যোধন! বলল—না, না ওসব কিছু না।

সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রাথমিক বিস্ময় চমক ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হল। কোলাহলও থেমে গেল। এমন সময় যুধিষ্ঠির সভায় প্রবেশ করলেন। পরিধানে তাঁর কৌশিক বস্ত্র। অঙ্গে অগুরুর সৌরভ, চন্দন চর্চিত মুখ, আজানুলম্বিত শুভ্র যূথিকার মালা তাঁর গলে। অগ্রে ও পশ্চাতে ছিলেন ভীম ও অর্জুন।

আসন গ্রহণের পূর্বে যুধিষ্ঠির পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, মহর্ষি ব্যাসদেব, গুরুদেব দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য-এর পাদবন্দনা করলেন। তারপর, অন্তরঙ্গ বান্ধব এবং আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে করজোড়ে নমস্কার নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বললেনঃ আমার পরম আত্মীয় এবং বান্ধবগণ! আপনারা সকলে সর্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। আপনাদের সহযোগিতা ব্যতীত এই

বিরাট কর্মকাণ্ড একার দ্বারা সুসাধিত হওয়ার নয়। এখন অনুগ্রহ করে আমাকে কৃতার্থ করুন এবং বিপুল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।

যুধিষ্ঠিরের বিনয় বচনে সকলে হতবাক্ হল। সকল ঐশ্বর্য ও সম্পদের উপর আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবের কর্তৃত্বের অধিকার স্বীকার করার এই মহত্ত্ব সকলকে হৃষ্ট ও প্রীত করল। শুধু তাই নয়, যজ্ঞকার্যের অংশীদার করে যুধিষ্ঠির তাদের সকলকে আপন পরিবারভুক্ত করল। যুধিষ্ঠিরের বিপুল ঐশ্বর্য যাদের ঈর্ষান্বিত ও লুব্ধ করছিল তারাও প্রসন্ন হল। এবং সাধু, সাধু বলে সমস্বরে সকলে মিলে হর্ষ ও বিস্ময় প্রকাশ করে অভিনন্দিত করল তাঁকে।

যুধিষ্ঠির নিজেও আশ্চর্য হলেন। বহুকালের উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দূর হল। মনে সাহস ও বল পেলেন। প্রফুল্লিত হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকালেন। সাফল্যের হাসি কৃষ্ণের ওষ্ঠাধারে বর্তুল হল। ইশারায় পিতামহ ভীষ্মকে দেখিয়ে দিয়ে পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁকে নির্দেশ দিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ্য হলেন পিতামহ ভীষ্ম। যজ্ঞ-কার্যের জন্য ঋত্বিক এবং সর্বস্তরের কার্য পরিচালনার জন্য কর্মী নিযুক্ত করার দায়িত্ব যুধিষ্ঠির তাঁর উপর অর্পণ করলেন। কিন্তু তাঁর বিচার ও বিবেচনাবোধের উপর পিতামহের প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তাই, কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ করলেন। ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য একযোগে ভীষ্মের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

সভার মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। সকলকে আরও একবার নমস্কার নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেনঃ সুধীবৃন্দ! পিতামহ ভীষ্ম স্নেহবশতঃ আমার মত অর্বাচীনকে যে দুরূহ কার্যের ভার অর্পণ করলেন, আমি তার যোগ্য নই। তবু, তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে এবং স্বর্গত পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমার বিবেচনামত যাঁদের নাম প্রস্তাব করছি পিতামহ ভীষ্ম ও মহাতপস্বী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করতে পারেন। তাঁদের আদেশ, নির্দেশ এবং পরামর্শ আমি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করব।

চতুর্দিক থেকে সকলে সাধু সাধু করে তাঁকে সমর্থন করল। সভাস্থ ব্যক্তিদের অনুমোদন যুধিষ্ঠিরের মনে বল সঞ্চার করল। নিজের উপর তার আস্থা বাড়ল। মনে মনে স্বর্গত পিতা ও সখা কৃষ্ণের নাম স্মরণ করে বললেনঃ যজ্ঞ আরম্ভের পূর্বে ও সমাপ্তির পরেও যে কাজগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বের সঙ্গে পালন করতে হয় সেই কাজগুলির দায়িত্ব পিতামহ ভীষ্মের আদেশানুসারে আমি যাঁদের মধ্যে বণ্টন করেছি অনুগ্রহ পূর্বক তা শ্রবণ করুন।

এই বলে, একটু থামলেন যুধিষ্ঠির। বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণকে খুঁজল। কিন্তু মস্তক অবনত করে রাখার জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অসহায় অন্বেষণ দেখতে পেলেন না। দায়িত্ব বণ্টনের যে তালিকাটি কৃষ্ণ প্রস্তুত করেছিল তাই দেখে যুধিষ্ঠির পাঠ করতে শুরু করলেন।

বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুসারেই দায়িত্ব-বণ্টন সমীচীন বলেই

আমার মনে হয়েছে। পরম মঙ্গলাকাঙ্খী এবং শ্রদ্ধাস্পদ পিতামহ ভীষ্ম এবং শাস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য যদি অনুগ্রহ করে কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে আমি কৃতার্থ হই। ভোজন প্রিয় অনুজপ্রতিম দুঃশাসনকে খাদ্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান ও বণ্টনের ভার অর্পণ করলাম। গুরুপুত্র অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণদের যত্ন, পরিচর্যা ও আতিথেয়তার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। ঐশ্বর্যে বীতস্পৃহ গুরু কৃপাচার্যকে ধনভাণ্ডার ও রত্নভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। এবং দক্ষিণাদি প্রদানের ব্যবস্থাও তাঁর হাতে রইল। ধর্মাত্মা বিদুর আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণের কার্য করবেন এবং প্রয়োজন বুঝে নিজের মত সুসঙ্গত অর্থব্যয় করে সব কাজ সুন্দররূপে সম্পন্ন করলে অনুগৃহীত হব। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের উপহার উপঢৌকনাদি গ্রহণ করে, তাদের সাদর সম্ভাষণ ও প্রীতি জ্ঞাপনের দায়িত্ব অর্পণ করলাম স্নেহানুজ মহামানী দুর্যোধনকে। আর, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, ভগ্নীপতি জয়দ্রথ, বাহ্লীক রাজ সোমদত্ত গৃহস্বামীর ন্যায় গৃহের সমস্ত কার্য পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করলে সর্বাপেক্ষা শোভন হয়।

যুধিষ্ঠির তাঁর বক্তব্য শেষ করে পিতামহ ভীষ্মের দিকে তাকালেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, ব্যাসদেব সকলেই যুধিষ্ঠিরের বিচক্ষণতায় বিস্মিত হলেন। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাঁরা অনেকক্ষণ যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধবেরা বাক্‌রুদ্ধ হল। যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে তারা খুবই আশান্বিত হল।

ভীষ্ম উঠে দাঁড়ালেন। যুধিষ্ঠিরের বিচক্ষণতার প্রশংসা করে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও দিলেন। বক্তব্যের শেষ প্রস্তাবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর, ত্রুটিহীন বললেন এবং তাকে অনুমোদন করলেন। উচ্চ কণ্ঠে দৌবারিকরা সে কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে সভার সর্বপ্রান্তে পৌঁছে দিল। বিপুল হর্ষধ্বনি করে সভার লোকেরা ভীষ্মকে স্বাগত জানাল।

কোলাহল প্রশমিত হলে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে যুধিষ্ঠির বললেনঃ ভদ্রগণ! আপনারা প্রত্যেকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এখনও একটি কাজ বাকী আছে আমাদের।

অমনি সভার কোলাহল স্তব্ধ হল। বিস্ময় ও কৌতুহল নিয়ে সকলে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল। তাদের দিকে কৌতুক স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেনঃ সখা কৃষ্ণ, স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালনে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়। তার ভার অর্পণের জন্য আমায় সে অনুরোধ করেছে! আপনারা অনুমোদন করলে আমার সখা কৃতার্থ হয়। আমিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারি।

এই বলে, যুধিষ্ঠির সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং ভীষ্ম প্রভৃতির দিকে তাকালেন। সভার সমাপ্তির মুখে এ ধরনের কৌতুককর পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে কেউ চিন্তা করেনি। তাই যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবের পর কারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হল না। তখন সকলেই এ-ওর মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল। এবং একযোগে সকলের দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। সভার ঠিক মধ্যস্থলে. দুর্যোধনের পাশেই মাথা নীচু করে

সপ্রতিভ হয়ে বসেছিলেন কৃষ্ণ। তাঁর মিনতি ভরা দুই চক্ষে সম্মতির মৌন প্রার্থনা।

পিতামহ ভীষ্ম চমৎকৃত হয়ে বললেন ঃ ধন্য ধন্য কৃষ্ণ। লোকে তোমাকে বলে মহান, দেবচরিত্রের মানুষ। সত্যিই তোমার তুলনা হয় না। তুমি যথার্থই মহান। যথার্থই পুরুষোত্তম। তোমাকে শতকোটি নমস্কার

অষ্টম অধ্যায়

আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ, বিশিষ্ট অতিথি, ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষি প্রভৃতির সম্মুখে যজ্ঞ আরম্ভ হল।

বিধি অনুযায়ী পুরোহিত ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক বরণ শেষ হলে, যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন ঃ পিতামহ, উপস্থিত রাজগণের প্রত্যেককে মাল্যবন্দনাদির অর্ঘ্য নিবেদন করতে হলে এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত হবে। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় কি, অনুগ্রহ করে বলুন।

ভীষ্ম বললেন ঃ কৌন্তেয় এরূপ অবস্থায় সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতিভু হিসাবে মাত্র কয়েকজনকে অর্ঘ দিলেই তোমার চলবে। কিন্তু তার পূর্বে, এ সভার সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে তোমার অর্ঘ্য প্রদান করা আশু কর্তব্য। আমার ধারণা, সভাস্থ প্রবীণ ও নবীন সকলেই আমার সাথে একমত হবেন।

ভীষ্মের উক্তি দৌবারিক কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে পুনঃ উচ্চারিত হলে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মৃদুগুঞ্জন আরম্ভ হল। অল্পক্ষণ পরেই উৎফুল্ল হর্ষধ্বনি কক্ষের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রতিহত হতে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। সাধু! সাধু!

সভাকক্ষের উন্মাদনা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হল না। তবে. সে মৃদুগুঞ্জন সভার কার্য পরিচালনার কোন বিঘ্ন হল না। কিন্তু অনেক আত্মদম্ভী নৃপতির ললাটে চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। যুধিষ্ঠিরের ঘোষণা শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল তারা।

গণ্যমান্য ব্যক্তির অভাব নেই এই সভায়! এখন যুধিষ্ঠির কাকে অগ্রাহ্য করে কাকে সম্মানিত করবেন, তাই দেখার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল! বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যেকেই নিজের অর্ঘ্যলাভের যোগ্য ব্যক্তি বলে ভাবল।

তাঁরের কাছে এই সম্মান বা অবহেলার উভয় মূল্য অনেকখানি। কোন কারণে যদি সে দাবি উপেক্ষিত হয় তাহলে অপমান এবং অসম্মান তাদের বংশ মর্যাদা ও পদ গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। তাই, একটা অস্থির উত্তেজনার মধ্যে তাদের কাল কাটছিল। যুধিষ্ঠিরের নাম ঘোষণা করতে যত বিলম্ব হচ্ছিল, ততই তাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়ছিল।

তবে, যুধিষ্ঠিরের উপর সকলের প্রবল আস্থা। তাঁর সত্যবাদিতা প্রবাদ বাক্যের

মত কথায় কথায় মানুষ উল্লেখ করে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলে সর্বজন বন্দিত মানুষ তিনি। মিথ্যা বলেন না কখনও। সত্য যত অপ্রিয় এবং নিষ্ঠুর হোক, যুধিষ্ঠিরের রসনা তার উচ্চারণে ক্ষান্ত হয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাই প্রত্যেকে ভাবতে লাগল যে, যুধিষ্ঠিরের নিরপেক্ষ বিচারের রায়টি তার অনুকূলে যাবে। আশান্বিত হয়ে তারা মনে মনে নানারকম আকাশ-কুসুম চিন্তা করতে লাগল। এবং সুখস্বপ্নে মগ্ন হল।

কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য প্রদান করা যুধিষ্ঠিরের একান্ত ইচ্ছা। পান্ডবদের দুর্দিনের বন্ধু এবং সৌভাগ্যের মুকুটমনি বলেই যে কৃষ্ণকে অর্ঘ্যের যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করলেন, তা নয়। নিরপেক্ষ বিচারে কৃষ্ণের সমকক্ষ সর্বগুণ-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মনীষী বিশাল পৃথিবীতে আর একটিও নেই। তথাপি, সে নাম উচ্চারণ করলে স্বার্থান্বেষীরা কখনই হৃষ্ট মনে গ্রহণ করবে না। তাঁর নিরপেক্ষ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি সকলে সন্দিহান হবে। এবং তাঁর নাম গৌরব ক্ষুণ্ণ করার জন্য দুর্নাম রটনা করবে। নিরপেক্ষ বিচার প্রহসন বলে উপহাসিত হবে। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কর্তব্য নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ হল।

কৃষ্ণ একজন প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক যাদব সমবায় রাষ্ট্রের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি। যুধিষ্ঠির তাঁর নাম উত্থাপন করলে সমস্ত ব্যাপারটা একটা রাজনৈতিক রূপ লাভ করবে। এবং অকারণ রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধির আশংকা থাকবে। কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রজাতান্ত্রিক যাদব রাষ্ট্রের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিকে জরাসন্ধ গোষ্ঠীর রাজন্যবর্গ কোন অবস্থাতেই স্বীকার করবে না। একটা সাজানো ঘটনা বলে মনে করবে। ভাববে, স্বার্থরক্ষার জন্যই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠত্বের অর্ঘ্য দান করল। এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণের পুরুষোত্তম ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে।

সমস্যা হল যুধিষ্ঠিরের। এখন কি করলে সব দিক রক্ষা পায় তার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। যজ্ঞ কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য যাঁর পরামর্শ ও নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলেন, সেই সর্ব প্রাচীন এবং প্রধান, মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ সত্যব্রত ভীষ্মের উপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল তাঁর! তাই, সমবেত রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠির বললেন ঃ মহামান্য অতিথিগণ! এই সভায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান ব্যক্তি হলেন ভীষ্ম। তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। অর্ঘ্য লাভের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব আমি তাঁর উপরে অর্পণ করলাম। এখন পিতামহ আমার অনুরোধ গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

যুধিষ্ঠিরের বিনয় বচনে মুগ্ধ হলেন ভীষ্ম। উপস্থিত রাজন্যবর্গও যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব খুশী মনে গ্রহণ করল। কৃষ্ণ বিরোধীরা অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হল। হর্ষধ্বনি করে যুধিষ্ঠিরকে তারা অভিনন্দিত করল।

এসব ছবি কৃষ্ণের মনে অনেক আগেই আঁকা ছিল। রেখায় রেখায় মিলে যেতে স্বস্তি পেলেন।

সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব ভীষ্মের উপর অর্পণ করার পরামর্শ কৃষ্ণই

তাঁকে দিলেন। এর ফলে যুধিষ্ঠিরের অপ্রিয় হবার ভয় রইল না। কারণ ভীষ্ম যাকেই নির্বাচন করুন না কেন তার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যক্ষ কোন দায়িত্ব থাকবে না। এবং কেউ তাঁকে দোষীও করতে পারবে না।

ভীষ্মের ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারের উপর কৃষ্ণের অগাধ আস্থা। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র মাধুর্য, শৌর্য, বীর্য, মহানুভবতা প্রভৃতির প্রতি ভীষ্ম অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ ও উদ্দেশ্যের একজন সমর্থকও বটে। কৃষ্ণের একজন অনুরাগী তিনি। তাছাড়া তাঁর বিচার অত্যন্ত নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন। সুতরাং, কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য ভীষ্ম তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অর্পন করবে না; এ বিশ্বাস আছে।

কিন্তু শিশুপালের মনে প্রবল সন্দেহ। তার কেবলই মনে হতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো-গোছানো একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আর এই চক্রান্তের মধ্যমণি কৃষ্ণ। তার নির্দেশেই সব সম্পন্ন হচ্ছে। অথচ সে রয়েছে সব কিছুর আড়ালে। দৃষ্টির অগোচরে। তাকে কেউ জানতে বা দেখতে পাচ্ছে না। যুধিষ্ঠির তার নিযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধি মাত্র। কৃষ্ণের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির মূলে সে পৌঁছতে চাইল। কিন্তু তল খুঁজে পেল না। রাজনীতির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে কেবলই ঘুরতে থাকল।

সামাজিক সৌজন্য, বিনয় ও শিষ্টাচার রক্ষাব জন্য যুধিষ্ঠির সব কাজেই ভীষ্মের মৌখিক, সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করছিল। এবং সেই অনুযায়ী সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্বও সে তাঁকে অর্পণ করল। কিন্তু কেন? ভেবে পেল না শিশুপাল। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এসব জেনেও যুধিষ্ঠির তার দায়িত্ব গ্রহণ করল না। শুধু কি অপ্রিয় কর্মানুষ্ঠান মনে করে সরলমতি যুধিষ্ঠির তা থেকে দূরে সরে থাকতে চাইল? যুধিষ্ঠির এখন রাজ-চক্রবর্তী। সব নরপতির অধিপতি সে। রাজনৈতিক তাৎপর্য বিবেচনা না করে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে কি আদৌ সম্ভব?—বিশ্বাস হল না শিশুপালের। তবে একটা গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি যে এর পশ্চাতে আছে তা অনুমান করল। কিন্তু তার রহস্য ভেদ করতে পারল না।

পাণ্ডব ও কৌরব উভয়েই ভীষ্মের সমান আপনজন। উভয়ের সন্তুষ্ট হওয়ার মত কাজ করা ভীষ্মের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ভীষ্মকে কৌরব পক্ষীয় জেনেও যুধিষ্ঠির তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচনের ভার অর্পণ করলেন কেন? সে কি শুধু ভীষ্মের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবোধের পরীক্ষার জন্য? হাসি পেল শিশুপালের। কিন্তু সে হাসি বর্তুল আকার প্রাপ্ত হওয়ার আগেই মিলিয়ে গেল ওষ্ঠে।

পিতামহ ভীষ্ম নিজেই অর্ঘ্যলাভের যোগ্য ব্যক্তি। সেই জন্য কি যুধিষ্ঠির তাঁকে বিচারকের পদে আসীন করে অর্ঘ্যলাভের অধিকার থেকে সুকৌশলে বঞ্চিত করতে চাইল? ভীষ্ম ব্যাপারটা ভাল করে তলিয়ে দেখেনি বলে আপশোষ হল শিশুপালের। কিন্তু মনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করল না। একদৃষ্টে ভীষ্মের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ভীষ্ম পড়লেন সংকটে। সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তির যোগ্যতার নিরূপণ অতীব দুরূহ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য দানের যোগ্য বলে মনে করলেন। সর্বজাতি ও সর্বমানবের মিলনভূমি রচনার জন্য যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন কারছেন কৃষ্ণ। বিভেদ বিদ্বেষের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে মানুষে মানুষে ও রাজ্যে রাজ্যে প্রীতি, মৈত্রী সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা এবং সহবস্থানের উপর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্বন্ধ স্থাপনের যে উদ্যোগ কৃষ্ণ গ্রহণ করেছেন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য ভীষ্মের মন প্রাণ উন্মুখ হয়েছিল। কৃষ্ণের চরিত্র মাধুর্য, নিরহংকার ব্যক্তিত্ব, নির্লোভ কর্ম, জন-গন-মন অধিনায়ক হওয়ার অসীম ক্ষমতা ভীষ্মকে মুগ্ধ করে। মানুষের কল্যাণের জন্য, পরিত্রাণের জন্য কৃষ্ণ নিজেকে বাল্যকাল থেকে উৎসর্গ করেছেন। সব বিপদ বাধা জয় করে এগিয়ে চলেছেন। তাঁকে দেখলে, তাঁর কথা ভাবল মন পুলকিত হয়। অসীম শ্রদ্ধায় হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের উদ্দেশ্যকে তাৎপর্যপূণ্য করে তুলতে হলে কৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ বাক্তির অর্ঘ দেয়া উচিত বলে মনে করলেন ভীষ্ম।

মৃদুস্বরে ভীষ্ম বললেন ঃ বৎস, যাঁর ইচ্ছায় এই সভা তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যাঁর সান্নিধ্য সর্বজনকে তৃপ্ত করে, যাঁর বচন শ্রবণে হৃদয় আকুল হয়, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কারও কথা মনে আসছে না। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, তেমনি সমাগত সকল জনের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। তারই জন্য এই সভা আলোকিত ও আহ্লাদিত হয়েছে—তুমি তাঁকেই ঐ অর্ঘ্যদান কর।

তাহলে অন্তরের প্রার্থনা সত্যিই দেবতা পূরণ করল! কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় যুধিষ্ঠিরের অন্তর পূর্ণ হল। আনন্দে দীপ্ত হল চক্ষুদ্বয়। একাধিকবার ইষ্টদেবকে মনে মনে স্মরণ করলেন। জোর করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

দৌবারিকেরা প্রস্তুত ছিল। যুধিষ্ঠিরের ইংগিত পাওয়া মাত্র একাধিক দৌবারিক উচ্চকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত করে তা সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের কর্ণগোচর করল। চতুর্দিকে সমস্বরে সাধু সাধু রব উঠল। স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি সভা-গৃহ গমৃ গমৃ করতে লাগল।

সভার মধ্যস্থলে জরাসন্ধ ঘেঁষা গোষ্ঠীবর্গের আসন নির্দিষ্ট ছিল। তারা কিন্তু ভীষ্মের প্রস্তাব অনুমোদন করল না। সভাগৃহে উল্লাস উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হলে তাদের চাপা গুঞ্জন অসন্তোষ, উত্তেজনা স্পষ্ট প্রতিভাত হল। এবং ক্রমশই তার উত্তাপ বাড়তে লাগল। যুধিষ্ঠির কালক্ষেপ না করে ঐ অবস্থার মধ্যেই কৃষ্ণের অর্ঘ্যদানের কার্য সমাপ্ত করলেন।

চেদীরাজ শিশুপাল ক্ষিপ্ত মাতঙ্গের মত আর্তনাদ করে উঠল। তার কর্কশ কণ্ঠস্বরে শ্বেতশুভ্র পাষাণ দেয়াল বিদীর্ণ হল। স্তম্ভের গায়ে প্রতিহত প্রতিধ্বনি সভাকক্ষকে কাঁপিয়ে তুলল। এক নিমেষে স্তব্ধ হল উচ্ছ্বাস ও উল্লাস। হতভম্ব হয়ে সবাই তাকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

চেদীরাজের দু'চোখে আগুন। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করছিল। ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করতে লাগল সে। ক্রোধে লোম খাঁড়া হল। বিদ্বেষ ও ঘৃণায় অধর-যুগল হল কুঞ্চিত। ভীষ্মের দিকে বদ্ধ মুষ্টি আন্দোলিত করে সিংহের মত গর্জন করে বলতে লাগল ঃ ধিক্ ধিক্ আপনার ভীষ্ম নামের। সত্যব্রত নামের কলঙ্ক আপনি। কৌরবের অন্নদাস হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাদের সঙ্গে। আপনাকে ধিক্। আপনি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক—আপনি ঘৃণারও অযোগ্য।

তারপর রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ শিশুপাল বলল ঃ চমৎকার! চমৎকার তোমার ছলনা কৌন্তেয়! ধিক্ তোমাকে। ধূর্ত শৃগালের সঙ্গে থেকে তুমিও শৃগাল হয়েছ। ভেবেছিলাম, রাজনীতি বোঝ না তুমি। এখন দেখছি, তুমি একজন ভণ্ড ধার্মিক, ধর্মের ভেখধারী। তোমাকে চিনতে ভুল হয়েছে আমাদের। কৃষ্ণ পূজাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে কৃষ্ণের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদাশালী বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রবীন রাজাদের এভাবে ডেকে অপমান করলে কেন? তুমি কি ভেবেছ, আমরা তোমাকে কর দিয়েছি ভয়ে বা লোভে? ভুল। স্বপ্নেও ভেবোনা সেকথা। তোমার নব গঠিত আঁতাত আশ্রয় লাভের করুণাপ্রার্থীও নই আমরা। শুধু তুমি ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছ বলেই তোমার কার্যে সাহায্য করেছিলাম মাত্র। কিন্তু এখন তুমিই আমাদের গ্রাহ্য করছ না। ভারত বিখ্যাত বীর জরাসন্ধকে যে দুরাত্মা অন্যায় উপায়ে নিহত করল সেই ধর্মচ্যুত কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়ে তোমার সব খ্যাতি নষ্ট করলে। ছিঃ ছিঃ! রাজচক্রবর্তী হওয়ার লোভে তুমি নিজের বিবেচনা, বিবেক, বুদ্ধি, ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিলে? তুমি এখন করুণারও অযোগ্য।

তারপর সভাস্থ নৃপতিবর্গকে উদ্দেশ্য করে কম্পিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল ঃ আমার প্রিয় বন্ধুগণ! যুধিষ্ঠির আপনাদের সঙ্গে অধর্ম করেছেন। কৌশলে আমাদের সকলকে প্রতারণা করেছেন। সম্মানিত ও মর্যাদাশালী প্রধান নরপতিদের করেছে অপমান। অবশ্য বিশ্বাসঘাতক ভীষ্ম সেজন্য প্রত্যক্ষ দায়ী। বৃদ্ধ তিনি। বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছে তাঁর। মতিভ্রম না হলে কেউ চিন্তা করতে পারে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য পাবে কৃষ্ণ? ভাবতে লজ্জা করে ভীষ্মের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও কৃষ্ণের অন্ধ স্তাবক একজন। কৃষ্ণ যাদু করেছে তাঁকে। সে রাজা নয়। তবু তার নাম ঘোষণা করল। এটাই আশ্চর্য! ভীষ্ম জানে রাজা ছাড়া পূজা লাভের অধিকার কারও নেই। আর বিধি বহির্ভূত কর্মই যদি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রেত হয় তাহলে বয়ঃবৃদ্ধ বসুদেব, দ্রুপদ, অশ্বত্থামা, দ্রোণাচার্য, কৃপ, শল্য, কর্ণ প্রমুখেরা থাকতে কৃষ্ণকেই অর্ঘ্যদানের যোগ্য পাত্ররূপে বিবেচনা করল কেন? তার এই অবিবেচনার জন্য আমি নিজেই লজ্জা অনুভব করছি। ললনাপ্রিয়, লম্পট, শঠ, প্রবঞ্চক কৃষ্ণ হল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! জরাসন্ধের হত্যাকারী পেল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য?

হা-হা-করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল শিশুপাল। জরাসন্ধ ঘেঁষা গোষ্ঠীর রাজন্যবর্গ শিশুপালের হাসির সঙ্গে যোগ দিল। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত সে হাস্যের মত্ততা নিশীথ কালের প্রেতাত্মাদের অসংযত হাস্যরোলের মত ভয়ংকর হয়ে উঠল।

শিশুপাল উৎসাহিত হল। কৃষ্ণের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টি

তার ধারাল ও কুটিল হল। ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে ও ঘৃণায় তাঁর বাক্য হল তীক্ষ্ণ।—ছিঃ! ছিঃ! অর্ঘ্যলাভের জন্য এত কাঙাল তুমি কৃষ্ণ! লোকে তোমাকে নির্লোভ বলে জানে। এই কি নমুনা তার? স্বার্থান্বেষী পাণ্ডবেরা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই অর্ঘ্য দিল। আর, ভিখারীর মত হাত পেতে তুমি তা গ্রহণ করলে? তোমার লজ্জা করল না? এখানে যেসব প্রধান ব্যক্তিরা আছেন তাদের অমান্য করে নিজের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য এত নীচ ও স্বার্থপর হতে পারলে তুমি? তোমার পিতা বসুদেবের সম্মান মর্যাদা গৌরব ক্ষুণ্ণ করে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করতে তোমার লজ্জা হল না? ধিক্ ধিক্ তোমার লোভের। কুকুর যেমন আস্তাকুঁড়ের ঘি ভোজন করে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেরূপ পূজা পেয়ে গৌরব বোধ করছ। ধন্য, মনে করছ নিজেকে। ধিক্ ধিক্ তোমার নির্লজ্জ স্বার্থপরতা।

শিশুপালের নাটকীয় নিন্দাবাক্য ও ধিক্কারে সভামণ্ডপ থম থম করছিল। ভীষ্ম নির্বাক। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না। কৃষ্ণও অসম্ভব নির্বিকার। অর্জুন মুহ্যমান! যুধিষ্ঠির স্তব্ধ ও বিস্মিত। কেবল বৃকোদরের নয়নদ্বয় থেকে অগ্নিবর্ষিত হতে লাগল। পিঁপড়ের মত শিশুপালকে পিষ্ট করার জন্য হাত তার নিসপিস করছিল।

যাত্রাদলের নায়কের মত শিশুপাল যখন অনুগত রাজন্যবর্গ সহ যজ্ঞমণ্ডপ পরিত্যাগে উদ্যত হল পুরুষসিংহ ভীষ্ম তখন চীৎকার করে বলল: দাঁড়াও মূঢ়! জরাসন্ধের যোগ্য সহচর তুমি। কিন্তু তার অপেক্ষাও হীন ও নীচ। শোন দুর্মতি—তেজে, বলে, পরাক্রমে, গুণে কৃষ্ণের সমতুল্য ব্যক্তি এখানে কেউ নেই। শত্রু বধার্থে কৃষ্ণ কখনও দস্যুবৃত্তি করে না। নিরীহ নিরপরাধ সৈন্যবাহিনীর প্রাণহরণ করে সে তার পৌরুষ, বীরত্ব-প্রদর্শন করে না। মূল শত্রুর সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। দ্বৈরথ যুদ্ধে বল বীর্যসম্পন্ন শত্রুকে পরাস্ত করা ক্ষত্রিয়ের গর্ব। কৃষ্ণ তাই বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে রাজাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে। এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও নেই যিনি কৃষ্ণের তেজবলে পরাভূত নয়। এমন কি তুমিও কৃষ্ণের অনুকম্পাপুষ্ট। কৃতজ্ঞ, নরাধম আরও শোন: কৃষ্ণের মত নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ দুর্লভ এই পৃথিবীতে। তার মত নির্লোভ নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ আমার এত বয়স অবধি একজনকেও দেখিনি। রাজ্যে তার লোভ নেই। সিংহাসনেও নেই আসক্তি। মানুষের হিতের জন্য, কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকে মহাভারতের মিলনতীর্থে পরিণত করার কৃতিত্বও তার। মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই, বর্ণে বর্ণে কোন তফাৎ থাকা যে উচিত নয়, নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়—এই মহাসত্য প্রমাণের জন্য আর্য-অনার্য, উচ্চ-নীচ, সাধারণ-অসাধারণ সকলেই যজ্ঞশালার অতিথি। সকলের পাদ-প্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করার বিনয়, নম্রতা, মহত্ব তাঁর চরিত্রেই আছে। মানুষের হৃদয়ের দেবতা সে। কৃষ্ণই জনগণের গণদেবতা। সে-ই পুরুষোত্তম! তার প্রেম মহত্ব, ত্যাগ, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, বল, বীর্য, শৌর্য সর্বসাধারণে শ্রদ্ধা করে। তাকে দেখলে আনন্দ হয়। সান্নিধ্যে পরম সুখ জন্মে। বিচ্ছেদে হৃদয় কাতর হয়। আর বিদ্বেষে মনের জ্বালা, যন্ত্রণা বৃদ্ধি

পায়। এইসব কারণ বিবেচনা করে আমি তাকে অর্চিত হওয়ার যোগ্য মনে করেছি।

ভীষ্মের বাক্যে কৃষ্ণবিদ্বেষী শিশুপালের ক্রোধ প্রখর হল। সভামণ্ডপে উত্তেজিত রাজন্যবর্গের ক্ষোভ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত ভয়ংকর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। আয়ত্তে রাখা কঠিন হল। ভীম ও অর্জুন দুই মহাবল কেশরীর মত তাদের সমস্ত বল, বীর্য ও শক্তি সংহত করে যজ্ঞভূমির দুই প্রান্তে পাহারা দিতে লাগল।

চীৎকার ও কোলাহলে বিশৃংখলা উপস্থিত হলে কৃষ্ণকে নিয়ে নানা কটূক্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাণ বর্ষিত হতে লাগল। কিন্তু কৃষ্ণ নির্বিকার। সমস্ত ঘটনাটা কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছিলেন তিনি। আর, মৃদু মৃদু হাসছিলেন। কিন্তু অবস্থা যত ঘোরালো হল, ততই তাঁর কৌতুকপূর্ণ হাসি বক্র ও রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠল।

রাজনীতিতে বিরোধীদের এইসব ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ খুবই সংগত ও স্বাভাবিক। কৃষ্ণ গণতান্ত্রিক রাজ্যের একজন রাষ্ট্র প্রধান। পাঁচজনকে নিয়ে গণতন্ত্র। পরম সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব মতামত ও বিচার বিবেচনাকে গণতন্ত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেজন্য কৃষ্ণ শিশুপালের পছন্দ অপছন্দ এবং নিন্দাবাক্য নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। শিশুপাল একচ্ছত্র রাজা। রাজতন্ত্রে রাজার মতই সব। রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রজা ও রাজকর্মচারীদের মান্য করতে হয় নইলে রাজদ্রোহিতা হয়। রাজার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে যেখানে মিল হয় না সেখানেই রণং দেহী মনোভাব তাঁর। অহংকার, দম্ভে আঘাত লাগলে ক্রোধে উন্মত্ত হন রাজা। ক্রোধে ও অহংকারে শিশুপালও তেমনি কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হল। তার জন্য যজ্ঞস্থল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল।

কিন্তু কৃষ্ণ, ধীর, স্থির, সংযত এবং শান্ত। কৃষ্ণের সহিষ্ণুতায় সহদেব বিস্মিত হল। কৃষ্ণ নিন্দা শুনতে শুনতে সহদেব অসহিষ্ণু হল। রাগে, ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞান হারাল সে। সক্রোধে ও ঘৃণায় বলল ঃ কৃষ্ণের অর্চনায় যারা বিরোধী তাদের মস্তকে আমি পদাঘাত করি।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ার মত জ্বলে উঠল শিশুপাল! জরাসন্ধের অনুগামী নৃপতিবৃন্দও শিশুপালের সঙ্গে সমান আক্রোশে তর্জন, গর্জন আরম্ভ করল। কৃষ্ণের উপরেই তাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ। সম্রাট জরাসন্ধের হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শিশুপাল যেন মরিয়া হয়ে উঠল। অনুগামী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করে বলল ঃ মহীপালবৃন্দ! এই রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডব, যাদব ও অনুগামী অন্যান্য রাজন্য-বর্গকে নিয়ে জরাসন্ধের প্রতিস্পর্ধী এক শক্তিশালী রাজনৈতিক আঁতাত গঠন করল কৃষ্ণ। অথচ আপনারা কেউই তার ছলনা বুঝতে পারলেন না। আশ্চর্য! যুদ্ধের সাহস নেই কৃষ্ণের! সে ভীরু, কাপুরুষ। তস্করের মত গৃহে হানা দিয়ে গৃহীর ধন সম্পদ লুণ্ঠন করা তার প্রবৃত্তি। ধৃত তস্করের মত তাকে এই সভা ক্ষেত্রেই হত্যা করে আমি হৃদয় জ্বালা জুড়োব।

ক্রোধে চেদীরাজের কলেবর কম্পিত হতে লাগল। স্বেদবিন্দুতে প্লাবিত হল

মুখমণ্ডল। নেত্রদ্বয় হল রক্তবর্ণ। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে বলল ঃ শোন দেবকীনন্দন, পুজোর অযোগ্য তুমি। ইতর প্রাণীদের মত বধযোগ্য। সাহস থাকে রক্ষা কর নিজেকে।

হিংস্র শার্দুলের মত দ্রুতবেগে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল শিশুপাল। আর তার অনুগামী রাজন্যবর্গ যজ্ঞভূমি বিনষ্ট করতে অগ্রসর হল।

কৃষ্ণ নিজের আসনে স্থির হয়ে বসেছিলেন। শিশুপালের কদর্য বাক্যের প্রত্যুত্তর করা তাঁর কোন অভিরুচি ছিল না। ভেবেছিলেন একসময় নিজেই শ্রান্ত হয়ে থেমে যাবে। কিন্তু ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সে। শিশুপালের কাছে কৃষ্ণের রাজনৈতিক চাতুরী গোপন ছিল না। তাই একটু মুস্কিল হল কৃষ্ণের।

ক্ষমতা আহরণের পশ্চাতে শিশুপাল কৃষ্ণকেই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তাই কৃষ্ণ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ সে। অপরপক্ষে, শিশুপালও কৃষ্ণের একমাত্র প্রতিপক্ষ। শিশুপালের প্রভাব খর্ব হলে অন্যেরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হবে না। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে এইটুকু সব নয়। আরও আছে। ঐক্যবদ্ধ ভারত রাজ্য গঠনের যে স্বপ্ন তাঁর ছিল, সে কি ধরায় ধূলায় হবে হারা? সাফল্যের স্বর্ণচূড়া জয় করেও পারবেন না তার বিজয় গৌরব রক্ষা করতে? ভাবনায় পড়লেন কৃষ্ণ।

আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিশুপালের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। নিজে থেকে কাউকে আঘাত করা তাঁর ধর্ম নয়। আক্রান্ত হলে তবেই আক্রমণ করেন। তাই, অনেক কাল ধরে শিশুপালের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। আজ সেই শিশুপাল নিজেই সংগ্রামে আহ্বান করল তাঁকে।

যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য শিশুপালও তার অনুগামীরা অগ্রসর হল। কৃষ্ণের নব স্থাপিত ধর্মরাজ্যের ভিত মাটির সঙ্গে ভেঙ্গে মিশিয়ে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। গণ্ডগোল, হৈ-চৈ চেঁচামেচি হুড়োহুড়িতে সভা রসাতলে গেল। তখন সভাসদ্গণকে সম্ভাষণ করে মিষ্টবাক্যে কৃষ্ণ বলল ঃ

হে মহামান্য সজ্জনবৃন্দ! আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ক্ষত্রকুলগ্লানি শিশুপাল আমাকে রণে আহ্বান করেছে। তার সংগ্রাম সাধ অবশ্যই পূরণ করব। শিশুপালকে আমার আত্মীয় বলতে লজ্জা করে। তার অনাত্মীয়সুলভ ব্যবহারে আমি মর্মাহত। পাণ্ডবদের মত সেও আমার প্রিয়জন। অথচ, দেখুন স্বভাবে আচরণে পাণ্ডবদের সঙ্গে তার কত প্রভেদ। আমি তার পরম সুহৃৎ। তবু, আমার প্রতি সে বিদ্বেষ পোষণ করে। যাদবদের সঙ্গে তার ব্যবহারও ভাল নয়। তবু যদুবাসীরা তার সব অত্যাচার উৎপীড়ন আত্মীয় জ্ঞানে ক্ষমা করে আসছে। কিন্তু নরাধম অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক শিশুপালকে কি করে ক্ষমা করব আজ? ক্ষমার পাত্র যে শূন্য আমার। ধর্মরাজের ধর্ম পুজোর যাতে বিঘ্ন উৎপন্ন না হয় সেজন্য তার সব কটুবাক্য, অশিষ্ট আচরণ নীরবে সহ্য করেছি। কুলাঙ্গার, ক্ষত্রকুলগ্লানি শিশুপালের দুষ্কর্মের বিবৃতি দেওয়া সাধ্যাতিরিক্ত। তবু, দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হচ্ছে। জরাসন্ধের প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রলোভনে আত্মীয়ের বেশে সে দ্বারকায় প্রবেশ করল। বলরাম ও আমি সে সময় প্রাগ জ্যোতিষপুরে ছিলাম। নরাধম আমাদের অনুপস্থিতির

সুযোগে দস্যুর মত রাতের অন্ধকারে যাদবদের কুটীরগুলি প্রজ্জ্বলিত করে পলায়ন করল। ভোজরাজ রৈবতকে যখন বিহার করছিলেন তখন অতর্কিতে সেখানে প্রবেশ করে আত্মীয় যাদবদের অকারণে বন্দী করে জরাসন্ধকে উপহার দিয়েছিল। শিশুপাল ক্ষমতালোভী পাপাত্মা। জরাসন্ধের প্রিয় সহচর হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বভ্রুর ভার্যাকে পথিমধ্যে হরণ ও ধর্ষণ করেছিল। এই নৃশংস, আমার ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বীয় মাতুল কন্যা ভদ্রাকে অপরের লালসাবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য হরণে উদ্যত হয়েছিল। নরপশুর এইসব অত্যাচার, অসম্মান আমরা নীরবে সহ্য করেছি! আর, আপনাদের সম্মুখে যে অশিষ্ট আচরণ করল, তাও সহ্য করলাম। আপনারা নিজেও, প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু আজ সে ধর্মের অন্তরায়। ধর্মপালনের স্বাধীনতাকে সে হত্যা করতে চলছে। প্রতিহিংসোন্মত্ত হয়ে সে আমাকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। পিতৃস্বসার মুখের দিকে তাকিয়ে তার সব অনিয়ম অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছি। কিন্তু আজ আর ক্ষমা নয়। আজ যুদ্ধ।

দেখতে দেখতে কৃষ্ণের শান্ত সুন্দর মুখশ্রী বদলে গেল। চক্ষু রক্তবর্ণ হল। দৃষ্টি হল সুতীক্ষ্ণ। প্রলয় অগ্নি যেন নির্গত হতে লাগল সেখান থেকে। কৃষ্ণের এই বিকট, ভীষণ, করাল মূর্তি দর্শন করে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ আতঙ্কে চক্ষু বন্ধ করল। কারও কারও প্রবল হৃৎকম্প উপস্থিত হল। সে দৃষ্টির দুঃসহায়তার সম্মুখে শিশুপালও কেমন জড়বৎ হয়ে গেল। তার সমস্ত বলবীর্যের আস্ফালন কৃষ্ণ যেন যাদুবলে হরণ করে নিলেন। শিশুপালের তখন সম্মোহন অবস্থা; কৃষ্ণের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রস্তরবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন, চেদীরাজের প্রিয়মিত্র ও বান্ধব করূষ্ক এবং অন্যান্য ভূপালগণ তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হল। কিন্তু কৃষ্ণ তাদের সে সুযোগ দিলেন না। বিশেষ ধরনের নির্মিত অস্ত্র সুদর্শন চক্রের সাহায্যে ক্ষিপ্রবেগে তার শিরচ্ছেদ করলেন। সমস্ত ঘটনাটি এত দ্রুত এবং আকস্মিক ঘটল যে কেউ কিছু চিন্তা বা অনুমান পর্যন্ত করতে পারল না। এমন অভূতপূর্ব, অকল্পনীয় ঘটনা যে বাস্তবে সত্যিই সম্ভব চোখে না দেখলে প্রত্যয় হয় না। শিশুপালের মত দুর্ধর্ষ বীর দাঁড়িয়ে মৃত্যু বরণ করবে স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। শিশুপালের সাহায্যের জন্য যারা অগ্রসর হয়েছিল মধ্যপথে হতভম্ব হয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণের ক্রোধ দেখে তারা আতঙ্কিত হল। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে যজ্ঞভূমি ছেড়ে দ্রুত পলায়ন করল।

এরকম একটি ঘটনার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সকলের বেশ সময় লাগল। গণ্ডগোল, হৈ-চৈ কখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না। সভাক্ষেত্রে শ্মশানের নিস্তব্ধতা ও বিষণ্ণতা বিরাজ করতে লাগল। যে যেখানে ছিল সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

পুরোহিতের মন্ত্রধ্বনি বহুদূর হতে শোনা গেল।

নবম অধ্যায়

রাজসূয় যজ্ঞ শেষ। অতিথি অভ্যাগতদের স্বগৃহে ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ধূম পড়ে গেল। পঞ্চ পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণও তাঁদের তদ্বির তদারকে ব্যস্ত। অতিথিদের পথ ক্লেশ লাঘবের জন্য নানারকম ব্যবস্থাদি করা হল। শুধু কি তাই? অকারণ শত্রুতা বৃদ্ধি যাতে না হয় সেজন্য যাদের চিত্তে প্রচ্ছন্ন দ্বেষ, ঈর্ষা ও ক্ষোভ জমার সম্ভাবনা ছিল তাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার ও শিষ্ট আচরণ করে তুষ্ট করতে হল। এইসব কর্ম সমাধা হতে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হল। অত্যন্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূর করতে আরও কয়েকটা দিন গেল তাঁর। তারপর দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের পালা। কিন্তু সে উদ্যোগ করতেই যুধিষ্ঠির আরও কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে একত্রে বসবাস করার বিশেষ অনুরোধ করল। সখাদের সে প্রীতির দাবী অস্বীকারের সাধ্য ছিল না কৃষ্ণের। এমনি করে মাসাধিক কাল কাটল পাণ্ডবদের গৃহে।

তারপর, একটা শুভদিন দেখে কৃষ্ণ দ্বারকায় রওনা হলেন। এত অধিককাল এর আগে কখনও ইন্দ্রপ্রস্থে অতিবাহিত করেননি তিনি। তাই, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বিদায় গ্রহণকালে তাঁর চিত্ত কাতর হল। অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। রথে আরোহণ করেও বারংবার ফিরে তাকাচ্ছিলেন। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ পাণ্ডবদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। তারপর, এক সময় ইন্দ্রপ্রস্থের সুউচ্চ রাজপ্রাসাদের শীর্ষদেশও দিগন্তের শেষ বিন্দুতে বিলীন হয়ে গেল।

ইন্দ্রপ্রস্থের আতিথ্য সমাদর কিছুতে ভুলতে পারছিলেন না কৃষ্ণ। ভোলা যায় না বলেই, স্মৃতিপথে বার বার ভেসে উঠেছিল সেসব। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে এযাবৎ কাল যেসব ঘটনা ঘটে গেল সব মনে পড়ল তাঁর।

পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। তবু অনেক কাজ বাকী এখনও। অন্যায় ও অধর্মের হাতে বন্দী ধর্মের মুক্তি হল কেবল। কিন্তু মানুষের মনটা এখন রইল অবরুদ্ধ। দেশ কাল ও গণ্ডীর বাইরে তার পরিধি বিস্তৃত না হওয়া অবধি সে বাধা ঘুচবে না। মানুষের কোন সার্বিক উন্নতি এবং কল্যাণও হবে না ততদিন। দেশ ও মানুষ বলতে প্রত্যেক নৃপতিই তার নিজের সীমানাটুকু বোঝে। কিন্তু তার বাইরেও যে দেশ ও মানুষ বাস করে, তার সঙ্গে তাদেরও যে ভাল মন্দ জড়িয়ে আছে, কিংবা রাজ্যের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করছে এই বোধ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসে তারা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করল। এখানে না এলে বিভিন্ন দেশের মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় হত না। সকল নৃপপতিরই এ অভিজ্ঞতা নতুন। তথাপি, প্রত্যেকে উপলব্ধি করেছে যে, প্রীতি, মৈত্রী, সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে,

ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে এবং সন্দেহ ও শত্রুতা বন্ধ হবে, এক সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশে সকলে নিজেদের এক পরিবারভুক্ত মনে করবে। তাদের রাজ্য জীবন হবে নিরাপদ এবং বিপদশূন্য। অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের এই শুভ ফল লাভের দিকে আকুল নয়নে তাকিয়ে আছেন কৃষ্ণ। এই অনুভূতি ও উপলব্ধি তাঁর সারা অঙ্গে এক আশ্চর্য শিহরণ সঞ্চার করল।

কৃষ্ণের মনে হল, সাফল্যের জয়যাত্রা যেন সুরু হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভেদ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও কলহের রাজনীতির এক অধ্যায় যেন সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস সহযোগিতার উপর গড়ে উঠেছে এক নতুন রাজনৈতিক আত্মনির্ভরতা। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিবিরগুলি এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ল। তবু তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলেন না কৃষ্ণ। দুর্ভাবনা, উদ্বেগ রয়েই গেল।

ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করেও স্বস্তি এবং শান্তি পেলেন না কৃষ্ণ। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল মন। কেবলই একটা সন্দেহের কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছিল বুকে। ঈর্ষাকাতর দুর্যোধনের বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখখানি ভুলতে পারছিলেন না। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বল জ্বল করছিল তাঁর দুটি চোখ। কিন্তু তার পরিণাম যে এত ভয়ংকর হবে, কৃষ্ণ ভাবতে পারেননি।

সহায় সম্বলহীন ভিখারী পাণ্ডবেরা ঐশ্বর্যে, সম্পদে সৌভাগ্যে যে কৌরবদের পিছনে ফেলে যেতে পারে স্বপ্নেও চিন্তা করেনি দুর্যোধন। তাই অহংকারী ও গর্বিত দুর্যোধনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কৃষ্ণ উপহার ও উপঢৌকনাদি গ্রহণের দায়িত্বভার অর্পণ করলেন তাকে। পাণ্ডবদের প্রতি অন্য রাজ্যের নৃপতিদের শ্রদ্ধা, প্রীতি, আনুগত্য কত গভীর ও আন্তরিক তা তাঁদের প্রদত্ত উপহার দ্রব্যের মধ্যেই প্রকাশ পেল। সেই সব প্রীতির নিদর্শন স্বহস্তে গ্রহণ করেছিল দুর্যোধন। আর, ঈর্ষানলে দগ্ধ হচ্ছিল তার চিত্ত। ভীষণ কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করছিল সে। এই কার্য তার কাছে শাস্তিরূপে বলে মনে হল। সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত থেকে দান গ্রহণের সময় প্রতিনিয়ত যে অভিনয় তাকে করতে হচ্ছিল তার আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছিল তার চিত্ত। এর চেয়ে চরম অপমানকর ও অসম্মানকর কার্য আর কিছু ছিল না তার কাছে। আপন অদৃষ্টকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিল। দুঃখে ও অভিমানে দু'চক্ষু তার অশ্রু ভারাক্রান্ত হল।

দুর্যোধন এই প্রথম অনুভব করল পাণ্ডবেরা আর অসহায় নয়। অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষার পাত্রও নয় তারা। বরং বরেণ্য রাজার গৌরব ও মর্যাদা তাদের দিতে হবে সর্বক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, নিয়মিত রাজকর প্রদানেও বাধ্য তারা। যুধিষ্ঠিরের কাছে এই অধীনতা স্বীকার করতে তার হৃদয় মন দগ্ধ হতে লাগল।

বিজয়লক্ষ্মীর কৃপায় পাণ্ডবদের জীবন ধন্য। প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনদিনই পাণ্ডবদের সমকক্ষ হতে পারল না তারা। শুধুমাত্র এই দুঃখে দুর্যোধনের হৃদয় হাহাকার করে ওঠল। প্রতিহিংসোন্মত্ত হয়ে একদিন চিরশত্রু পাণ্ডবদের নির্মূল করার জন্য জতুগৃহে প্রেরণ করেছিল। কিন্তু কিছুই হল না তাদের। তারপর

রাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার নাম করে হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত গভীর জঙ্গল খাণ্ডব বনে নির্বাসিত করল। কিন্তু তাদের হাতের গুণে তা স্বর্গভূমি হয়ে উঠল। দৈব পাণ্ডবদের সহায় বলে, দুর্যোধন মাতুলের কাছে বারংবার বিলাপ করতে লাগল।

হাসি পেল কৃষ্ণের। সে হাসি বক্র হয়ে ওঠার আগেই অধর প্রান্তে মিলিয়ে গেল। দুর্ভাবনা হল শকুনিকে নিয়ে। জাতি-বিদ্বেষ বহ্নির ইন্ধন যোগানোর কাজে পারদর্শী সে। শকুনি চতুর, বুদ্ধিমান। কুটবুদ্ধির জালে সে শত্রুকে বন্দী করে। মানুষের দুর্বলতার সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলি সম্পর্কে শকুনির জ্ঞান গভীর। তার বুদ্ধিতেই জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল। তারই পরামর্শে হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত গহন অরণ্যভূমি খাণ্ডব-বনে পাণ্ডবেরা নির্বাসিত হয়েছিল। শকুনির প্ররোচনায় পাণ্ডবদের নতুন করে কোন বিপদ ঘটতে পারে বলে কৃষ্ণের মনে হল না। তবু অমঙ্গল আশংকায় তার হৃদয় ক্লিষ্ট হতে লাগল। অস্ফুট কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে বললেন: তাই তো। শকুনিকে প্রতিনিবৃত্ত করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সময় থাকতে পাণ্ডবদের সাবধান করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন কোন উপায়ে তা সম্ভব নয় বলে আপশোষ হতে লাগল কৃষ্ণের।

পাণ্ডবদের সৌভাগ্য দুর্যোধনের অন্তরে যে ঈর্ষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, তার প্রলয় শিখায় কি দগ্ধ হবে ইন্দ্রপ্রস্থ? তাঁর স্বপ্ন সাধনাও কি সেই সঙ্গে পুড়ে ছারখার হবে? অখণ্ড ভারত রাজ্যের ভিত কি ভেঙে হবে তছনছ? ভূস্বর্গ কি হবে না গড়া? স্বপ্নভঙ্গের আশংকায় বিহ্বল হলেন কৃষ্ণ।

রথ ঘোরানোর কথা ভাবলেন কৃষ্ণ। মাথা তুলতেই দেখলেন দ্বারকার পথ দিয়ে রথ চলেছে দ্রুতগতিতে।

অকস্মাৎ বাম অঙ্গ তাঁর কেঁপে উঠল। এক ঝাঁক কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিদীর্ণ হল আকাশ। পথ পার্শ্বের তরুশ্রেণীগুলি পর্যন্ত কেঁপে উঠল আতঙ্কে। বহুদূরে কুকুর ও মার্জারের অসহায় কান্না শোনা গেল। কৃষ্ণের অন্যমনস্কতার অবসান হল। ভয়ে ভাবনায় অধীর হল তাঁর চিত্ত। অমঙ্গল চিন্তা করে বিমর্ষ হলেন।

নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত দ্বারকার এই শ্মশান রূপ কোন দিন স্বচক্ষে দেখতে হবে তাঁকে, স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। ঘর বাড়ী ভাঙা সব; কুটীরগুলি পরিত্যক্ত। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। সমস্ত নগরী শূন্য।

প্রাসাদে পৌঁছানোর পূর্বেই অবগত হলেন সব। ইন্দ্রপ্রস্থে যখন তিনি অবস্থান করছিলেন সেই সময় শিশুপাল হত্যার প্রতিশোধ নিতে শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করল। নগর রক্ষার ভার ছিল প্রদ্যুম্নের উপর। সর্বশক্তি দিয়ে শাল্বর সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ করল সে। কিন্তু শাল্ব সৌভীযান করে জলে স্থলে অন্তরীক্ষ্যে এমন আক্রমণ সুরু করল যে বালক প্রদ্যুম্ন দিশাহারা হল; কোনভাবেই তাকে বশ করতে পারল না। নিজেই সে আহত হল ভীষণ।

কৃষ্ণের মনে পড়ল, শিশুপালকে আঘাত করার জন্যেই সুদর্শন চক্র যখন উদ্যত

করেছিলেন তখন তাকে রক্ষার জন্য যেসব নরপতিরা এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে শাল্বও ছিল এবং প্রাণভয়ে যজ্ঞভূমি থেকে গাঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু এত স্পর্ধা নিয়ে যে দ্বারকা আক্রমণ করবে সে কখনও ভাবেনি কৃষ্ণ।

তস্করের মত দ্বারকায় প্রবেশ করেছিল সে। যোগাযোগের এবং খবর পাঠানোর সব পথগুলি বন্ধ করে দিয়ে সে এক ভয়ঙ্কর নারকীয় প্রতিশোধ গ্রহণ করল। নির্বিচারে শিশু, বৃদ্ধ, যুবাদের হত্যা করল আর যুবতীদের হরণ করে নিয়ে গেল। শাল্বের এই অভাবিত, অকারণ আকস্মিক আক্রমণের প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই ছিল না দ্বারকায়। কৃষ্ণও বন্দোবস্ত করে যাননি তার। অপরিজ্ঞাত এরূপ কর্মের জন্য অনুতাপ দগ্ধ হল তাঁর চিত্ত। তাঁর ভুলের জন্যেই যাদববাসীর এই দুর্গতি। এ জন্য নিজেকে দায়ী মনে হল তাঁর। সুতরাং তার প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত হলেন। ক্রোধে জ্বালা করতে লাগল সর্বশরীর। মনে হল, এই মুহূর্তে শাল্বকে কীটের মত দলিত ও পিষ্ট করতে পারলে সুখ হত তার।

কৃষ্ণকে কখনও ক্রুদ্ধ হতে দেখেননি বলরাম। তাই অত্যন্ত ভীত হলেন। সান্ত্বনা দেবার জন্য কোমল কণ্ঠে বললেন, ভাই কৃষ্ণ। এখন উত্তেজিত তুমি। একটু বিশ্রাম কর। তারপর, ধীরে সুস্থে চিন্তা করে অপরাধী শাল্বের শাস্তি বিধান কর। যুদ্ধ কর। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়।

বলরামের বাক্য কৃষ্ণ কখনও অমান্য করেন না। আজও করলেন না। জ্যেষ্ঠের নির্দেশ শিরোধার্য করে, বিশ্রামের জন্য আপন কক্ষের দিকে যাত্রা করলেন।

কিন্তু মনটা স্বস্তি পেল না। অনুতাপের গ্লানি বুকের মধ্যে জমে বসল। লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রু সাগরের ঢেউ প্লাবিত করল তাঁর বক্ষদেশ। আর, একদণ্ড বিশ্রাম নেওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হল। চিত্ত তাঁর বশে রইল না। গৃহহারা স্বজন হারানো মানুষের আর্তক্রন্দন তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। বিশ্রাম হল কণ্টক যন্ত্রণা। উদ্‌ভ্রান্তের মত কক্ষ পরিত্যাগ করে অস্ত্রাগারের দিকে ধাবিত হলেন।

বসুধা থেকে জরাসন্ধের পাপ সহচরেরা এখনও নির্মূল হয়নি?—আপনাকে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণ। এতগুলি বীরের পতনেও নিরস্ত হল না তারা! আশ্চর্য! আগাছার প্রাণ তাদের। যতই মূলোৎপাটন হোক, কিছুতে বিনাশ নেই তাদের। স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিরই প্রকৃতিই এইরকম। অকারণ বাহুবল প্রয়োগ করে তারা শত্রুতাচরণ করে। সুতরাং, এদের কোন মতে বিশ্বাস করা উচিত নয়। বৃথা কালক্ষয় করা বাহুল্য মনে হল। কর্তব্য স্থির করে ফেললেন কৃষ্ণ।

শাল্বের কোন ক্ষমা নেই। তস্করের মত যাদবদের গৃহে হানা দিয়ে সে যদুবাসীর সম্ভ্রম ও মর্যাদার শ্লীলতাহানি করেছে। দস্যুর মত লুণ্ঠন করেছে নারী ও ধনরত্ন। বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মার যোগ্য শাস্তি মৃত্যু। নিজের হাতে সেই শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হলেন কৃষ্ণ।

*

বায়ুবেগে রথ চলল শাল্বের সন্ধানে।

মনে হল, মহাকাল যেন সহসা জেগে উঠেছেন। মহাপ্রলয়ের নাকাড়া যেন বাজছে রথচক্রের ঘর্ঘরে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ভয়ে বিবর্ণ হল।

শাল্ব শৃগালের মত ধূর্ত। গন্ধর্বদের মত মায়াবী। যুদ্ধের নিয়ম-নীতি মেনে চলে না সে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে কোন প্রকারের অনাচার ও হীন কাজ করতেও কুণ্ঠিত নয় সে। সৌভী নামক এক অদ্ভুত যানে করে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যত্রতত্র সে অবাধে বিচরণ করে। সুতরাং তাকে স্বীয় আয়ত্তের মধ্যে লাভ করা কঠিন হল কৃষ্ণের। শাল্ব সর্বদাই দূরে দূরে অবস্থান করতে লাগল। অবিরাম অস্ত্র বর্ষণ করেও তার ক্ষতি করতে পারলেন না কৃষ্ণ। দীর্ঘকাল ধরে চলল সংগ্রাম। বিরামহীন সংগ্রামে পরিশ্রান্ত হলেন কৃষ্ণ। শাল্বকে যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব মনে হল তাঁর। পরাজয়ের আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল।

কৃষ্ণের মত বীরের সঙ্গে দিবারাত্র সংগ্রাম করে শাল্বও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কৃষ্ণকে নিরস্ত্র করার এক ফন্দী করল সে। একজন বন্দী বৃদ্ধ যাদবকে কৃষ্ণের কাছে প্রেরণ করল।

যাদবটি একজন সাধারণ লোক। সরল নিষ্পাপ তার চেহারা। তাকে দেখলে মায়া হয়। হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিল সে। আকুল স্বরে ডাকছিল—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কোথায় তুমি?

কৃষ্ণকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়াল। দুচোখে তার বিস্ময়। নির্ণিমেষ নয়নে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে গেলে নতজানু হয়ে প্রণাম করল সে। কৃতাঞ্জলিপুটে বলল ঃ ওগো যাদবের নয়নমণি অপরাধ নিও না আমার। শাল্বের বন্দী আমি। কারাগারের গরাদ ভেঙে পালিয়েছি। অনেক খোঁজা খুঁজি করে তোমার সাক্ষাৎ পেলাম। কিন্তু কি বলব আমি?

লোকটি হাঁপাচ্ছিল। আর জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। কৃষ্ণের দিকে ভাল করে তাকাতে পাচ্ছিল না। ভীষণ ভয় করছিল তার। চোখ নীচু করে রইল।

সহানুভূতির দৃষ্টিতে কৃষ্ণ তাকালেন তার দিকে। করুণাঘন সে আঁখির আকর্ষণ তার মনে সাহস সঞ্চার করল। কৃষ্ণের চোখের উপর চোখ রাখতে লোকটির ভাবান্তর হল। আকুল করা কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার কান্নায় বিহ্বল হলেন কৃষ্ণ। আত্মসংবরণ করে সে বলল ঃ ওগো রাজা! বলতে বুক আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে। নরাধম শাল্ব, আপনার বৃদ্ধ পিতা-বসুদেবকে হত্যা করেছে।

সে কথা শুনে কৃষ্ণ স্তম্ভবৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দৃষ্টি স্থির এবং শূন্য। ধীরে ধীরে বেদনা ঘনিয়ে উঠল চোখে। চক্ষু দুটি সিক্ত হয়ে উঠল। বেদনায় থম থম করতে লাগল মুখমণ্ডল।

যাদবটিও কৃষ্ণের সঙ্গে সমানে অশ্রু বিসর্জন করছিল। কথা বলতে গেলে তার বাক্‌রোধ হচ্ছিল। তবু ক্লেশ স্বীকার করে বলল: প্রায় সব যাদব প্রধানেরা শাল্বের হাতে বন্দী। কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। আপনি যদি এক্ষুনি যুদ্ধ ত্যাগ না করেন তাহলে নরপিশাচ শাল্ব হত্যা করবে তাঁদের। আপনি রক্ষা না করলে নিহত হবেন তাঁরা।

চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কৃষ্ণ। সুপ্রশস্ত বক্ষ অশ্রুতে প্লাবিত করে কৃষ্ণ ব্যথাবিকৃত কণ্ঠে বললেন: রাজধর্মের দায়িত্ব সূত্রে বাঁধা আমি। কিন্তু বন্দী নই। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কারও অধীন নয়। আত্মীয়দের জন্য এই রাজপদ। তাঁদের বিসর্জন দিলে কি নিয়ে থাকব?

আবেগে ভেঙ্গে পড়লেন কৃষ্ণ। তাঁদের উদ্ধারের কোন পথ দেখতে পাচ্ছেন না। নিজেকে তাঁর অত্যন্ত অসহায় এবং বিপন্ন মনে হল। অথচ, চরম সংকটে কিংবা দারুণ দুঃসময়ে তিনি কখন বিচলিত কিংবা বুদ্ধিভ্রষ্ট হন না। এই চিত্তদৌর্বল্যের জন্য বারংবার নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি এবং বিহ্বলতা জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। এক সময় মনকে দৃঢ় করে তুলতে সক্ষম হলেন।

মনে মনে সমস্ত বিষয়টা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলেন। তাহলে কি স্বজনদের পণ রেখে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার কথা চিন্তা করছে শাল্ব? এত নীচ ও হীন সে! ঘৃণায় গা তাঁর ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল। ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হল। মনে হল, এখনই একটা কঠিন শিক্ষা দিতে পারলে ভাল হত তাকে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? অনেকদিন ধরে যুদ্ধ করেও আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়নি তাকে। যুদ্ধের ফল সম্পর্কে এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় যুদ্ধ করলে যাদব প্রধানেরা নিহত হবেন। তাঁদের প্রাণ রক্ষার একটা নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই তাঁকে পালন করতে হবে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে একজন যাদবকে দিয়ে যখন তাঁরা খবর পাঠিয়েছেন তখন তাদের মুখ চেয়ে যুদ্ধের ইতি টানতে হবে এখানে। কিন্তু পরাজয়ের লজ্জা, অপমান, অসম্মান নিয়ে বাঁচবেন কি করে? শত্রুরা যে উপহাস করবে! দেশে দেশে ভীরু কাপুরুষ বলে অপবাদ রটবে। কৃষ্ণ নামের গৌরব-রবি অস্তমিত হবে। সখা পাণ্ডবেরা বা তাকে ভাববে কি? মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মত মাটি থাকবে না পায়ের তলায়। একদিকে প্রবল আত্মগরীমা অন্যদিকে পিতা ও আত্মীয়দের প্রাণ রক্ষার কর্তব্যবোধ, তার অন্তরাত্মাকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগল। অসহ্য উত্তেজনায় শিবির মধ্যে একা অস্থিরভাবে পদচারণা করতে লাগলেন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। একটা তীব্র সন্দেহে মনটা দুলে উঠল। বিদ্যুৎল্লেখার মত একটা ছবি ভেসে উঠল চোখে। যাদব প্রধানেরা কেউই তো যুদ্ধ করছে না। তাহলে, তাঁরা বন্দী হলো কেমন করে? যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সময় কি বন্দী হলেন তাঁরা? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? নগরতো অরক্ষিত ছিল না। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই দৃঢ়। রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্ত শাল্ব সেই অসম্ভব কাজ কি সম্ভব করে তুলল? সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে হেঁয়ালি মনে হল। তবু রহস্যের কিনারা করতে পারলেন না।

হঠাৎ বিকট শব্দ করে শাল্বের সৌভীযান আকাশপথে চক্র দিতে লাগল। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ খোলা প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। উর্ধ্বাকাশে চক্রাকারে পরিক্রমণ করছিল শাল্ব। এমন সময় হঠাৎ বসুদেবের মত একটি মানুষকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রে পড়তে দেখল। অমনি সমুদ্রগ্রাস করল তাকে। চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে গেল মানুষটি। এই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণের অন্তর হাহাকার করে উঠল। সজল চোখে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে বসুদেবের মানুষী শরীরটা ভেসে উঠল দেখে কৃষ্ণ অবাক হলেন। দূর থেকে সেটি মানুষের অবয়ব বলে প্রত্যয় হল না। অচেতন কোন জড় বস্তু বলেই প্রতিভাত হল। অমনি কৃষ্ণের সব ভ্রান্তি দূর হল। পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল হল শাল্বের মায়াবী ছলনা। কৌশলে তাঁকে বিভ্রান্ত করার জন্য বসুদেবাকৃতি একটি কাঠের পুতুল সে নিক্ষেপ করেছিল সাগর সলিলে। প্রতারণা করা ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু কেন? শাল্বও কি তাঁর মত যুদ্ধ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে? তাঁকে যুদ্ধে নিবৃত্তি করার কৌশল গ্রহণ করছে কি শাল্ব? শাল্ব ভেবেছে কি যুদ্ধ সংবরণ করলে কৃষ্ণ তার সঙ্গে সন্ধি করবে? হাসি পেল কৃষ্ণের। জরাসন্ধীয়দের সাথে আপোষ কিংবা সন্ধি কোনটাই কাম্য নয় তাঁর। তিনি চান সম্পূর্ণ জয়।

মিথ্যা ছলনায় বিভ্রান্ত করার জন্য শাল্ব, কৃষ্ণের খুব নিকটে এসে পড়েছিল। কৃষ্ণ বিহ্বল হওয়ার পরিবর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিল মাত্র সময় অপচয় না করে শস্ত্রসীমার মধ্যে থাকতে থাকতে কৃষ্ণ শাল্বের সৌভী যান লক্ষ্য করে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন।

মুহূর্তে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। বিরাট শব্দ করে সন্ধ্যার আকাশ আলো করে শাল্বের বৃহৎ সৌভীযানটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আর, শাল্বের রক্তমাখা কবন্ধ দেহটি পাক খেতে খেতে সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়ল। অমনি হিংস্র শার্দুলের মত বিরাট ঢেউ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল কৃষ্ণের। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন—নিয়তি! নইলে, যে জয় ছিল দুর্লভ এবং অনায়ত্ত, তা এত আকস্মিক এবং দ্রুত কেন হবে?

কৃষ্ণ আবার মনে মনে বললেন: নিয়তি! নিয়তির হাতেই শেষ হল জরাসন্ধের আরো এক অনুরাগী বান্ধব।

প্রসন্ন মধুর হাসিতে রঞ্জিত হল ওষ্ঠাধর।

দশম অধ্যায়

শাল্বের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন যুদ্ধে ব্যস্ত তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নবনির্মিত সভাগৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কুলাগ্রজ হিসাবে সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিরূপে বিদুর গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। বিদুরের আকস্মিক আগমন যুধিষ্ঠিরের মনে অসংখ্য প্রশ্ন উদ্রেক করল। সংশয় আর দুর্ভাবনায় তাঁর

চিত্ত অস্থির হল। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে কিন্তু যুধিষ্ঠির পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে বিদুরকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাবলেশহীন মুখে নির্বিকারভাবে বিদুর যুধিষ্ঠিরের কুশল প্রশ্নের জবাবাদি প্রদান করে বললেন ঃ বৎস যুধিষ্ঠির! মহামান্য ধৃতরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি হয়েই আমি হস্তিনাপুর থেকে আসছি। অন্ধরাজা ইন্দ্রপ্রস্থ তুল্য এক সভাগৃহ নির্মাণ করেছেন। সভাগৃহ প্রবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন তোমাকে করতে হবে। সেজন্য ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে এবং অন্যান্য ভাই ও পরিজনদের হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা নতুন সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে উৎসবের আমোদ-প্রমোদে অংশ গ্রহণ কর। এবং দ্যূতক্রীড়ার মত্ততাজনিত সুখ ও আনন্দ উপভোগ কর।

বিদুরের বার্তা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক নিমন্ত্রণের হেতু এবং অদ্ভুত প্রস্তাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেন না। এক অজ্ঞাত অমঙ্গল আশংকায় তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হল। জতুগৃহের ছলনার ভয়াবহ স্মৃতির অভিজ্ঞতা এখনও মন থেকে তাঁর মুছে যায় নি। নতুন সভাগৃহের প্রবেশের অনুষ্ঠান অনুরূপ কোন ছলনা নয় তো? দুর্যোধন কি নতুন কোন চক্রান্তে লিপ্ত হল আবার? কিন্তু সেটা কি হতে পারে? দ্যূতক্রীড়া? গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠানে যোগদানের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ার সম্বন্ধ কি? দ্যূতক্রীড়ার মত্ততাজনিত সুখ ও আনন্দ উপভোগের গূঢ়ার্থ বলতে বিদুর কি বোঝাতে চাইলেন? নিমন্ত্রণ শুধু দ্যূতক্রীড়ার জন্য কি? দ্যূতক্রীড়ায় কারো কখনও ভাল হয় না। এ হল পাপ ক্রীড়া। শাঠ্যে পরিপূর্ণ। এ ক্রীড়ায় ক্ষত্রোচিত কোন পরাক্রম নেই। শুধু কলহ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। একটি শুভ মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে এই পাপ ক্রীড়ানুষ্ঠানকে যুক্ত করা দুর্যোধনের উচিত হয়নি। তবু এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের কথা চিন্তা করে যুধিষ্ঠির বিমর্ষ হলেন। অজ্ঞাত অমঙ্গল আশংকায় তাঁর অঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হল।

যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখে বিদুরও কষ্ট পাচ্ছিল। যুধিষ্ঠিরের অন্তরের বাধাটা কি এবং কোথায়-বিদুর তা ভালই জানেন। ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষে দুরূহ ছিল। পিতৃব্যের ইচ্ছাকে সম্মান এবং সমাদর করা যুধিষ্ঠির কর্ত্তব্য মনে করল। কিন্তু এ অবস্থায় রাজা যুধিষ্ঠিরের করণীয় কি, ভেবে পেলেন না তিনি। কর্ত্তব্য স্থির করা তাঁর পক্ষে কঠিন হল। চেষ্টা করেও দ্বিধাগ্রস্থ মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। বিবেক ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির মধ্যে সংঘাত প্রবল হল।

পাণ্ডবদের খলবুদ্ধি নেই বলে বিদুরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল তারা। তাই তাদের হিত সাধনের সর্বদা চেষ্টা করেন তিনি। এককালে তাঁর সতর্কতার ফলেই বারণাবতে অগ্নিদগ্ধ থেকে তারা পরিত্রাণ পেয়েছিল। আজ সেই যুধিষ্ঠিরকে পুনর্বার বিপদা-শংকায় কাতর হতে দেখে বিদুর বললেন ঃ বৎস, তুমি বিদ্বান। যা ভাল মনে হয়

তাই করবে। নিজের ইচ্ছার-বিরুদ্ধে কখনো কাজ কর না। তাতে অমঙ্গল হয়। মন অনেক ঘটনার পরিণাম আগে থেকে বুঝতে পারে।

যুধিষ্ঠিরের ললাটে চিন্তার বলিরেখাগুলি স্পষ্ট ও গভীর হল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। বিহ্বল অবস্থার মধ্যে তাঁর কাটল অনেকক্ষণ। এই সময়ের মধ্যে কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না তাঁর। বিদুরের সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণের পর ধীরে ধীরে মুখ তুললেন যুধিষ্ঠির। গম্ভীর বিষণ্ণ তাঁর মুখ। আস্তে আস্তে বললেন: ক্ষত্তা, প্রসন্ন চিত্তে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার বিপদ আছে অনেক। কর্তব্যের অনুরোধ কি করলে ভালো হয় কিছুই ভাবতে পারছি না। আমাকে একটু সময় দিন আপনি।

হৃষ্টমনে বিদুর বললেন: সেই ভাল। যিনি তোমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যার বুদ্ধি ও নির্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হও না, সেই কৃষ্ণের সঙ্গে আগে পরামর্শ কর।

যুধিষ্ঠির যেন অকূলে কূল পেলেন। সত্যি তো! এতক্ষণ কৃষ্ণের কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। বিদুর মনে করে দিয়ে পরম উপকার করলেন তাঁকে। এক-মুহূর্তে সব দুর্ভাবনা দূর হল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন: সেই ভাল। কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবে। আপনি এখন বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

সেইদিনই দ্বারকায় দূত পাঠানো হল। একবার নয় বেশ কয়েকবার। কিন্তু প্রতিবার নিরাশ হয়ে ফিরল দূত। কৃষ্ণের সাথে কারো দেখা হল না। যুধিষ্ঠির দুর্ভাবনায় পড়লেন। মনে হল, নিজের সৃষ্ট উর্ণতন্তুতে তিনি নিজেকে বড় বেশী করে জড়াচ্ছেন। বড় বেশী ভাবছেন। আদৌ এত ভাবনার কিছু আছে বলে মনে হল না তাঁর। এখন সম্রাট তিনি। বিপদাশংকা করা তাঁর নির্বুদ্ধিতা। তিনি ক্ষত্রিয়। বিপদ বাধা জয় করে এগিয়ে চলাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ক্ষত্রিয় জানে শুধু জয় ধর্ম।

অতঃপর ভ্রাতাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ডেকেছেন। অনেক প্রত্যাশা করে আছেন। এ অবস্থায় তাঁকে নিরাশ করা অধর্ম হবে। ক্ষত্রিয় হয়ে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান প্রত্যাখ্যান করাও অন্যায়। রণে নিরাশ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। সকল আহ্বানকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করাই ক্ষত্রিয়-রীতি। যুধিষ্ঠির এই মুহূর্তে ষোল আনা ক্ষত্রিয় হয়ে উঠলেন। ক্ষত্রিয়ের গৌরব তাঁকে অনিবার্য বেগে হস্তিনাপুরের দিকে আকর্ষণ। করতে লাগল। সর্বনাশ আসন্ন হলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। ভালমন্দ বোঝার মত শক্তিও হারিয়ে ফেলে। যুধিষ্ঠিরেরও তাই হল। ধৃতরাষ্ট্রের মন্দ অভিপ্রায় বুঝেও হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন তিনি।

এত উন্মত্তবৎ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরে যেতে এর আগে কখনও দেখেনি নকুল। তাঁর অস্বাভাবিক আচরণ তাকে ব্যাকুল করল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জ্যোতিষ গণনা করল। ফলাফল দেখে চমকে উঠল নকুল। জ্যেষ্ঠকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা বৃথা। মনে মনে বলল: সবই নিয়তি! দুর্ভাগ্য তাদের কালবৈশাখীর মেঘের মত তাড়া করে আসছে। এ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা নেই কারো।

তারপরের ঘটনা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত। কপট ক্রীড়ায় শকুনি একের পর এক পণে জিততে লাগল। আর কৌরবেরা মহোল্লাসে ফেটে পড়ল। যুধিষ্ঠির একের পর এক, সব হারাল। সম্পদ ঐশ্বর্য কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সবশেষে যুধিষ্ঠির পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখলেন।

সে পণে শকুনী যখন জিতল তখন কৌরবেরা সকলে মিলে কুলবধূ দ্রৌপদীকে অপহৃতা, লুণ্ঠিতা, বন্দিনী নারীর মত নিয়ে এল সভাকক্ষে। তাকে দেখে স্বয়ম্বর সভায় পরাজিত নৃপবর্গের অন্তরে, দ্বেষ, ক্ষোভ ও অপমানের জ্বালা দুঃসহ হয়ে উঠল। পুরোন প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্বার ইচ্ছা তাদের অমানুষ করে তুলল। কদর্য অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গী করে তারা অন্তরের সুপ্ত লালসা ও অতৃপ্ত ভোগাকাংখা সভামধ্যে নিলজ্জের মত প্রকাশ করতে লাগল। শালীনতা, শিষ্টাচার জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্যোধন ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীকে নির্লজ্জের মত আপন উরুদেশে উপবেশনের জন্য আহ্বান করল। দুঃশাসন পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করে তার শ্লীলতাহানি করতে উদ্যত হল। কিন্তু কেউ তার কাজে বাধা দিল না। প্রতিবাদও করল না। পিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, পঞ্চপাণ্ডব সবাই উপস্থিত। তবু সকলে নীরব। দ্রৌপদীর আকুল প্রার্থনায় কারও হৃদয় বিগলিত হল না। রক্ষার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। তাদের সম্মুখে দুবৃত্তেরা হা-হা করে অট্টহাস্য করছিল। তথাপি কারো চিত্তে করুণা জাগ্রত হল না। নির্বাক বিস্ময়ে তারা কুলবধূর লাঞ্ছনার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

নিরুপায় অসহায় দ্রৌপদী তখন তার দুর্বলতা পরিহার করে সমস্ত তেজ ও ব্যক্তিত্বকে আপনার মধ্যে সংহত করে নিয়ে ঋজু ও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল। খাপখোলা তরবারির মত মনে হতে লাগল তাকে। অনমনীয় ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে ও দীপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল। দৃষ্টি হল ধারাল। চোখে তার আগুন। অধরে গ্রীবায় তার কঠিন কঠোরতা। রুদ্রাণীর মত ভয়ংকর দেখতে লাগল দ্রৌপদীকে। তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে অনেকের সংকোচ হল। কেউ কেউ ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করল।

দুঃশাসনকে নিবৃত করার কোন চেষ্টা করেনি যাজ্ঞসেনী। ভ্রুকুটি ভরা তার দু'চোখ আগুনের মত জ্বলছিল। তাই দেখে দুঃশাসনের বক্ষ রক্তও হিম হল। হাত থেকে বস্ত্র স্খলিত হল। দুঃশাসনের চোখে চোখ রেখে তাকে মর্মভেদী বাক্যবাণে বিদ্ধ করল। কম্পিত কণ্ঠে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে দুঃশাসনকে বলল: স্তব্ধ হও দুষ্ট দুঃশাসন। অঙ্গ স্পর্শ কর না আমার। আমি নারী। লজ্জা আমার ভূষণ। পুরুষই নারীর লজ্জা। আবার সেই পুরুষই নারীর লজ্জা হরণকারী। পুরুষের প্রেমে নারীর লজ্জা হয় পূজার ফুল। কিন্তু এখানে পুরুষ নেই, আছে কয়েকটি ক্লীব, আর নরপশু। এ তো সভা নয়, এ অরণ্য। এখানে নরপশুরা কামার্ত বাসনা নিয়ে লোলুপ দৃষ্টি মেলে আমার এই মানুষী দেহটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। হরিণের মাংস হরিণের বৈরী। আমার এই নারী দেহটা তেমনি পরম শত্রু আমার। একে দেখার প্রবল লোভ পিতৃস্থানীয় ও ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও লোভাতুর করে তুলেছে। তাই দুঃশাসনের নিলজ্জ বর্বর আচরণের কেউ

প্রতিবাদ করছে না। ঠিক আছে, এজন্য দস্যুতার আর দরকার নেই, নিজের হাতেই উন্মুক্ত করছি আমার দেহবাস। দ্যাখ নরাধমেরা—বলে দ্রৌপদী নিজের বস্ত্র উন্মোচনে উদ্যত হল।

দ্রৌপদীর বিরক্তিসঞ্জাত শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কঠিন ভ্রূভঙ্গী, রোষকষায়িত দৃষ্টি, এবং মোহিনী ব্যক্তিত্ব সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে সম্মোহিত করল। তারা বাক্‌রুদ্ধ হল। কোলাহল, কলরব, অট্টহাস্য এক নিমেষে স্তব্ধ হল। লজ্জায় অধঃবদন হল সকলে। কেউ কেউ চক্ষু পর্যন্ত বন্ধ করল। দুঃশাসন, দুর্যোধনের নির্লজ্জ অসংযত কৌতূহলও লজ্জায় রক্তিম হল।

নারী নির্যাতনের ঘটনা ধৃতরাষ্ট্রকে বিচলিত ও মর্মাহত করল। ভয়ংকর অনিষ্ট আশংকায় শঙ্কিত হল তাঁর হৃদয়। তাড়াতাড়ি সঞ্জয়ের হাত ধরে সিংহাসন থেকে নেমে দ্রৌপদীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেনঃ কল্যাণী, এ নরাধমেরা জানে না কী করছে? এদের তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমাকে পণ থেকে মুক্তি দিলাম। তোমার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও মহিমা নিয়ে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাও। আজ তোমাকে যারা লাঞ্ছিত করল ঈশ্বর তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। বিধাতার অভিশাপের ফল একদিন তাদের ভোগ করতে হবেই।

ধৃতরাষ্ট্রের আচরণে দুর্যোধন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হল। দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েও তারা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য বাঞ্ছিত ধনসম্পদের ভোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। বিজয়ের সব গৌরব ধূলিসাৎ করে দিলেন ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবেরা চিরবিজয়ী হয়ে রইল। সবই অদৃষ্ট বলে দুর্যোধন বিলাপ করতে লাগল।

দুর্যোধনের বিষণ্ণতা, দুঃখ ও কাতরতা দেখে শকুনি বললঃ বৎস, দুর্যোধন! নারীর মত বিলাপ করা তোমার মত পুরুষের সাজে না। তুমি কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় যদি একবার রাজী করতে পার তাহলে পুনরায় ভিখারী হবে তারা। পাণ্ডবদের গৌরব সৌভাগ্য সম্পদে অধিকারী হবে তুমি। তখন পৃথিবীও তোমার বশীভূত হবে। যেমন করে পার পিতাকে রাজী করাও।

পুনর্বার খেলা হল। একটি মাত্র দানে মীমাংসা হয়ে গেল কুরুপাণ্ডবের ভাগ্য। কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের বিজয়লক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীকে দুর্যোধন এক নিমেষে জয় করল। পাণ্ডবেরা আবার নিঃসহায় ও গৃহহীন হল। ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসের কঠিন শাস্তি মেনে নিতে হল তাদের।

শাল্বকে বধ করে কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কয়েকদিন বিশ্রামের পর শরীর মন সুস্থ ও প্রফুল্লিত হলে প্রিয়তমা মহিষী রুক্মিণী সবিস্তারে পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করল।

এরকম অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত ঘটনা যে আদৌ ঘটতে পারে কল্পনা করেননি কৃষ্ণ। পলকহীন চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রুক্মিণীর চোখের তারায়। অনেকক্ষণ কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না। বিহ্বল অবস্থা তাঁর। এমন ভাগ্যবিপর্যয় যে বাস্তবে সত্যি হয়, অথবা আদৌ হওয়া সম্ভব, কষ্ট করেও চিন্তা করতে পারলেন না কৃষ্ণ। একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট যে রাতারাতি ভিখারী হয়ে যায় স্বচক্ষে দেখলেও প্রত্যয় হয় না। কিন্তু নিয়তির এমনি পরিহাস যে সেই অসম্ভব অদ্ভুত ঘটনা আজ বিশ্বাস করতে হল কৃষ্ণকে। বিশাল সৈন্যবাহিনী যাঁর হস্তাগত, রাজকোষ যাঁর কুবেরের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, আসমুদ্র হিমাচল যাঁর পদানত, সমগ্র ভারতের যিনি অধিপতি তাঁর কিনা আজ ভিখারীর দশা? এ এক আশ্চর্য এবং অভিনব অভিজ্ঞতা কৃষ্ণের।

পাণ্ডবদের সৌভাগ্য-সূর্য উদয়ক্ষণেই অস্ত গেল। এরূপ একটি সংশয় মনে উদয় হওয়ার জন্য বিশ্রী লাগল তাঁর। অকারণে আপনার দুর্বল মনটাকে তিরস্কার করলেন। অমঙ্গল চিন্তাটা যাতে অধিক পল্লবিত না হয় সেজন্য 'ভগবান' কথাটা একটু সংশোধন করে নিয়ে নিজের মনে বললেন: না, না—আস্তে নয়। শিশু সূর্য রাহু কবলিত হয়েছে। তাই চতুর্দিকে এমন অসময়ে আঁধার! সম্মুখে তাদের দুর্ভাগ্যের কালো রাত্রি। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাদের যাত্রা সুরু হয়েছে আর এক অনিশ্চত ভবিষ্যতের জন্য। রাত্রির তপস্যার শেষে নতুন করে কি আবার দিনের যাত্রা আরম্ভ হবে? নিজেকে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণ। সূর্যোদয় হবে আবার?

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির আর রাজা নেই। রাজ্য, সিংহাসন, রাজ-মর্যাদা, গৌরব, ঐশ্বর্য ও সম্পদ সবই দুর্যোধনের। পাণ্ডবদের কোন দাবি নেই তাতে। ভাবতে কৃষ্ণের বুক ভেঙে গেল। অথচ এই ইন্দ্রপ্রস্থ জয়ের জন্য দুর্যোধনকে কোন অভিযান করতে হয়নি। পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করার প্রয়োজন হয়নি। কোনরকম সংঘর্ষ কিংবা রক্তপাত পর্যন্ত হল না সেজন্য। ঘরে বসেই তারা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। রাজাকে উচ্ছেদ করার জন্য হত্যা বা বন্দী কিছুই করতে হয়নি। স্বেচ্ছায় রাজা তার রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য, মর্যাদা ও গৌরব বিজয়ী রাজা দুর্যোধনের হস্তে নির্দ্বিধায় সমর্পণ করে বনবাসী হল। যুদ্ধে যাদের পরাস্ত করা যায় না, কৌশলে তারা সর্বস্বান্ত হল। সাফল্যের এত বড় পুরস্কার কৃষ্ণের নিজের ভাগ্যে মেলেনি কখনো। সুবলনন্দন শকুনি তাঁর অনুসৃত যুদ্ধনীতি অনুসরণ করেই কৃষ্ণপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত করার গর্ব ও অহঙ্কারে মত্ত। কিন্তু

মূর্খ জানে না কৃষ্ণ ক্ষত্রগৌরব বিসর্জন দিয়ে কখনো শত্রুকে শাঠ্যের দ্বারা লাঞ্ছিত বা প্রতারিত করে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে জয়-পরাজয় মীমাংসার যুদ্ধনীতি শকুনির হাতে ক্ষত্রগৌরব হারাল। কপট বুদ্ধিতে শকুনির জুড়ি নেই। নিয়ম নীতি মেনে কাজ করে না সে। ছলেবলে কলেকৌশলে যে ভাবেই হোক, শত্রুকে দমন করা তার নীতি।

কৃষ্ণের চিন্তায় বাধা পড়ল। তাহলে কি যুদ্ধনীতি ও রাজনীতি থেকে 'নীতি' শব্দটা ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে? শাল্ব যুদ্ধের নিয়ম পালন করল না। শকুনি দুর্যোধনও সাধারণ নীতিবোধ বিসর্জন দিল। রাজনীতির শিষ্টাচার পর্যন্ত মানল না তারা। রাজনীতির সঙ্গে জঙ্গলের নীতির তফাৎটা কোথায়? খুঁজে পেলেন না কৃষ্ণ। এ এক কুৎসিত লড়াই নীতি। এক হিংস্র জঙ্গল জীবন। অথচ, এমনটা তিনি চাননি কখনও। রাজনীতির উত্তেজনা ভাল লাগে কৃষ্ণের। এ তাঁর নেশা। কিন্তু তিনি যে রাজনীতি করেন তার একটা নীতি ও আদর্শ আছে। শত্রুর প্রতি একটা মমতা ও ব্যথা আছে। একটা নিবিড় অনুভূতি আছে তার মধ্যে। মানুষের কল্যাণের জন্য বিপদসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা দুরন্ত সাহস আছে তাঁর। কিন্তু এদের রাজ-নীতিতে সে সততা, ত্যাগ আদর্শ কোথায়? রাজনীতির এই ভয়ংকর রূপ তারা আমদানী করল কোথা হতে? কৃষ্ণের মনে হল, এ তো রাজনীতি নয়। আত্মসংহার! কৃষ্ণ তার ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হলেন। এই আসুরিক শক্তি বিনাশের জন্য যেসব তামসিক অস্ত্র প্রয়োগ করে জয় সুনিশ্চিত করতে হবে, তার দ্বারা জগতের সামগ্রিক কোন কল্যাণ আসবে বলে মনে হল না তাঁর। বরং মানুষের সমাজ ও সভ্যতার সংকট কেবল বৃদ্ধি পাবে।

অস্বস্তির সীমা নেই কৃষ্ণের মনে। বাইরে নিশ্চল স্থৈর্যের মধ্যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অস্থিরতা। আপনার অশান্ত চিত্তক্ষোভ সংযত করা কঠিন হল তাঁর।

সরলমতি পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুর্যোধনের কুৎসিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই দায়ী। এজন্য তাদের দোষী বলে ভাবা যায় না; শঠতার পরিবর্তে শঠতা করার শিক্ষা তাদের নেই। মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে প্রতিরোধের অভ্যাস বা কৌশলও তাদের আয়ত্ত নয়। তাই মিথ্যা ছলনায় বিভ্রান্ত হল তারা। একে তাদের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানকালে দুর্যোধনের প্রবল দুঃখ, ক্ষোভ, লাঞ্ছনা অপমানের গ্লানি ও বেদনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল কৃষ্ণের। পাণ্ডবদের কল্পনাতীত সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য ও ধনরত্ন তার অন্তরে মাৎসর্যাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল। উৎসবের আনন্দ, সমারোহ, উত্তেজনা, উল্লাস কিছুই তৃপ্তি দেয়নি তাঁকে। এক দুর্বিসহ হৃদয় জ্বালায় তার চোখ ও মুখ টনটন করছিল। তবু, সৌজন্যবোধে মুখ বুজে সে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল তাকে। দৈব দুর্বিপাকে সে বিড়ম্বনা যে লাঞ্ছনায় পরিণত হবে কল্পনাও করেনি কেউ।

শকুনির সঙ্গে দুর্যোধন পাণ্ডব-সভার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য দর্শন করছিল। স্ফটিকময় গৃহাঙ্গনে সরোবর ভ্রমে সে পরিধেয় বস্ত্র একটু উপরে তুলে নিল।

পরে ভ্রম বুঝতে পেরে ভীষণ লজ্জায় পড়ল। আর এক স্থানে ছিল পদ্মশোভিত সরোবর। স্ফটিক নির্মিত সমতল ভূমি বিবেচনা করে তার উপর দিয়ে চলার সময় জলমগ্ন হল। ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব তাদের কাণ্ড দেখে হাসি সংবরণ করতে পারেনি। কিন্তু দুর্যোধনের মনে হল পাণ্ডাবেরা তাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে। তাদের নির্মল উপভোগের আনন্দকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাস ও কৌতুক বলে মনে করল। নিজেকে তার ভীষণ অপমানিত মনে হল। এবং অন্তঃকরণ নির্মম চিত্তজ্বালা অনুভব করে কাতর হল। কৃষ্ণ সেই দিনই বুঝেছিলেন যে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ে পরস্পরের চিরশত্রু হয়ে রইল। দুর্যোধনের চিত্তজ্বালা সহজে নির্বাপিত হওয়ার নয়। "ঈর্ষাসিন্ধু মন্থনসঞ্জাত" বিষ পান করে দুর্যোধন প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বিদায় নিল। কিন্তু তার বিষ নিঃশ্বাসে ইন্দ্রপ্রস্থের সুখ ও শান্তি যে একদিন বিষিয়ে উঠবে, এবং অনেক মূল্য দিয়ে পাণ্ডবদের কৌতুক হাস্যের দাম পরিশোধ করতে হবে,—এসব কৃষ্ণ আগে থাকতেই জানতেন।

কিন্তু এত শীঘ্র যে দুর্যোধন ঈর্ষা, বিদ্বেষ ঘৃণার হলাহল সুবর্ণ পাত্র ভরে পাণ্ডবদের মুখে অমৃতের মতো তুলে ধরবে, ভাবতে পারেননি কৃষ্ণ। দুর্যোধনের আচরণে ও বাক্যে প্রকাশ পায়নি তার কপট অভিপ্রায়। এমনকি চরেরাও সে খবর দেয়নি তাঁকে। অবশ্য তাঁরও সময় হয়নি অনুসন্ধানের। শাল্বের বর্বতাব প্রতিশোধ গ্রহণ করতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে অন্যদিকে মন দেওয়ার অবসর ছিল না তাঁর। আর দুর্যোধন সেই সুযোগ নিয়ে পাণ্ডবদের উপর তার আক্রোশ চরিতার্থ করেছে। কিন্তু এ শুধু তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নয়। আরো কিছু। সেই কিছুর রহস্যে পৌঁছতে না পারলে মূল সমস্যার জট খুলবে না। কিন্তু কি সে স্বার্থ? চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের যে স্বপ্ন ছিল তাঁর, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সমর্থকেরা তাকে সুনজরে দেখেনি। জরাসন্ধের উদ্যোগে যে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর শক্তি শিবির স্থাপিত হয়েছিল তার স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন ছিল তাদের কাছে প্রধান। সুরু থেকেই সে মহৎ অভিপ্রায় যাতে কার্যে পরিণত না হয় মনে মনে তার ষড়যন্ত্র করছিল তারা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে শিশুপাল এবং অনুগত রাজন্যদের প্রকাশ্য বিদ্রোহে তা প্রকাশ পেল। ভারতের রাজনীতিতে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারের আশঙ্কা করেই অসন্তুষ্ট দুর্যোধন নিশ্চয়ই শাল্বের সঙ্গে কোন গোপন চুক্তি করেছিল। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে তারা যুগ্মভাবে দুই বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর অন্যতম যাদব ও পাণ্ডবদের সমূলে বিনাশ করার জন্য একই সময়ে দু' উপায়ে তাদের উপর আক্রমণ করল। যাতে কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। শাল্বের দ্বারকা আক্রমণ এবং দুর্যোধনের দ্যূতক্রীড়ায় কপট নিমন্ত্রণের ঘটনাকে কৃষ্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারলেন না। দুয়ের মধ্যে পরিকল্পনাগত এক আশ্চর্য মিল আছে বলেই মনে হল তাঁর। কেবল শত্রুবিশেষে ভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। একজনের জন্য বাহুবল অন্যজনের জন্য কপট ছলনা। পাত্র ভেদে তার ফলও হল বিপরীত। শাল্ব যা পারল না, দুর্যোধন তাতে সহজে সফল হল।

পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্যের কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাসকালে দুর্যোধন এবং তার মাতুল পাণ্ডবদের দুর্বলতার রন্ধ্রগুলি অন্বেষণের সুযোগ পেয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ায় আসক্তি শকুনির অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তিনি যে একজন নিপুণ অক্ষবিদ্ নন, ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালে শকুনি তা পরিজ্ঞাত হয়েছিল। তথাপি, অক্ষক্রীড়ার প্রতি যুধিষ্ঠিরের একটা সহজাত দুর্বলতা এবং প্রবল আসক্তি ছিল। এবং উক্ত ক্রীড়ায় যদি কেউ তাঁকে আহ্বান করে তাহলে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন না। সানন্দে গ্রহণ করেন তাঁকে। যুধিষ্ঠিরের এই দুর্বলতা জেনেই শকুনি তাঁকে দ্যূতক্রীড়ায় প্রলুব্ধ করেছিল।

চতুর ও ধূর্ত গান্ধার রাজকুমার আরও বুঝেছিল যে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। কৃষ্ণই তাদের একমাত্র শক্তি ও আশ্রয়। সর্বকর্মে কৃষ্ণ অপরিহার্য। কৃষ্ণ ব্যতিরেক তারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। কৃষ্ণের সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়া কোন কার্য করে না। কৃষ্ণের উপস্থিতিতে তাদের পরাজিত করা এবং তাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী হরণ করা কৌরবের অসাধ্য। তাই, কৃষ্ণের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা শকুনি যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। কিন্তু দুর্যোধন ও শকুনির এই চক্রান্তকে কৃষ্ণ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। দুষ্ট অভিসন্ধি বলেই ভাবলেন তাঁকে।

প্রকৃতপক্ষে কৌরবদের এ ষড়যন্ত্র তো তাঁর বিরুদ্ধে। কৃষ্ণের বিরোধিতা করার জন্যই কৃষ্ণ অনুগত পাণ্ডবদের উপর তারা অধর্মাচরণ করেছে। মিত্র পাণ্ডবদের বিরুদ্ধাচরণ করা মানে তাঁর বিরোধিতা করা। তাদের শত্রুতার জন্যই জোটহীন নিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘ গঠনের যে মহৎ পরিকল্পনা করেছিলেন কৃষ্ণ, দুর্যোধনের চক্রান্তে তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। আশাভঙ্গের রাগে উত্তেজিত হল কৃষ্ণ। অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন যে, তাঁর ও পাণ্ডবদের স্বার্থের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পাণ্ডবেরা তাঁর কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত। বিচ্ছিন্ন এবং ঐক্যহীন ভারত রাষ্ট্রগুলি ঐক্য সম্পন্ন করার জন্য পাণ্ডবদের সাহায্য নিয়েছেন তিনি। শান্তি, মৈত্রী ও ঐক্য চিরস্থায়ী করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে সকল নরপতির অধিপতি করেছেন। সুতরাং, সে স্বার্থ কারো দ্বারা যদি বিপন্ন কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে তাঁর শত্রুপদবাচ্য হবে। পাণ্ডবদের শত্রু তাঁরও শত্রু। সুতরাং দুর্যোধনকে এখন থেকে শত্রু বলে গণ্য করতে তাঁর আর কোন বাধা রইল না। পাণ্ডবদের চির শত্রুকে যে কোন উপায়ে বধ করা হল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

দুর্জনের বিনাশ, সাধুজনের ত্রাণ এবং ধর্মের সংস্থাপন তাঁর জীবন নীতি। দুর্যোধন লোভী, বর্বর, কপট, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ভ্রাতৃদ্রোহী' অধর্মাচারী, নীতিহীন, সদাচার ভ্রষ্ট। ক্ষমার অযোগ্য। তার স্পর্ধা সহ্যের সীমা লংঘন করল। 'ঈর্ষাসিন্ধুমন্থন সঞ্জাত' বিষ পান করে সে এক দানবে পরিণত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্যদের মত সেও একই পরিণতি লাভ করবে।

পাণ্ডুপুত্রদের পরাজয়ের গ্লানি কৃষ্ণের হৃদয় আচ্ছন্ন করল। বারংবার মনে হতে লাগল এ পরাজয় যেন তাঁর নিজের। আসল লক্ষ্য তিনি। তাঁকে হেয় করার চক্রান্ত।

সুতরাং এর মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে। প্রতশোধস্পৃহা ভয়ংকর হয়ে উঠল তাঁর মনে। দুর্যোধনের রাজ্য আক্রমণ করে চিত্তজ্বালা নিবৃত্তির চিন্তাও মনে উদয় হল। সেরকম একটা সংকল্প নিয়েই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সন্নিধানে বহির্গত হচ্ছেন শুনে, ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক সাত্বৎ বংশীয় এবং পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টকেতু এবং অন্যান্য মিত্রবর্গ তাঁর সঙ্গে যাত্রা করল।

দুস্তর পথ অতিক্রম করে কৃষ্ণ সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী কাম্যক বনে উপস্থিত হলেন। গহন অরণ্যে হিংস্র পশুর গর্জন ও হুংকার শুনে রথ থামালেন। অদূরে নির্ঝরিণীর নির্মল শুভ্র সলিলধারা কুলু কুলু রবে বয়ে যেতে দেখলেন। গাছে গাছে পাখীরা মধুর স্বরে কূজন করছিল। ময়ূর-ময়ূরী পেখম তুলে নৃত্য করছিল। হরিণেরা ভীরু চোখ তুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নবাগতদের দেখতে লাগল। বৃক্ষান্তরালের ফাঁক দিয়ে দূরে মুনিদের তপোবনের কুটীরগুলি ছবির মত দেখা যেতে লাগল। অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে এবার সেদিকে রথ চালনা করলেন কৃষ্ণ।

দূরে থেকে কৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথের চূড়া দেখতে পেয়ে পঞ্চপাণ্ডব ছুটতে ছুটতে এল অভ্যর্থনা করতে। কৃষ্ণের সাথে অন্যান্য আত্মীয়বর্গ ও বান্ধবদের দেখে পুলকিত হল তারা। কিন্তু সেই উল্লাস প্রকাশ করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না তাদের। দুঃখ, অভিমান এবং লজ্জায় তারা আবেগরুদ্ধ হল।

পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা একে একে অপরাপর আত্মীয় ও অতিথিদের নিবিড় বাহুপাশে আবদ্ধ করলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। হাত ধরে তাদের পর্ণকুটীরে নিয়ে গেলেন। কুশাসন পেতে বসতে দিলেন সকলকে। এবং পঞ্চভ্রাতা তাঁদের বেষ্টন করে মাটিতে উপবেশন করল।

যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতাদের অপরিসীম দৈন্য, ক্লেশ, দুর্দশা এবং নিঃস্ব রিক্ত শ্রীহীন রূপ দেখে বাক্‌রোধ হল কৃষ্ণের। দুচোখ দিয়ে তাঁর জলধারা গড়িয়ে পড়ল। সহসা বাঙ্‌নিষ্পত্তি হল না। মৌন হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

লজ্জায় যুধিষ্ঠির মস্তক উত্তোলন করতে পারলেন না। স্বীয় মূঢ়তার অপরাধে অপরাধী হয়েই যেন অধোবদন হয়ে রইলেন। ভীম যেন কি একটা বলার জন্য মুখ তুলল। কিন্তু আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হল তার। অর্জুনের দীপ্তিহীন চোখ যেন কৃষ্ণের মার্জনা ভিক্ষা করছিল।

কিছুক্ষণ ধরে গহন অরণ্যের নিস্তব্ধতা নেমে এল সেখানে।

অবিশ্বাস্য, অচিন্তনীয় এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক সকলে। কারোও মুখে কথা নাই। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রের পলক পড়ে না কারোও। সকলেই কেমন উদাস, বিহ্বল, চিন্তাকুল। এরকম অকল্পনীয় দৃশ্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না কারোও।

ক্রোধে কৃষ্ণের সর্বশরীর কম্পিত হতে লাগল। কৌরবদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভ্রূকুঞ্চিত হল। বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় কঠিন হল তাঁর মুখমণ্ডল। নয়নকোন থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল বিদ্যুতাগ্নি। ভ্রূকুটি ভয়ংকর করাল দৃষ্টি যেন বিশ্বচরাচরকে এখনই দগ্ধ করে ফেলবে। কৃষ্ণের মূর্তি দেখে ভয় পেলেন যুধিষ্ঠির।

কৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে তপোবনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। বললেন, শোন কৌন্তেয়গণ, এত বড় অন্যায় ও পাপ সহ্য করবে না ধরণী। শীঘ্রই দুরাত্মা, দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি, আর দুঃশাসনের রক্তে ধরণী সিক্ত হবে। তাদের শোণিতশ্রাবে মেদিনী প্লাবিত না হওয়া অবধি আমার কোনো শান্তি, স্বস্তি নেই। পাপাত্মাদের ধ্বংস করে, তাদের দলবলকে সমূলে বিনাশ করে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর নিজ রাজ্যে আবার প্রতিষ্ঠিত করব এই আমার প্রতিজ্ঞা।

অমনি কৃষ্ণের মুখভঙ্গী বদলে গেল। কণ্ঠস্বর হল আরও গম্ভীর। পঞ্চপাণ্ডবের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে কৃষ্ণ পুনরায় বলল ঃ চল, আমরা এখনই কৌরবদের সমূলে বিনাশ করি।

কৌরবের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের যুদ্ধ ঘোষণায় যুধিষ্ঠির চমকে উঠল। তাঁর কৃতান্ত সদৃশ মূর্তি দেখে অর্জুনের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। ভীম উল্লসিত হল। অন্যান্যেরা হল স্তম্ভিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

তখন অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে বলল ঃ কেশব, সংবরণ কর ক্রোধ তোমার। পাণ্ডবের বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙখী হয়ে ঘটিয়ো না মহাসর্বনাশ। এখনি যুদ্ধ হলে পাণ্ডবের অপযশ হবে। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুদ্ধযাত্রা করলে সত্যভ্রষ্ট হবে তারা। তুমি সহায় তাদের। তুমিই পরিত্রাতা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপে কলঙ্কিত কর না তোমার মিত্রদের। তাহলে মিথ্যাবাদী হবে তারা। তোমারও অপযশ রটবে দেশে দেশে। কৃষ্ণপ্রাণ হয়ে তোমার অগৌরব কেমন করে সইব ? তার চেয়ে এই দুঃসহ কষ্ট অনেক শান্তির। মুহূর্তের উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে এনো না বিপদ ডেকে। ধর্মই পাণ্ডবের সম্পদ। চরম দুর্ভাগ্যের দিনে যদি ত্যাগ করি ধর্মকে, তাহলে পাণ্ডবেরা আর কোন্ গুণে বরণীয় হবে ? তুমি যাদের সখা, ধর্মের সাথে তারা বিবাদ বাঁধতে কি পারে ?

অর্জুনের কথায় অভিভূত হলেন কৃষ্ণ। তার মন ভোলানো আবেদন এত হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম যে কৃষ্ণের ক্রোধ ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে এল। মধুর কণ্ঠে বলল ঃ পার্থ তুমি যা বললে, তার উত্তর আমার জানা নেই। সত্যি তোমাদের প্রতি স্নেহ ও প্রীতিতে অন্ধ হয়ে উন্মত্তবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। হঠকারিতা থেকে তুমি বাঁচালে। তোমরা বীর, মহৎ। তোমাদের অনিষ্ট মানেই আমার অনিষ্ট। ক্রোধে ভুলে গেছিলাম। বেশ তো যতক্ষণ কাল পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে তোমাদের প্রতীক্ষা করব। তারপর—

কথাটা বলতে গিয়ে কৃষ্ণ আত্মসংবরণ করলেন। ঠোঁট কামড়ে ধরে মনোবেদনা দমনের চেষ্টা করলেন কৃষ্ণ। পুঞ্জীভূত ক্রোধ বহু কষ্টে সংবরণ করে বললেন ঃ

তারপর, তোমাদের দুঃখের শোধ নেব। দুরাত্মাদের সমূলে ধ্বংস করে আমার হৃদয় জ্বালা জুড়োব। তোমাদের সুখী না দেখা পর্যন্ত আমার চক্ষে আর নিদ্রা আসবে না।

তারপর আর কথা বলতে পারলেন না কৃষ্ণ। অনেকক্ষণ পাণ্ডবদের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটা গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ সব নিয়তি! এই দুঃখ তোমাদের অদৃষ্টলিপি। চেষ্টা করেও পারব না কিছু করতে। বিধিলিপির কাছে আমিও অসহায়।

প্রত্যুত্তরে অর্জুন বললঃ মনস্তাপ কর না সখা। কাল দ্রুতগামী। ত্রয়োদশ বর্ষ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। তারপর, আমরা আবার রাজ্য পাব। সিংহাসন পাব। ঐশ্বর্য পাব। আমাদের স্বপ্নের ইন্দ্রপ্রস্থ লাভ করব।

এতক্ষণ ধরে ভীম দর্শকের মত ঘটনার গতি পর্যবেক্ষণ করছিল। একটি কথাও সে বলেনি। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে দুর্ভাগ্যকে যখন মেনে নেওয়ার কথা উঠল তখন আর ধৈর্য ধরতে পারল না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে বললঃ অসম্ভব! তেরো বৎসর শেষ হওয়ার আগেই আয়ু শেষ হবে আমাদের। তেরো বৎসর কত দীর্ঘ!

ভীমের উক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই যুধিষ্ঠির বললঃ ধর্ম সবার উর্ধ্বে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লে আগুন যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে তেমনি, যুধিষ্ঠিরের বাক্যে ভীমের ক্রোধ ও উত্তেজনা ভয়ংকর হয়ে উঠল। হিংস্র বাঘের মত গর্জন করে ভীম বললঃ মাথায় থাকুক ধর্ম? ধর্ম এক নয়, ধর্মের রূপ বহু। যে যেভাবে গ্রহণ করে তার কাছে সেটাই ধর্ম। ধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যেকের উপলব্ধি ভিন্ন। দ্যূতসভায় পণবদ্ধ দ্রৌপদীর আকুল আর্তময় প্রশ্ন শুনেও কুরুবৃদ্ধেরা নীরব। আপনি নিজেই ছিলেন বাকাহীন, ধর্মের রক্ষাকবচে বাঁধা। মহামতি ভীষ্মও দ্রৌপদীর আকুল আর্তির আবেদনে সাড়া দিতে পারেননি। ধর্মপ্রাণ বিদুরও দ্রৌপদীর জিজ্ঞাসার কোন সদুত্তর দেননি। কেন? কারণ, ধর্মের অর্থ ও তাৎপর্য অনির্ণেয়। ধর্ম এক বহুরূপী ধারণা। তাই, ধর্মবোধেই কুরুবৃদ্ধেরা এবং স্বয়ং ধর্মরাজ নিরুত্তর ছিলেন। তাহলে বুঝুন, ধর্ম কত অনিশ্চিত, এবং সংকটকালে কত অনির্ভরযোগ্য। ধর্মই পারে অনেক বিপরীত আচরণকে সমর্থন জোগাতে।

কার্যকালে ভীম এরকম অদ্ভুত ও আশ্চর্য কথা বলতে পারে কেউ জানত না। এমনকি সে নিজেও না। তাই অবাক হল ভীষণ। নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না ভীমের। অল্পক্ষণের জন্য চুপ করে করে রইল।

ধর্ম সম্বন্ধে ভীমের বিশ্লেষণ কৃষ্ণকে চমৎকৃত করল। যুধিষ্ঠির অভিভূত হল! অর্জুন মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ভাল লাগল ভীমেরও। দ্বিগুণ উৎসাহে তখন সে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলঃ আমরা ক্ষত্রিয়। রাজ্য শাসনই আমাদের ধর্ম। বনবাস করা আমাদের লজ্জা। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলপ্রয়োগ করা, তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করা। শুধু নীতি ও ধর্ম মেনে রাজত্ব করা চলে না। ক্ষত্রিয়ের গৌরব হল শত্রু জয় করা। পাপ ও পাপীকে ধ্বংস করা। আপনি তাই

করুন। আমরা, কৃষ্ণ, রাজা দ্রুপদ এবং মিত্রগণের সঙ্গে একত্র হয়ে যদি এই মুহূর্তে যুদ্ধ করি, তবে অবশ্যই আমাদের রাজ্য ও ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার করতে পারব। কালক্ষয় না করে আপনি অনুরূপ কার্য করুন। আপনার ক্ষত্রগৌরব বৃদ্ধি পাবে।

নিস্পৃহভাবে যুধিষ্ঠির বললেনঃ শোন মধ্যম, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন সম্ভব নয়। তেরো বৎসর আমাদের প্রতীক্ষা করতেই হবে।

ভীমের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলঃ মহারাজ, আপনি ধর্ম-ধর্ম করে ক্লীবত্ব লাভ করেছেন। তাই, তেরো বছর প্রতীক্ষার কথা ভাবতে পারছেন। শাস্ত্রজ্ঞ লোকের বিচারে দুঃসহ দুঃখের কাল এক অহোরাত্রেই এক বৎসরের সমান গণ্য হয়, অতএব তেরো দিনেই আমাদেব তেরো বৎসর পূর্ণ হয়েছে, ভাবতে অসুবিধা কোথায় ?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে যন্ত্রবৎ প্রত্যুত্তর করলেন যুধিষ্ঠিরঃ বলদর্পে চঞ্চল হয়ে কর্ম করলে সুফল লাভ করা যায় না। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যুধিষ্ঠিরের উক্তি সমর্থন করে কৃষ্ণ বললেনঃ শোন মহাবাহু, ধর্মরাজ ঠিকই বলেছেন। এখন সময় অনুকুল নয়। দুর্যোধন এবং তাঁর অনুগামী রাজন্যবৃন্দ ও আশ্রয় প্রার্থীরা মহাবলশালী। তাদের কারও শক্তি উপেক্ষার নয়। দিগ্বিজয়কালে বিশাল ভারতবর্ষের অনেক রাজাই তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ। তাঁদের অনেকেই জরাসন্ধ ঘেঁষা জোটের অন্তর্গত। মনেপ্রাণে শত্রু তোমাদের। যদিও করদানে তারা বাধ্য হয়েছিল তথাপি শত্রুতা ত্যাগ করেননি। তোমাদের সৌভাগ্যে তারা ঈর্ষান্বিত। এই মুহূর্তে তোমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষ এবং প্রতিশোধ স্পৃহার সুযোগ গ্রহণ করবে তারা। দুর্যোধনও তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তোমাদের সঙ্গে নতুন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। ভারতীয় ঐক্য স্থাপনে যাদব ও পাণ্ডবদের যৌথ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে এরা কোনদিন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি! এই মুহূর্তে তাদের আত্মরক্ষানীতি গ্রহণের সুযোগ করে দিলে তোমাদের অস্তিত্ব তো বিপন্ন হবেই। ভারতীয় ঐক্যের উপরেও আঘাতটা এসে পড়বে। এই জটিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের বিপদ আছে এখন।

কৃষ্ণের কথা শুনে ভীম নিরুত্তর থাকল। ললাটে হস্ত মর্দন করতে লাগল। হতাশ হয়ে এদিক সেদিক তাকাল।

কুটীরে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়িয়েছিল দ্রৌপদী। পাণ্ডবদের দুর্দিনের বন্ধু কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করছিল সে। কৃষ্ণের সান্নিধ্য চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধ ও মনোরম। তাঁর মধুর বচন তাপিত হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণাকে জুড়িয়ে দেয়। পিপাসিতের কাছে জল যেমন অপরিহার্য তেমনি দুঃখীর জীবনেও কৃষ্ণ একান্ত নির্ভর। কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের জন্য দ্রৌপদী তাই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মনে মনে। উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে।

কৃষ্ণের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতেই ইশারায় ডাকল দ্রৌপদী। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ

করে আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। অযোনিসম্ভূতা যজ্ঞাগ্নি হতে উদ্ভূতা ভুবনমোহিনী রমণীর এ কী শ্রী হয়েছে ? নীল পদ্মের ন্যায় আয়ত অক্ষিদ্বয়ে সে দীপ্তি গেল কোথায় ? ক্লান্ত বিষণ্ণ আঁখিপল্লবে লেখা তার শতশতাব্দীর পীড়ন লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের করুণ কাহিনী। প্রস্ফুটিত নীল পারিজাতের মত অসাধারণ, অপার্থিব, দুর্লভ রূপ লাবণ্যের একি শ্রীহীন অবস্থা ! ভাবতে বিস্ময় লাগল কৃষ্ণের।

ক্ষণকালের জন্য মূক ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। তাঁর মুখে সহসা কোন কথা এল না। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দ্রৌপদীর মুখের দিকে। অনেকক্ষণ। অবাক বিস্ময়ে মনে মনে বললেন, ইনি কি সেই পাঞ্চাল রাজকন্যা, দ্রুপদ নন্দিনী দ্রৌপদী ! অদ্ভুত পরমাশ্চর্য যজ্ঞলব্ধ রত্ন !

দ্রৌপদীও স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণের দিকে। কালবৈশাখীর মেঘ ঘনিয়ে উঠল সেখানে।

বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে কৃষ্ণ শুধালেন ঃ প্রিয়সখি আমার !

অমনি নারীসুলভ অভিমানে দ্রৌপদী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অশ্রুরুদ্ধ অভিমান ছাপিয়ে উঠল কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে। সক্ষোভে বলল ঃ ও নামে ডেকো না আমায়। বড় অসহায় আমি। আমার কেউ নেই। পতি, পুত্র, বান্ধব, ভ্রাতা পিতামাতা কেউ নেই। কেউ না। তুমিও নেই কেশব !

উত্তর দিলেন না কৃষ্ণ। পিছন ফিরে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল দ্রৌপদী। কিছুক্ষণ পর আত্মসংবরণ করে ফিরে দাঁড়াল সে। কৃষ্ণের চোখে চোখ রাখল। কিন্তু তার দু'নয়নে জমা অশ্রুবিন্দু আর টলটল করছে না। চোখের কোণও শুষ্ক। আঁখিদ্বয় মরুসূর্যের মত কেবল ধক্‌ধক্ করে জ্বলছিল। ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমল। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে তার দেহবল্লরী আন্দোলিত হচ্ছিল। মনে হল, ঝড়ের দোলায় দুলছে তার শরীর। অভিমানাহত কণ্ঠে বলল ঃ ধিক্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে। ধিক্ ভীমবাহু ভীমসেনকে। ধিক্ অর্জুনের গাণ্ডীবে। স্বামী হয়ে দুর্বলা স্ত্রীকে প্রণয়বশে রক্ষা করতে পারল না তারা। হে কেশব সবই অদৃষ্ট। আমার একমাত্র বস্ত্র শোণিতস্রাবে সিক্ত। লজ্জায় কাঁপছি। তবু পাপাত্মাদের দয়া কিংবা করুণা হল না। পাষণ্ড দুঃশাসনের হাতে আমি যখন নির্যাতিত হচ্ছি, সবরকম অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করছি তখন কেউ তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল না। পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য দর্শকের মত নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসে রইলেন। দুরাচারী পাপাত্মা দুঃশাসন ও দুর্যোধনের বর্বরতার প্রতিবাদ করার মত মত পুরুষ ছিল না সেখানে। দুঃশাসন আমার বস্ত্র আকর্ষণ করে যখন বিবস্ত্র করতে গেল তখন কাতরস্বরে বারংবার কত মিনতি করলাম। তবু শরণাগত অসহায় রমণীকে রক্ষার জন্য একজন পুরুষও এগিয়ে এল না। আমার অনাবৃত দেহ দর্শনের লালসায় ক্লীবের মত বসে রইলেন তাঁরা। দুরাত্মাদের ধিক্কার দিয়ে কেউ লজ্জায় স্থান পর্যন্ত ত্যাগ করল না। লোভীর মত কামুকের মত সেই অবর্ণনীয় দৃশ্য উপভোগের জন্য তাঁরা অচল, অনড় হয়ে বসে রইলেন। তাঁরা সকলেই

আমার গুরুজন। দেবর, আত্মীয় ও বান্ধব। এরপর কৌরব বংশের বধূ বলে কি আমার আত্মশ্লাঘা করা সাজে? মহাবীর পাণ্ডবগণের ভার্যা বলে গর্ব করতেও লজ্জা হয়।

অশ্রুভেজা করুণ আঁখি মেলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর দিকে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছিল। দরদ মাখানো কণ্ঠে বললেনঃ ওগো ভগিনী, দুঃখ কর না। এ তোমার অদৃষ্টলিপি। মানুষের সাধ্য নেই প্রতিরোধ করার। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। তবে, তোমার মত পতিব্রতাকে যারা লাঞ্ছিত করেছে, যাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছ তুমি, তারা কেউ রেহাই পাবে না। তোমার এক বিন্দু অশ্রু কৌরব ভার্যাদের শত অশ্রুর কারণ হয়ে রইল। এটাই তোমার লাঞ্ছনার, আর প্রতিশোধ স্পৃহার একমাত্র সান্ত্বনা। দুঃখ করো না সখি, আবার তুমি ভারতসম্রাজ্ঞী হবে। সব কালিমা তোমার ধুয়ে যাবে। অবাক হয়ো না সুন্দরী? মিথ্যে হবে না আমার বাক্য।

দ্রৌপদীর সব ক্ষোভ, দুঃখ দূর হয়ে গেল। অনাবিল প্রশান্তি আর তৃপ্তিতে ভরে উঠল তার বুক। অনুরাগ দীপিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললঃ কিন্তু সখা, সে তো অনেক দেরী। বহুদিন ধরে প্রতীক্ষা করতে হবে। বুকে অপমান আর অনুশোচনার এই আগুন কি এতকাল বইতে পারব? ভীমবাহু ভীমসেন যে বলল, শাস্ত্রকারের অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারে বিধান দিয়ে থাকেন। প্রতি-বৎসরকে যদি একমাস হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহলে তেরো মাসকে তেরো বৎসরের প্রতীক হিসাবে গণ্য করতে অসুবিধা কোথায়? সেজন্য যদি কোন পাপ স্পর্শ করে, দান যজ্ঞাদি করে সে পাপমুক্ত হওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়।

মধুর হেসে কৃষ্ণ বললেনঃ তা হবার নয় সখি। হলে করতাম।

ভ্রূকুঞ্চিত করে সরোষে প্রশ্ন করল দ্রৌপদী। কেন? তুমি কি চাও তেরো বৎসর ধরে এই দুর্গতি, অপমান, লজ্জা আর অসম্মানের বোঝা বয়ে বেড়াই? তুমি কি প্রিয়সখির দুঃখ-কষ্ট আরও বাড়াতে চাও সখা?

কৌতুক স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ বললেনঃ না মনস্বিনী। বিধাতার অভিপ্রায়ে এসব হয়েছে। তোমার দুঃসহ অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। তোমার জন্য নিরন্তর বেদনা অনুভব করি প্রাণে। কিন্তু থাক্ সে কথা!

অভিমানে ক্ষুণ্ণ হয়ে দ্রৌপদী বলল—কে চেয়েছে তোমার এই কৃপা? চাই না, চাই না তোমার করুণা।

হাসলেন কৃষ্ণ। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর যেন কিছুটা সহজ ও স্বাভাবিক হবার চেষ্টাতেই স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে বললেনঃ সখি, রাজনন্দিনী তুমি। ভারত সাম্রাজ্ঞীও বটে। জটিল রাজনীতির ঊর্ণনাভ অবিদিত নয় তোমার। পাণ্ডবেরা এখন হীন বল। সম্পদ, সৈন্য, অস্ত্র কিছুই নেই তাদের। তারা বনবাসী। নিঃস্ব, রিক্ত। বন্ধুহীন সিংহাসনচ্যুত পাণ্ডবদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা এই অবস্থায় পূর্বের মত সহজ নয়। তুমি তো জান সখি,

সিংহাসনই রাজশক্তির উৎস। সিংহাসনচ্যুত রাজা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভেদ নেই। পাণ্ডবেরা এখন সাধারণ মানুষ মাত্র। পাণ্ডবের দিগ্বিজয়, প্রবল পরাক্রম, ঐশ্বর্য, বল, ভারতবর্ষের নৃপতিবর্গের ঈর্ষার বস্তু। কৌরবেরা এখন সেই ঈর্ষাকে মূলধন করে তাদের শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করবে। পাণ্ডবদের শত্রুবৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করবে। এখন পাণ্ডবদের পক্ষে কিছুই অনুকূল নয়। রাজনৈতিক সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে তাদের। নির্বাসনের তেরো বছর ধরে গোপনে গোপনে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। এখন তোমাদের স্বামীদের অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব। বিস্তর দুঃখের মূল্যে ধর্মরাজ লাভ করবেন তাঁর পূর্ব সিংহাসন ও মর্যাদা। ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধর সখি। স্বামীদের সর্বকার্যে সহায় হও। তাদের সকল কর্মের প্রেরণা তুমি। এই কার্যের মহান দায়িত্ব তোমাকেই সম্পন্ন করতে হবে।

বাইরে ভীমের উত্তেজিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে উদ্বিগ্ন হলেন কৃষ্ণ। তাড়াতাড়ি কুটীরের বাইরে এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। পিছু পিছু এল দ্রৌপদী।

বলদর্পী ভীমের ক্রোধ ও আস্ফালনে বনস্থলী ঘন ঘন কম্পিত হতে লাগল। তার পদভারে মেদিনীর বক্ষস্পন্দন হল দ্রুত। সভয়ে নির্বাক হল অরণ্য। হরিণ-হরিণী আতঙ্কে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। ময়ূর-ময়ূরী সুউচ্চ শাখায় আরোহণ করে চক্ষু মুদ্রিত করল।

আনার মাঝারে বন্দী সিংহের মত ভীমসেন গর্জন করছিল ক্রোধে। দুর্বাক্য বলে তিরস্কার করল জ্যেষ্ঠকে। ভীমের তীব্র ভৎর্সনা ও অগ্নিস্রাবী কুবাক্যে যুধিষ্ঠির অধোবদন হয়ে রইল। অর্জুনও অগ্রজের মত মৌন রইল।

ভীমের নিষ্ঠুর গঞ্জনার প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠির ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল ঃ আমি তিরস্কারের যোগ্য। আমার জন্যেই তোমাদের এই দুঃখ ও দুর্ভোগ। কিন্তু বিশ্বাস কর, দুর্যোধনের রাজ্য জয়ের ইচ্ছায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তাদের রাজ্যচ্যুত বনবাসী করার সংকল্প ছিল মনে।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে চমকে উঠলেন ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, নকুল সহদেব সকলেই। চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হয়ে তারা যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির যে এরকম চিন্তা মনে স্থান দিতে পারে বিশ্বাস করল না কেউ। কিন্তু, তবু ভীম মুখে কিছু বলল না। যাজ্ঞসেনীও কোন সংশয় প্রকাশ করল না সেজন্য। সহদেব ও নকুল দুই চক্ষু বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কৃষ্ণও সৌজন্য দেখানোর কোন চেষ্টা করলেন না। করুণাভরা চোখে ধর্মরাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জ্যেষ্ঠের মার্মান্তিক ক্ষোভ, দুঃখ, অর্জুনকে বিদ্ধ করল। সে আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। বলল ঃ ধর্মরাজ, দ্যূতক্রীড়ার ব্যর্থতাজনিত মর্মপীড়াই আপনাকে ক্ষুব্ধ করেছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর প্রতারণায় আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন। তাই, এমন অশোভন বাক্যে নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারলেন। অথচ, আমরা সবাই জানি, এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর কিছু নাই। ভুলেও ধর্মরাজ সম্বন্ধে অনুরূপ ভাবনা আমরা মনে স্থান দিই না।

অর্জুনের সহানুভূতি যুধিষ্ঠিরের অন্তরের দুঃখ, গ্লানি, অনুতাপ ও অভিমান দ্বিগুণ হল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বললেন ঃ আমার দ্যূতক্রীড়ার জন্যই তোমরা নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করছ। আমার অবিবেচনার শাস্তি তোমাদেরও নিতে হচ্ছে। ভীমের শত ভর্ৎসনাতে আমার ক্ষোভের অবসান হবে না।

উপস্থিত ব্যক্তিদের অনেকগুলি দীর্ঘশ্বাস পড়ল একসাথে। ভীমের নাসারন্ধ্র ঘন ঘন স্ফীত হতে লাগল। রোষদগ্ধ তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করছিল। সকলের মৌনতা লক্ষ্য করে দ্রৌপদী রোষদগ্ধ তৃণের মত দপ্ করে জ্বলে উঠল। প্রখর সূর্যালোকের মত তার দুই চক্ষু ধূ-ধূ করতে লাগল। সেখানে করুণার ছোঁয়া পর্যন্ত নেই। ধারাল হল তার চাহনি। আত্মসংবরণ করতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। শাণিত কৃপাণের মত ধর্মরাজের অনুশোচনায় প্রত্যুত্তরে সে বলল ঃ

সত্যিই তাই। ধর্ম আপনাকে করেছে ক্লীব। ক্ষত্রিয়ের বল, তেজ, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, ক্রোধ, অহংকার কিছু নেই আপনার। ধর্ম আপনাকে কি দিয়েছে? দুঃখ, দুর্ভোগ, যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনা। এক বনবাসের ক্লেশ ভুলতে না ভুলতে আর এক বনবাসের অভিশাপ ভোগ করতে হচ্ছে। এই যদি হয় ধর্মের বিধান, তবে কাজ নেই অমন ধর্মের জন্য আত্মত্যাগ করা। দুর্যোধন লোভী, পাপী, অধর্মচারী তবু সৌভাগ্যসূর্য তার কখনও অস্ত যায়নি। বরং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তাদের। নতুন নতুন রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য, বান্ধব লাভ করছে। আর আপনারা ধর্ম ধর্ম করে বনবাসী ভিক্ষুক হচ্ছেন। রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আত্মীয় বান্ধব কেউ নেই আপনাদের। এই যদি ধর্মফল হয় তাহলে নিজের কর্মের দ্বারা, উদ্যোগের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফললাভ হয় তাই করুন। পুরুষকারই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তার প্রধান সম্বল। আপনার মধ্যে সেই পৌরুষ কোথায়? পৌরুষের অভাবেই আজ আপনি ক্লীব। আপনি কি ভুলে গেলেন যে ভীমসেন ও অর্জুন আপনার দুই বাহু। প্রিয়সখা কৃষ্ণ আপনার জ্ঞান ও ধর্ম। আমার ধারণা, আপনি এই তিনজনের সাহায্য পেলে ত্রিভুবন পর্যন্ত জয় করতে পারেন।

দ্রৌপদীর বাক্যে যুধিষ্ঠিরের কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। পাষাণবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে হৃদয় তাঁর বিদ্ধ হল না। চিত্ত হল না চঞ্চল। কোন ক্রোধও জাগল না তাঁর। নিরুত্তাপ কণ্ঠে ধর্মরাজ বললেন ঃ কিন্তু প্রিয়তমা, বলদর্পে চঞ্চল হয়ে কর্ম করলে বিপরীত ফল লাভ হয়। প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসায় মত্ত হয়ে কোন কার্য করলে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

ভীমের সর্বাঙ্গ কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হল। বলল ঃ থাক্ থাক্ আপনার নীতিসুধা! ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করা আপনার উচিত হয়নি। রাজ্য শাসনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আপনি ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠির। রাজনীতিই আপনার ধ্যান। কূট রাজনৈতিক বুদ্ধি, কৌশল, কপটতাই রাজার পরম বল। রাজনীতির সঙ্গে মুনিঋষির ধর্ম যুক্ত করলে রাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ধর্ম যদি কুয়াশার মত আপনার বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে ভীরুর ভীরুতা, অন্যায়, কাপুরুষতা বাড়বে।

করুণ চোখে তাকাল যুধিষ্ঠির, ব্যাকুল হয়ে বললেনঃ বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের ভাল চাই। মঙ্গল কামনা করি। আমি যে রাজা, ভারত সম্রাট, সে কথা ভুলিনি। ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যব্রত, প্রজাকল্যাণরত রাজার মত সকলের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতা কামনা করি।

যুধিষ্ঠিরের উক্তি সমর্থন করল দ্রৌপদী। তাঁকে স্বমতানুবর্তী করার জন্য দৃঢ়কণ্ঠে বলল ঃ কিন্তু সেজন্য রাজধর্ম পালন করতে হবে আপনাকে। দোষী ও অপরাধীকে দণ্ডদান করা রাজধর্ম। রাজদণ্ড অপরাধীর অপরাধ প্রবণতাকে সংযত রাখে। তাঁর দোষ ও অপরাধ চন্দ্রকলার মত দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। সে তখন দানব হয়ে ওঠে। হিংসায় নিজে জ্বলে, অপরকে জ্বালায়। তাকে দমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধা কোথায়?

জ্যেষ্ঠকে আঘাত করার জন্যে ভীম অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল ঃ বাধা মনে। সংশয়ে অপ্রসন্ন কণ্ঠে মহারাজের চিত্ত এখনও আচ্ছন্ন। কিন্তু মহারাজ ভুলে যাচ্ছেন, রাজনীতিতে দয়াধর্ম, ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম, ন্যায়ধর্ম বলে কিছু নেই। শঠতার দ্বারা শঠকে বধ করা পাপ হয় না।

বলতে গিয়ে তার বাক্যরুদ্ধ হল। আত্মসংবরণ করার জন্য থামল। তারপর বলল ঃ মহারাজ, আমাদের সকলের প্রিয়তমা ভার্যা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা কিছুতে ভুলতে পারি না আমি। সে কথা মনে হলে শান্ত থাকতে পারি না। আমার চিত্ত তখন বশে থাকে না। অথচ, আপনার মনে তার জন্যে এককণা সহানুভূতি, দয়া, মমতা পর্যন্ত নেই। তার দুঃখের প্রতিকারের কোন চিন্তাই আপনি করেন না। এতই স্বার্থপর আপনি। এক অজানা ভয় ও অচেনা আতংকে আপনি জড়ভরত।

যুধিষ্ঠিরের চৈতন্য উদ্রেক করার জন্য দ্রৌপদী বলল ঃ মহারাজ, ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের কাছে যদি অনুগত, আশ্রিত ও অধীনস্থ রাজন্যবর্গ তাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন উত্থাপন করে, প্রজারা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বহনের দাবি করে তাহলে কি করবেন স্বামী? কোন অধিকারে আপনি তাদের ত্যাগ করলেন, সে কথা জানতে চাইলে কি উত্তর দেবেন? আপনার খেয়ালখুশি মত চললে কি রাজধর্ম পালন করা হয়? তাদের বিপদসমুদ্রে নিক্ষেপ করা, আপনার অধর্ম নয়?

যুধিষ্ঠিরের ভাবান্তর দেখার জন্য থামল দ্রৌপদী। তখন ভীম জ্যেষ্ঠের কর্তব্য স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য বলল ঃ এমতাবস্থায় তাদের রক্ষার জন্য যদি কৌরব রাজ্য আক্রমণ ত্বরান্বিত করা হয় তাহলে কোন অধর্ম হয় না। দুর্বল, আশ্রিত ও শরণাগতকে ত্যাগ করা অধর্ম। আজ মহারাজ যদি নিজের স্বার্থানুসারে চলেন তাহলে ধর্ম কখনও ক্ষমা করবেন না তাঁকে। শাস্ত্রের বিধান আছে, কোন কারণে মনে পাপ এবং অপরাধ বোধ স্পর্শ করলে বিরাট যজ্ঞ করে, দান ধ্যান করে তা থেকে পাপমুক্ত হওয়া যায়। ধর্মজ্ঞ লোকের বিচারে এক অহোরাত্রই এক বৎসরের সমান গণ্য হয়। সেই অনুসারে তেরো দিনেই আমাদের তেরো বৎসর সমাপ্ত হয়ে গেছে।

দ্রৌপদী ও ভীমের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যালাপে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না যুধিষ্ঠির। এই ভৎর্সনা ও তিরস্কার তাঁর প্রাপ্য মনে করে নীরব রইলেন। চিত্ত

তাঁর সম্পূর্ণ বশে ছিল। অসীম ধৈর্য ও মনোবল তাঁকে কর্তব্যে কঠোর করল। ভীমের বচন শেষ হলে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: বৎস, হাজার বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেও তুমি ও দ্রৌপদী আমাকে সত্যভ্রষ্ট করতে পারবে না।

কৃষ্ণ এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি। এমন একটা অবস্থার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভীম ও দ্রৌপদীর ক্ষোভ ও ক্রোধ যে একটি সংকটময় অবস্থাকে অনিবার্য করবে তা তাঁর লোক চরিত্রাভিজ্ঞতার জ্ঞান থেকে অনুমান করে নিয়েছিলেন। অন্তরের পুঞ্জীভূত দুঃখ ক্ষোভ ও গ্লানির পাত্র শূন্য না হওয়া অবধি তাকে বাড়তে দিলেন। তারপর, তাদের রোষ যখন শীর্ণ ও শান্ত হয়ে এল তখন ভীমকে সম্বোধন করে কৃষ্ণ বললেন: প্রিয় সখা, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তুমি যা বলতে পার সমগ্র পরিবারের প্রধান হয়ে, রাজা হয়ে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তা করার বাধা অনেক। তাঁর একার সিদ্ধান্তের উপর সমগ্র পাণ্ডব এবং তথা ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ভর করছে। ভালমন্দ এবং অগ্রপশ্চাৎ ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে তাঁকে অগ্রসর হতে হবে। ভুল তিনি করেছেন, কিন্তু সেজন্য দায়ী করি না তাঁকে। তাঁর অদৃষ্টের জন্যই এমনটা হল। কাজেই জ্যেষ্ঠকে তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করা তোমার মত অনুগত ভ্রাতার কদাপি শোভা পায় না। ক্ষোভ ত্যাগ করে জ্যেষ্ঠের অনুগত হও। বৃথা বলদর্প প্রকাশ করলে ক্ষতিই হয় অধিক। রুক্ষ ও রুষ্ট ব্যবহারে ব্যবধান বাড়ে। শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়, শক্তি ও ঐক্য হয় বিনষ্ট। ফলে, শত্রুদের বৃহত্তর জয়লাভের পথ হয় প্রশস্ত। তোমার মত বিচক্ষণ, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আচরণ আশ্চর্যকর! কাল পূর্ণ না হওয়া অবধি সিদ্ধিলাভ হয় না কারও! এসব বিচার করে আমি তোমার প্রসন্নতা যাচঞা করছি।

দ্রৌপদীর অনলবর্ষী দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা পতঙ্গের মত তাঁকে আকর্ষণ করল। স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তাকে বললেন: প্রিয় সখি, তোমার চোখে ক্রোধের আগুন নিভবার নয়। তোমার অপমান, অসম্মান আর লজ্জার কালিমা নিষ্কলুষ করার জন্যই একদিন সমগ্র ভারতে ঐ আগুনে প্রজ্জ্বলিত হবে। পাপ চরমে না উঠলে তার প্রতিবিধান হয় না। ধর্ম-অধর্মের সংঘর্ষে অধর্মের জিত হয় প্রথম। কিন্তু, চিরস্থায়ী জয়তিলক ধর্মের ললাটের শোভা পায়। ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্রকে অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সইতে হয়েছিল, সে তো তুমি জানোই।

তারপর, কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন: শোন কৌন্তেয়গণ, আমাদের সম্মুখে এখন চরম দুর্দিন। আত্মরক্ষার চিন্তাই প্রবল। কোন কারণে একস্থানে অধিককাল অবস্থান করা নিরাপদ নয়। এতে শত্রুর শত্রুতা করা সহজ হয়। নানা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা প্রবল থাকে। অজ্ঞাতবাসের গতিবিধি শত্রুপক্ষের অবগত হওয়া সহজ হবে। সেজন্য প্রতিনিয়ত স্থান বদল করবে। প্রচ্ছন্ন থেকে মৈত্রী বন্ধনে সচেষ্ট হবে। কৌরবদের প্রবঞ্চনা, শঠতা, লোভ, মাৎসর্য, বর্বর আচরণ, ধৃতরাষ্ট্রের অসৎ অভিপ্রায় সময় ও সুযোগ অনুসারে মিত্রদের জানাবে।

অনবদ্য বাঙ্ভঙ্গীমায় কৃষ্ণের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল। মুগ্ধ বিস্ময়ে সেদিকে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভীম ও দ্রৌপদীর মনের সব ক্ষোভ ও অভিমান দূর হয়ে গেল। এক অপারিসীম তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় তাদের উভয়ের চিত্ত ভরে গেল।

দ্রৌপদী ও ভীমের মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি ফিরে এল দেখে কৃষ্ণের ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদু কৌতুক বক্র। এখন তা অত্যন্ত রহস্যময় হাসিতে মধুর হয়ে উঠল।

একাদশ অধ্যায়

অজ্ঞাতবাস শেষ হতে মাত্র আর কয়েকদিন বাকি। উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় দিনগুলো কাটতে লাগল কৃষ্ণের। এক একটি দিন তাঁর এক এক বৎসরের মত মনে হতে লাগল। অস্থির অবস্থা তাঁর মনের। উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় সর্বদা অন্যমনস্ক। দূতের আগমন সংবাদে উদ্বিগ্ন হন তিনি। দিনগুলো একরকম আতঙ্কে ভোর হয়।

প্রিয়তমা মহিষীর সাথেও প্রাণ খুলে কথা হয় না। বলতে ভাল লাগে না। অবশ্য সেজন্য রুক্মিণী অনুযোগ করেনি কখনো। স্বামীর মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আলোড়ন, উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণগুলি তার অজ্ঞাত নয়।

অজ্ঞাতবাসের শেষ দিনে পঞ্চ পাণ্ডবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রাণপ্রিয় সখা কৃষ্ণের দু'নয়নে ঘুম নেই। রুক্মিণীর স্বহস্তে রচিত কোমল ও মনোরম শয্যাও কণ্টকের ন্যায় পীড়াদায়ক হল। নিঝুম রাত্রে রাতজাগা পাখীর আর্তনাদে চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। মাঝে মাঝে শয্যা ছেড়ে কালচক্রের উপর নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। চোখে এক অদ্ভুত তন্ময়তা। মুখে বিহ্বল ভাব। মনে বিষণ্ণতার ছায়া।

কৃষ্ণের এরূপ অস্থির ও বিচলিত ভাব রুক্মিণী ইতিপূর্বে দেখেনি কখনও। ভীষণ অবাক লাগল তাঁর। শয্যা ত্যাগ করে ধীর পায়ে স্বামীর পশ্চাতে এসে দাঁড়াল। হাত রাখল পিঠে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তার অপরূপ মুগ্ধতা। রুক্মিণীর আশ্চর্য রহস্যময় প্রেমমুগ্ধ কৌতুক দৃষ্টির দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণ। ওষ্ঠপ্রান্তে তার কৌতুক মধুর হাস্যচ্ছটা তুলির রেখার মত সুন্দর। মৃদু কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে রুক্মিণী বলল: সূর্যোদয়ের আর বেশী দেরী নেই। ভোরের পাখীরা জেগে উঠেছে। বৃক্ষ শাখে তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এখনি নীল আকাশে ডানা মেলে দেবে। দ্যাখ আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ। অন্ধকার বিদায় নিয়েছে। রাতের সব মলিনতা কেটে গেছে। সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হল আকাশ। আর ভয় নেই। রাতের মধ্যে কিছু না হলে, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের কাল নির্বিঘ্নে পূর্ণ হবে।

সুদূর আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েছিলেন কৃষ্ণ। অনেকক্ষণ। বিহ্বল অবস্থা তাঁর। হঠাৎ, মনে হল, রুক্মিণী যেন কি বলছে তাঁকে। শেষ কথার সূত্র ধরে বলল: ঠিক বলেছ। অরুণোদয়ের পর অন্ধকারের কালো গর্তে যেমন

পাখীরা আর মুখ লুকিয়ে থাকে না তেমনি পাণ্ডবদের বিরাট রাজের কাছে আর আত্ম গোপন করে থাকা উচিত হবে না।

মৃদু মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হল রুক্মিণীর মুখ। গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কৃষ্ণের প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল। বলল ঃ তাহলে এবার বিরাট রাজ্যে যাত্রার উদ্যোগ করি।

রুক্মিণীর অকারণ হাস্যে কৃষ্ণের আসঙ্গলিপ্সা প্রবল হল। ওষ্ঠদ্বয় হল তৃষিত। উদ্বেলিত প্রেমে বুক হল অস্থির ! সাগরের জোয়ার এসে লাগল সেখানে। বারণ না মানা আগ্রহে বাহুদ্বয় হল চঞ্চল। দুই বাহু দিয়ে তাকে টেনে নিলেন আপনার বক্ষদেশে। সে ইচ্ছায় বাধা দেবার সাধ্য ছিল না মুগ্ধা রুক্মিণীর।

ঊষার আলো এসে পড়ল ঘরে। আবেগ বিহ্বল প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে পরস্পরের দিকে তাকাল তাঁরা। বড় নির্মল, স্নিগ্ধ সে চাহনি। তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ।

গবাক্ষ পথে একজন লোককে প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ। কাছাকাছি হতে চিনতে পারলেন তাকে। লোকটি তাঁর বিশ্বস্ত চর একজন। পেঁছানো মাত্রই তাকে দৌবারিক দিয়ে ডেকে পাঠালেন। চোখেমুখে তার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ছাপ প্রকট হল। লোকটি যেভাবে দৌড়ে এল তাতে খবর শুভ নয় বলেই মনে হল কৃষ্ণের।

গুপ্তচরের নাম কুন্তক। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশ্বস্ত। তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। রাজপ্রাসাদে সর্বত্র তার অবারিত দ্বার। এই রাজ পরিবারেরই একজন সে। গুপ্তচরবৃত্তিতে তাকে নিয়োগ করেছেন কৃষ্ণ। তার নৈপুণ্যের তুলনা নেই। বনবাসী পাণ্ডবদের উপর নজর রাখার জন্য তিনি কুন্তককে নিযুক্ত করেছেন ! ছায়ার মত পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকে সে। চোখে চোখে রাখে। কিন্তু পাণ্ডবেরা কোনদিন জানতেও পারেনি তাকে। বহুরূপে পাণ্ডবদের সঙ্গে সে বনে বনান্তরে পরিভ্রমণ করেছে। একবার'তো কিরাতের বেশে কৃষ্ণকে খবর দিল বনবাসী পাণ্ডবেরা দুঃখ 'কষ্টে কিভাবে জীবন যাপন করছে তা দেখে মজা ও কৌতুক করাতেই দুর্যোধন, তার ভ্রাতা, বান্ধব ও গৃহবধূদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দ্বৈতবনে এসেছে। সঙ্গে আছেন বিশ্বস্ত সহচর ও মন্ত্রণাদাতা কর্ণ এবং শকুনি। কৌরবদের এই নির্মম কৌতুককর আচরণে বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন সবাইকে রজ্জুবন্ধ করল। কৌরব রমণীদের আর্ত চীৎকার ও বিলাপ শুনে পঞ্চপাণ্ডব গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের গতিরোধ করল। দুর্যোধন তাদের চিরশত্রু হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবেরা বন্ধু চিত্রসেনের অন্যায় এবং অশোভন আচরণকে প্রশ্রয় দিল না। কৌরবদের অসৎ অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যের কথা জেনেও তারা তাকে নিবৃত্ত করল। এবং তার কবল থেকে কৌরব ভ্রাতা ও বন্ধুদের মুক্ত করল। প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার পরিবর্তে কুলগৌরব ও কুলবধূদের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন বড় হল তাদের কাছে। পাণ্ডবদের চরিত্রের এই মহানুভবতা চিত্রসেনকে বিস্মিত করল। কুন্তকের মুখে সে কাহিনী শুনে কৃষ্ণও বিস্ময়ে হতবাক হল।

কুন্তক এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। কৃষ্ণ কয়েক মুহূর্ত নীবব থেকে বললেন ঃ খবর সব কুশল তো কুন্তক!

তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারল না কুন্তক। একটু ইতস্তত করে বলল ঃ দুশ্চিন্তা কবার মত কোন কারণ উপস্থিত হয়নি। পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে—

নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য থেমেছিল কুন্তক। বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণ। বুক তার কেঁপে উঠল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ থামলে কেন কুন্তক। তোমার কথায় ভয় হচ্ছে আমার। বল, তাদের কি অবস্থা?

ম্লান হাসল কুন্তক। বলল ঃ দুর্যোধন বিরাট কৌরব বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে বিরাট রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হয়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি প্রমুখ মহারথীরাও আছেন তার সঙ্গে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তারা বিরাট রাজ্যের সমস্ত গোধন হরণ করবে। এই সংবাদ দিতেই এতখানি পথ ছুটে আসা। অনুগ্রহ করে বিশ্রামের অনুমতি দিন আমায়।

কৃষ্ণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। সঙ্গে সঙ্গে কুন্তক প্রণাম করে বিদায় নিল।

অবাক লাগল কৃষ্ণের। অজ্ঞাতবাসের কাল সবে পূর্ণ হল। একটি দিনও অতিক্রান্ত হয়নি। এরই মধ্যে আক্রমণ কেন? কেন? নিজেকে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণ? আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠল। তবে কি, শেষ মুহূর্তে দুর্যোধন পাণ্ডবদের অজ্ঞাত অবস্থান জানতে পারল? সে জন্যেই কি তারা পাণ্ডবদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে চায়? বিরাট রাজ্যের গোধন হরণ তাদের অজুহাত। আসলে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধই তাদের উদ্দেশ্য। পাণ্ডবেরা প্রস্তুতির সুযোগ যাতে না পায় সেজন্যেই রাতের অন্ধকারে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুর্যোধন যুদ্ধ যাত্রা করেছে। দুর্যোধন সত্যিই অকৃতজ্ঞ। দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের মহানুভবতাকে এত তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হল কি করে? সত্যিই কি দুর্যোধন এত কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হবে? ভাবনার বিরাম নেই কৃষ্ণের।

পাণ্ডবদের খোঁজে দুর্যোধন বিশ্বস্ত ও দক্ষ গুপ্তচর নিয়োগ করেছিল। দেশ-দেশান্তর জুড়ে পাণ্ডুপুত্রদের খুঁজল তারা। গহন অরণ্য, দুর্গম পর্বত, জনাকীর্ণ নগরী, মরুভূমি সর্বত্র অন্বেষণ করল। কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পেল না।

কৌরবদের বিভ্রান্ত করার জন্যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিলেন। কিন্তু ভীষ্ম ও দ্রোণের মনে সন্দেহ দৃঢ় হল। তখন দুর্যোধন সাধারণ মানুষকে অর্থে প্রলুব্ধ করল। পাণ্ডবদের সন্ধানের জন্য নগদ স্বর্ণ মুদ্রার পুরস্কার ঘোষণা হল। কিন্তু কোন সূত্র থেকে পাণ্ডবদের খোঁজ পাওয়া গেল না। কৌরবরা তখন ধরে নিল কৃষ্ণের কথাই সত্য। পাণ্ডবেরা প্রকৃতই আর জীবিত নেই। দুর্যোধনের কাছে তারা যদি মৃত হয় তাহলে, চুপিসারে তারা সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হল কেন? বিরাট রাজ্য আক্রমণ যদি দুর্যোধনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস সমাপ্তি হওয়ার দিনে তারা আক্রমণ করবে কেন? এই কেন'র রহস্য সন্ধান কৃষ্ণের পক্ষে দুরূহ হল। মন্ত্রণাদাতা শকুনির পরামর্শের কথা মনে পড়ল ঃ 'অরির শেষ রাখবে না কভু; শাস্ত্রে এই মত কয়!' কিন্তু শত্রু কে? পাণ্ডবেরা, না বিরাট

রাজা ? বিরাট রাজা অনেকবার হস্তিনাপুর আক্রমণ করেছে। নানারকম উৎপীড়ন ও অত্যাচার করেছে তাদের উপর। সম্প্রতি সেনাপতি কীচক গন্ধর্ববেশী ভীমের হাতে নিহত হয়েছে। কীচকের অভাবে বিরাট রাজ্যের সৈন্যবাহিনী দুর্বল এবং অসহায় হয়ে পড়েছে। মৎসরাজ নিজেও ত্রিগত সেনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। সুযোগ সন্ধানী দুর্যোধন হয়ত সেই সংবাদ পেয়ে মৎসরাজ্য আক্রমণ করে তার পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিংবা মৎসরাজের মত শক্তিশালী নৃপতির শক্তি খর্ব হলে সহজে তাকে কোণঠাসা করা সম্ভব হবে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি তখন তার বশীভূত হবে। অথবা প্রকাশ্য বিরোধিতা থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে। তবে কি দুর্যোধন এই রাজনৈতিক জয়লাভের কথা চিন্তা করে বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেছে ? এর সঙ্গে পাণ্ডবদের সম্পর্ক আছে বলে তাঁর মনে হল না। কাকতালীয়ভাবে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সমাপ্ত হওয়ার দিনটির সঙ্গে মিলে গেছে মাত্র। এই কথা মনে হওয়ার পর তাঁর সব দুর্ভাবনা দূর হল।

কৃষ্ণের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি। মনে মনে বললেনঃ ভালই হল। সব নিয়তি! এক অদ্ভুত আশ্চর্য ভাগ্যলিপি পাণ্ডবদের। নইলে ঠিক আত্মপ্রকাশের দিনটিতে তাদের বলবীর্যের পরীক্ষা দিতে হবে কেন ? কাজের ভেতর দিয়ে তাদের চিনে নেওয়ার এ এক অদ্ভুত আয়োজন করেছেন অদৃষ্ট দেবতা।

পাণ্ডবেরা যে বিরাট রাজ্যের আশ্রিত ও বেতনভুক কর্মচারী এ সংবাদ দুর্যোধন ও মৎস্যরাজ কেউই জানে না। বিরাটরাজ ত্রিগর্ত সেনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত এখন। রাজধানী একপ্রকার অরক্ষিত। এরূপ অবস্থায় বিরাট রাজ্য আক্রান্ত হলে পাণ্ডবেরা কেউই নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে রণসজ্জা গ্রহণ করবে তারা।

বনবাসের দ্বাদশ বৎসর ধরে অজ্জুর্ন সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছে। তপস্যার দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে বিবিধ দেবাস্ত্র সংগ্রহ করেছে। এইসব আশ্চর্য আশ্চর্য অস্ত্র লাভের সংবাদ দুর্যোধন জানে না। সদ্য সমাপ্ত অজ্ঞাতবাসের দিনে দুর্যোধন নতুন করে অজ্জুর্নের শক্তির পরিচয় পাবে। পাণ্ডবদের সম্বন্ধে এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে সে।

অর্জুন সহ সমগ্র পাণ্ডবদের আত্মপরিচয় দেবার এই মাহেন্দ্রক্ষণটি বিধাতার সৃষ্টি। এক আশ্চর্য শিল্পী তিনি। নিপুণ কৌশলে কৌরবদের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের এক আসর সাজিয়েছেন! পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের দিনে তাঁর করুণা ও আশীর্বাদ যেন পাঠিয়ে দিলেন কৌরব বাহিনীর মাধ্যমে। দৈবযোগ ব্যতীত এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা খুব কম ঘটে। পাণ্ডবদের ভাগ্যে বহু ধরনের কাকতালীয় ঘটনা ঘটেছে বহুবার। যুক্তি দিয়ে তার সব বিশ্বাস করা যায় না তবু সব সত্য।

কৃষ্ণের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিল রুক্মিণী। তবু ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। বারংবার তাকালেন তার দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি কেমন অদ্ভুত! মণিহীন চোখ, চোখ-হীন মুখ, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছেন নেই তার সঠিক ঠিকানা। মনে মনে খুব রাগ হচ্ছিল রুক্মিণীর। দুঃখে, ক্ষোভে তার চোখে জল এল। কষ্ট করে নিজেকে

সংবরণ করল সে। চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য কম্পিত স্বরে বলল ঃ দূতের কথা কিছু বললে না তো স্বামী! অনুগ্রহ করে দুঃসহ চিন্তার যদি ভাগ দাও তাহলে কৃতার্থ হয় কিংকরী।

প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল কৃষ্ণ। এক অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্যে মুখখানি রমণীয় হল। প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন মিলিয়ে গেল। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত হাসল বলল ঃ ওঃ তুমি! দ্যাখতো, কি লজ্জার কথা! প্রিয়তমা মহিষী আমার— বলে, কণ্ঠ দেশে হাত রাখলেন কৃষ্ণ। স্থির দৃষ্টিতে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। অল্পক্ষণ পরে আবেগ গাঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ ভারতবর্ষের রাজনীতি বোধ হয় এক নতুন পথে চলেছে মহিষী। পাণ্ডবদের মুক্তির চেহারা দেখে আমার মনে আতঙ্ক জেগেছে! অথচ, যুদ্ধ ছাড়া পাণ্ডবদের গৌরব, মর্যাদা, অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন পথ নেই। পাণ্ডব ও কৌরবদের ক্ষমতা দ্বন্দ্বে সমগ্র ভারতভূমির শান্তি ও সুখ নষ্ট হবে। তাদের উপর যত অবিচার, অত্যাচার হয়েছে ততই পাপের বোঝা ভারী হয়েছে। কঠিন দুঃখের মূল্যে তার ঋণ পরিশোধ করবে সমগ্র ভারত-ভূমি। শীঘ্রই এক ঘোরোতর সংগ্রাম আরম্ভ হবে। সেই যুদ্ধে এমন অনেক কিছু ঘটবে যা আমি চাইনি কখনও। তবু প্রতিরোধ করা যাবে না তাকে। ধর্ম কুপিত, দেবতা ক্রুদ্ধ। ভারতবর্ষের মহাশ্মশানের উপর গড়ে উঠবে এক নতুন ভারত। তাকে দেখার সৌভাগ্য হবে কিনা জানি না।

বিস্ময়ে রুক্মিণীর চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হল। শঙ্কিত কণ্ঠে বলল ঃ কি বলছ স্বামী? এমন অনাসৃষ্টির কথা তো শুনিনি এর আগে!

ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল কৃষ্ণ ঃ জরাসন্ধরা মরে না। তাদের মৃত্যু নেই। বিধাতার অভিশাপে তারা কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করে।

প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল রুক্মিণী। বলল ঃ তোমার হেঁয়ালী বুঝতে পারছি না নাথ।

পারবে না মহিষী। রাজনীতি বড় জটিল ব্যাপার। দুর্যোধন নিজেকে দ্বিতীয় জরাসন্ধ বলে ভাবে। কিন্তু জরাসন্ধের বুদ্ধি, ক্ষমতা, শক্তি তার নেই। তবু, দুর্বার লোভ, অসংযত অহংকারে মত্ত হয়ে সে পৃথিবীর অধিপতি মনে করে নিজেকে। বলশালী মৎসরাজ বিরাটের বিপুল বাহিনী পর্যুদস্ত করে তাঁর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে বশে আনবে ভেবেছে দুর্যোধন। স্বার্থের প্রশ্নে তারা কৌরবদের সঙ্গে যুক্ত হবে এই তার ধারণা। নির্বোধ! রাজনীতি মানেই বাইরের লড়াই এবং সংঘর্ষ নয়। সে লড়াই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, নীতিতে-নীতিতে। বুদ্ধির উত্তাপে সে লড়াই যখন রাজনীতির গর্ভদেশে সঞ্চার হয় তখনই আরম্ভ হয় রাজনীতির আসল খেলা। রাজনীতিতে গোপন সংঘাতের কৌশল সৃষ্টি করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! দুর্যোধনের সে শিক্ষা নেই।

রুক্মিণী বলল ঃ কিন্তু আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টির জন্য বাইরের এই লড়াইটার মূল্য খুব বেশী। খোলা মাঠে কিংবা রাজপথে যখন সে লড়াই বাধে তখন সবার দৃষ্টি পড়ে সেদিকে। বিবাদমান দলের শক্তির পরিমাপ করা তখন সহজ হয়!

ঠিক বলেছ মহিষী। দুর্যোধন ভারতের রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা এনেছে। তার বিপুল বাহিনী, অন্নভোগী মহারথীরা সব রাজ্যের দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার কারণ। হয়ত একদিন বিশাল বাহিনী নিয়ে এই যাদব সংঘের উপরও হানা দিতে পারে। তার মতন ব্যক্তির অসম্ভব কার্য কিছু নেই। কিন্তু বিধাতা বাম তার প্রতি। রাজনীতির রাহু হাঁ করে আছে তাকে গিলবার জন্য। দুর্যোধনের সাধ্য নেই তাকে আটকায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

কুন্তকের সঙ্গে কথা বলছিল কৃষ্ণ। সুন্দর গল্প বলতে পারে কুন্তক। তার গল্প বলার অনবদ্য ভঙ্গী কৃষ্ণের ভাল লাগে। ব্যস্ততা না থাকলে তার কাছে নানা রোমাঞ্চকর গল্প শোনেন কৃষ্ণ। গুপ্তচর বৃত্তি করতে গিয়ে সে যা দেখে তাই সবিস্তারে কৃষ্ণকে জানায়।

মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন কৃষ্ণ। পান্ডবদের নির্বাসনের ত্রয়োদশ বর্ষ যেদিন পূর্ণ হল, সেদিনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা কৌরবদের সঙ্গে একজোট হয়ে বিরাট রাজার গোধন হরণ করতে গেল। বাধল প্রবল যুদ্ধ। বিরাটরাজ পরাজিত হলেন। সুশর্মার হাতে বন্দী হলেন তিনি। তাই দেখে, মৎস সৈন্যরা রণভূমি ছেড়ে পালাতে লাগল। তখন ভীম চিন্তা করার মত সময় পেল না। শত্রুর হাত থেকে বিরাট রাজাকে মুক্ত করার জন্য এক বিশাল বৃক্ষ উৎপাটিত করে সুশর্মার দিকে ধাবিত হল। তাই দেখে যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন তার কাছে। ভীমকে নিবৃত্ত করার জন্য বললেনঃ শোন বৃকোদর, হাতে বৃক্ষ দেখলে শত্রুরা আমাদের চিনে ফেলবে। এখন আমাদের আচরণ সংযত রাখা উচিত। তুমি বরং খড়্গ পরসু প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ কর।

ভীম সহাস্যে বলল ঃ জ্যেষ্ঠ, বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করলে আমার সুবিধা হয় বেশী। আপনি বাধা দেবেন না। শত্রুরা জানুক, আমরা বেঁচে আছি। তাদের রাতের ঘুম দিনের শান্তি আমি কেড়ে নেব। ওরা চিনলেও আমাদের ভয় করার কিছু নেই।

বিরাট রাজার দূত এসে কৃষ্ণকে অভিবাদন করল। কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলল ঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে এই বিশেষ পত্র দিয়েছেন। গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন আমায়।

পত্র গ্রহণের সময় অজানা আশংকায় কৃষ্ণের বুক কেঁপে উঠল। বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালেন। দূতের নীলকান্তের মত উজ্জ্বল সুন্দর মণিদ্বয়ের মধ্যে কি যেন অন্বেষণ করতে লাগলেন তিনি। তার শান্ত দীপ্ত মুখশ্রীর দিকে এক-

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর পত্রটি আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন। এবং অভিনিবেশ সহকারে মনে মনে পাঠ করতে লাগলেন।

বিনয় সম্ভাষণ ও কুশল সংবাদাদি গ্রহণের পর যুধিষ্ঠির লিখেছেন :

'আত্মপ্রকাশের এক আশ্চর্য সুযোগ বিধাতা আমাদের মিলিয়ে দিলেন। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় করে ধন্য হলাম আমরা। বিধাতার ইচ্ছা মনে করেই আমরা সময় ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম। একে আমাদের জীবনে এক পরম লগ্ন বলতে পার।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও দুর্যোধন মিলে মৎসরাজ্যের গোধন হরণের এক বিচিত্র ষড়যন্ত্র করেছিল। এক সঙ্গে তারা দুই অঞ্চলের গোধন হরণে প্রবৃত্ত হল। বিরাট রাজকে সুশর্মা পরাজিত এবং বন্দী করল। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হল অভিসন্ধিপরায়ণ দুর্যোধনের দুষ্ট চক্রান্ত। পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরতে হল সুশর্মা ও দুর্যোধনকে। কৃতজ্ঞ বিরাট রাজা দুর্দিনের বন্ধু এবং অসময়ের সাথীদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে উৎসুক। অর্জুন পুত্র অর্থাৎ তোমার ভাগিনেয় অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাট রাজা তাঁর দুহিতা উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। বিরাট রাজার আশ্রয়ে মুগ্ধ পাণ্ডবেরা এই অপ্রত্যাশিত বৈবাহিক সম্বন্ধকে স্বাগত জানাতে ইচ্ছুক। পাণ্ডব সখা কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতীত এ বিবাহ হতে পারে না। বর্তমান অবস্থার কথা সবিশেষ চিন্তা করে তোমার মনোভাব জ্ঞাপন করবে।'

নিশ্বাসরুদ্ধ করে পত্র পাঠ করছিলেন কৃষ্ণ। মৃদু হাসিতে অধরদ্বয় কখনও কম্পিত কখনও স্ফুরিত হচ্ছিল। পল্লবঘন কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল মুহুর্মুহু স্পন্দিত হচ্ছিল। আবেশ বিহ্বল চক্ষু তারকাদ্বয় বিস্ময়ে বিমোহিত। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল এক আশ্চর্য রমণীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মনের মধ্যে উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস গোপন করা সম্ভব হল না বেশিক্ষণ। পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ডাকলেন : দৌবারিক!

অভিবাদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াল সে। আদেশের অপেক্ষায় কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণ আপন মনে হাসছেন, আর পত্রের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পর মুখ না তুলেই দৌবারিককে বললেন : শীঘ্রই ভগিনী সুভদ্রাকে বার্তা পাঠাও। তাকে আমার কক্ষে আসতে বল।

মৎস্যরাজ্য থেকে বিশেষ দূত এসেছে এ সংবাদ সুভদ্রাও পেয়েছিল পূর্বাহ্নে। অনেকদিন পঞ্চপাণ্ডবের খোঁজ পায় না। তাই মনটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। নানারকম ভাবনা চিন্তায় ভাল করে রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না। দিনটাও কাটে অশান্তি আর উদ্বেগে। বিশেষ করে অর্জুনের কথা সর্বদা মনে পড়ে তার। দ্রৌপদীর মত সৌভাগ্যবতী সে নয়। মনেতে সেজন্য একটা প্রবল দুঃখ আছে। পঞ্চস্বামী সোহাগিনী দ্রৌপদী তাদের সকল সময়ের সঙ্গী। সকল দুঃখের অংশীদার। আর সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডব বধূ ও পরিজনেরা দ্বারকায় সুখ ও শান্তিতে কালযাপন করছে। এই সুখ ও নিশ্চিত বিলাস তাকে পীড়িত করে প্রতি মুহূর্তে। অর্জুনের বিরহ তার কাছে দুঃসহ লাগে। অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার পর থেকেই তাকে দেখার সাগ্রহ

প্রতীক্ষায় রয়েছে সে। দূতের আগমন সংবাদ শুনেই সে কৃষ্ণের কক্ষে উপস্থিত হল। কিন্তু টের পেল না। তার আগমন কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের আদেশ দৌবারিককে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করল। তার বিব্রত ও সংকুচিত ভাব লক্ষ্য করে সুভদ্রাও লজ্জা অনুভব করল। এই অধিক ব্যগ্রতার জন্য কৃষ্ণ কি মনে করল তাকে সেই ভেবে অস্বাস্তিবোধ করতে লাগল। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলল ঃ ভগিনী উপস্থিত আছে ভ্রাতা। আজ্ঞা করুন অধীনকে।

সুভদ্রার তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কিন্তু তখনও আবেগ বিহ্বলতা কাটেনি তাঁর। অন্যমনস্কের মত অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন ঃ অপূর্ব !

তারপর প্রশান্ত মুখে স্থির দৃষ্টিতে সুভদ্রার দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বললেন ঃ ও ! তুমি, তাহলে এখানেই ছিলে ? ভালই হল, এখন, পত্রখানি পড়ে দেখ।

হাত বাড়িয়ে সুভদ্রা পত্র নিল। কৃষ্ণ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মনে হল দৃষ্টি তাঁর বহুদূরে নিবদ্ধ। তন্ময় হয়ে কৃষ্ণ ভাবছিল। বিরাট রাজ এবং পান্ডবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলে রাজনৈতিক দিক থেকে তার তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অর্জুন ও দ্রৌপদীর বিবাহের মতই অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দুটি বিবাহসভার মধ্যে একটা আশ্চর্য সংগতি রয়েছে। কিন্তু পার্থক্যও আছে। সে কেবল, দেশ কালের। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা ও তাৎপর্য প্রায় এক রকম। তারতম্য বা প্রভেদ নেই বললেই চলে। দুটি বিবাহেরই পান্ডবদের বনবাস শেষ হচ্ছে। এবং আত্মপ্রকাশের এক শুভক্ষণ সূচিত করছে। রাজনীতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য একজন শক্তিশালী রাজার আশ্রয় ও সাহায্য তারা লাভ করছে। হারানো রাজ্য, রাজকীয় মর্যাদার গৌরব ও সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নতুন করে আরম্ভ হচ্ছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনকালে উভয় ক্ষেত্রেই তারা পরাক্রম প্রকাশ করতে দ্রুপদ রাজের মতই মৎস্যরাজকে আত্মপ্রকাশের এক পরম লগ্নে লাভ করেছে। এ এক আশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা।

কিন্তু এরকম একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য যুধিষ্ঠির তাঁকে চিঠি লিখেছে বলে কৃষ্ণের মনে হল না। নিশ্চয়ই রাজনীতির কোন নিগূঢ় সংবাদ আছে এই পত্রে। কিন্তু সে রাজনৈতিক সমাচার কি হতে পারে ? ভাবতে লাগলেন কৃষ্ণ।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সবচেয়ে জটিল সমস্যা হল জোট রক্ষা করা। এ দেশের রাজন্যবর্গ কোন দল, নীতি ও আদর্শ মেনে চলে না। সুবিধাবাদী শ্রেণীর চরিত্র তাদের। যখন যে বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ করছে, দুর্বল ও স্বার্থান্বেষীরা তখন তার অনুগামী হচ্ছে। রাতারাতি শত্রুতা পরিহার করে অনুগত বান্ধব হয়ে উঠছে তার। এদের প্রত্যেকের চরিত্র কৃষ্ণের ভাল করে জানা। তাদের দুর্বলতা, স্খলন, পতন, দৃঢ়তা এবং শক্তি সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত তিনি ! বলতে গেলে নখদর্পণে। এজন্য কুন্তকের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব সংগোপন সংবাদ সরবরাহের একটি কার্যকরী প্রণালী (চ্যানেল) তিনি তৈরী করেছেন। নিয়মিত সংবাদ সরবরাহের সবরকম ব্যবস্থা আছে তাতে। সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, কে বা কারা, তাদের

গতিবিধি, কার্যকলাপ, চিন্তাধারা এবং অভিপ্রায়ই বা কি, সব সংবাদই কৃষ্ণ পুবাহ্নে জানতে পারেন। সে কথা চিন্তা করে যুধিষ্ঠিরের পত্র লেখা খুবই স্বাভাবিক। বিবাহ অনুষ্ঠানে কাকে কিভাবে নিমন্ত্রণ করতে হবে তার পরামর্শ চেয়েই হয়ত যুধিষ্ঠির এরূপ পত্র লিখেছেন। বর্তমান অবস্থার কথা সবিশেষ চিন্তা করে… "অর্থাৎ বিবাহ ও রাজনীতি দুয়ের সম্বন্ধ বিচার করে তাঁকে কর্ত্তব্য নিরূপণ করতে বলেছে! তার মানে বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে পুরো রাজনীতি করা। কিন্তু তাতে যুধিষ্ঠিরের শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যুধিষ্ঠিরের মত শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি সেরকম চিন্তাভাবনা করবেই বা কেন? বোধ হয় বেশি ভেবে তিনি সহজ ঘটনা জটিল করে তুলছেন।"

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখতে পেলেন কৃষ্ণ। পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুতির পরেই নেতৃত্বের যে বদল হল তাতে দুর্যোধন সহজেই যুধিষ্ঠিরের স্থলাভিষিক্ত হল। কিন্তু কর্তৃত্বের সে অধিকার কতখানি তার অধিগত সে অগ্নিপরীক্ষা এখনও হয়নি। পাণ্ডবদের নব-অভ্যুত্থানে যাচাই হবে তার। সেদিক দিয়ে বিচার করলে উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহ তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। মৎস্য রাজকন্যার বিবাহ সংবাদ দূর দূরান্তে রটিয়ে দেবে যে পাণ্ডবেরা জীবিত। তখনই পাপাত্মা দুর্যোধন এবং তাঁর অনুগামী নৃপতিবৃন্দের মধ্যে একটা সংকট উপস্থিত হবে। এতকাল যারা প্রচ্ছন্ন ছিল এবারে তারা কে কোন্ জোটে যাবে বা থাকবে তার একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে হবে তাদের। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের কতজন বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেবে তার হিসাব নিকাশ থেকেই পক্ষে ও বিপক্ষের রাজ্য ও রাজাদের গণনা করা সহজ ও সংক্ষিপ্ত হবে।

যুধিষ্ঠির বুদ্ধিমান, তাই এক সাধারণ পত্রের মধ্যে জটিল দুরবগাহ রাজনৈতিক তাৎপর্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নীতি নির্ধারণের বিষয়টি অবগত করতে বলেছেন তাঁকে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে পাণ্ডবদের মর্যাদা ও গৌরব এত সুদূরপ্রসারী ছিল না। সে সময় তাদের প্রতিপক্ষ ও বিপক্ষ ছিল একমাত্র কৌরবেরা। কিন্তু দিগ্বিজয় ও রাজসূয় যজ্ঞের পর তাদের শত্রুর সংখ্যা অগণ্য। রাজসূয় যজ্ঞকালে যারা ভয়ে এবং পরাজয়ে পাণ্ডবের আনুগত্য ও অধীনতা মানতে বাধ্য হয়েছিল, আজ বিপক্ষ-দলের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে তারাই পুরাতন ক্রোধ ও শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হবে। এর মধ্যে অনেক নৃপতি আছেন যাঁরা কৃষ্ণের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। কৃষ্ণের বিরোধিতা করার জন্যই তারা পাণ্ডবদের প্রধান শত্রু ও বর্তমান ভারত সম্রাট দুর্যোধনের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে এক নতুন রাজনৈতিক জোট গঠন করবে। এবং তাঁদের উপর প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এক জোর রাজনৈতিক তৎপরতা আরম্ভ করবে।

এইসব চিন্তা ভাবনা কৃষ্ণের মনে বিদ্যুৎ ঝলকের মত উদ্ভাসিত হয়েই মিলিয়ে গেল।

পত্রপাঠ শেষ হলে সুভদ্রা কৃষ্ণের দিকে মুগ্ধ ও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক মনে হল তার। উদাস শূন্যদৃষ্টি মেলে আচ্ছন্নের মত অন্যদিকে তাকিয়েছিল কৃষ্ণ। মনে হল বহু দূর গ্রহের অধিবাসী যেন তিনি। ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অন্য মানুষ। কৃষ্ণের এরকম রহস্যময় আচরণ সুভদ্রাকে বিচলিত করল। তার কেমন ভয় করছিল। এর মধ্যে এত কি চিন্তা থাকতে পারে, ভেবে পেল না সুভদ্রা। কৃষ্ণের চিন্তা, আচরণ এবং কার্য সাধারণের মত নয়। তাই সকল সময় বুঝতে পারে না তাঁকে। ভয়ে ভয়ে শুকনো গলায় ডাকল ঃ পার্থসখা !

বহু-বহু দূর থেকে কৃষ্ণ যেন তাঁর মন ও চৈতন্যকে আহরণ করে আনলেন। বললেন—হুঁ !

অবসন্ন কণ্ঠে সুভদ্রা বলল—প্রয়োজন বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তুমি। অত চিন্তার কি আছে ? তুমি ক্ষত্রিয় বীর। আমি নারী। রাজনীতি সমাজনীতি কিছু জানি না। যা ভাল হয় তাই কর।

হঠাৎ যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন কৃষ্ণ। বললেন ঃ তা তো বটেই।

তারপর, কলম নিয়ে পত্র লিখতে বসলেন।

উত্তরার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে গেল চতুর্দিকে। ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তের রাজারা যাতে বিবাহে উপস্থিত হতে পারে তার নির্দেশ পাঠালেন কৃষ্ণ। দূর-দূরান্ত থেকে যেসব নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসবেন তাদের থাকার সবরকম সুবন্দোবস্তের সম্ভাব্য নির্দেশ ছিল পত্রে।

সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টা করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অশ্বশালা, নৃপতিদের গৃহ ও তৎসংলগ্ন অমাত্য ও সভাসদগণের গৃহ নির্মিত হল। দাস-দাসীদের থাকারও ব্যবস্থা হল। আত্মীয় এবং মহামান্য রাজা ও নৃপতিদের পৃথক পৃথক শিবির স্থাপিত হল।

উৎসবের কোলাহলে সর্বত্র পরিপূর্ণ। বিবাহের পূর্বেই দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয় বান্ধব এবং নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ একে একে উপস্থিত হল। তাদের সকলের দেখাশোনা করছিল বিরাট রাজার পুত্র উত্তর। নকুল ও সহদেব সর্বদা সাহায্য করছিল তাকে।

বিবাহের দুদিন আগে মাতুল কৃষ্ণ, ভাগিনেয় অভিমন্যু ও ভগিনী সুভদ্রাকে সঙ্গে করে বিরাট নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বলরাম পাণ্ডবদের অন্যান্য পুত্র পরিজন এবং অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ সত্বাৎ প্রভৃতির সমভিব্যাবহারে চললেন। একসঙ্গে একটা বিশাল বাহিনী মৎস্যরাজ্যে উপস্থিত হল।

রথ এসে দাঁড়াল পুরদ্বারে। পুরোভাগে রইল পদাতিক বাহিনী। তারপর গজবাহিনী। মধ্যভাগে রয়েছে অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ. সত্বাৎ প্রভৃতি বংশীযরা.

মহিলারাও রয়েছে তাদের মধ্যে। এবং সর্বশেষে আছে অশ্বারোহী বাহিনী। আর এই বিরাট বাহিনীর মধ্যভাগে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান অভিমন্যুর রথ। তার পাশে উপবিষ্ট মাতা সুভদ্রা ও মাতুল শ্রীকৃষ্ণ।

তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পুরনারীদের উল্লসিত উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হল প্রাঙ্গন। সুগন্ধ পুষ্প মালাচতুর্দিক থেকে বর্ষিত হতে লাগল। দুন্দুভি বীণা বেজে উঠল।

বিরাট রাজা এগিয়ে গেলেন মাননীয় অতিথি ও আত্মীয়দের অভ্যর্থনা করতে। রথ হতে তাদের অবতরণের সাহায্য করলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে কুশল বিনিময় করলেন। রাজমহিষীরা পুরনারীদের করযুগল ধারণ করে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। বিরাট রাজপরিবারের একজন হয়ে সৈরিন্ধ্রীবেশী দ্রৌপদী, রাজমহিষী সুদর্শনার পাশে থেকে সর্বকার্যে সাহায্য করছিল। সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডব মহিষীদের সঙ্গে সুদর্শনার পরিচয় করে দিল দ্রৌপদী! তারপর রাজমহিষী সুদর্শনা তাদের নিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন তিনি। সবার পিছনে চলল দ্রৌপদী।

আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে স্বস্তিবচন পাঠ করতে লাগল। তন্ত্রধারী ব্রাহ্মণ অভিমন্যুর ললাটে রক্ততিলক এঁকে দিল। ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল। উষ্ণ চুম্বন করে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল। তারপর পূজনীয় ব্যক্তিরা একে একে আশীর্বাদ করল। বিরাট রাজা জামাতার মস্তক আঘ্রাণ করে নবরত্ন খচিত স্বর্ণহার পরিয়ে দিলেন তার কণ্ঠে। কুলপ্রথা অনুযায়ী উত্তর অভিমন্যুকে কোলে করে রথ থেকে নামাল। তারপর মণি, রত্ন খচিত স্বর্ণ শিবিকা করে তাকে বিবাহ সভায় নিয়ে গেল।

বিরাট রাজার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণ দেখলেন সমস্ত আয়োজন। পরিশেষে বিবাহ সভায় উপস্থিত হলেন। স্থাপত্য কৌশল ও ভাস্কর্যের দিক থেকে এই সভাগৃহ দ্রুপদ রাজার স্বয়ম্বর সভা থেকে কোন অংশে ন্যূন নয়। চারুকলার নয়নাভিরাম দৃশ্য ও ঐশ্বর্যের সমন্বয়ে অপূর্ব।

কিন্তু এই সভায় কৌরবদের দেখতে পেলেন না কৃষ্ণ। পিতামহ ভীষ্ম অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, মহামতি বিদুরও অনুপস্থিত। ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, কম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ, মহিষ্মতির রাজা নীল, অবন্তীদেশের বিন্দু, ত্রিগর্ত দেশীয় সত্যরথ, কোশলরাজ বৃহদ্বল, প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রভৃতিদের আসনগুলি শূন্য। সেজন্য একটুও অবাক হলেন না কৃষ্ণ। শত্রুতা ও বিরোধিতার প্রচ্ছন্ন ইংগিত পেয়ে মনে মনে খুশী হলেন। এরা কোনদিনই যুধিষ্ঠিরকে প্রীতির চোখে দেখে না। জরাসন্ধ ঘেঁষা গোষ্ঠীর লোক এরা। প্রথম থেকেই এদের কাউকে তিনি হিসেবের মধ্যে গণ্য করেননি। এদের বিশ্বাস করা যায় না। নীতি ধর্ম মানে না তারা। তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে বিদ্বেষ, আনুগত্যের মধ্যে প্রতিহিংসা, ত্যাগের মধ্যে লোভ, মৈত্রীতে বৈরীতা, বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা। এরূপ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ রাজনীতিতে পরিহার করে চলাই মঙ্গল। সেদিক দিয়ে তারা অতিথি না

হয়েই ভাল করেছে কৃষ্ণ নিজেও এদের পছন্দ করেন না। দৃষ্টি তাদের অত্যন্ত সংকীর্ণ। লোভে তারা ক্ষুধার্ত, হিংসায় নিষ্ঠুর! তাই তাদের চিত্ত দুর্বল ও অস্থির। ইতিহাস তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার নির্মম বিচারক।

অভিমন্যুর বিবাহ সভাতে প্রমাণ হয়ে গেল সম্রাট যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভারতের রাজন্যবর্গের রাজ-আনুগত্য শিথিল হয়েছে। ক্ষমতায় যুধিষ্ঠিরের পুনঃপ্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা খুব কম বলে মনে করে। দুর্যোধনই এখন রাজ ক্ষমতা দখল করে আছে। বৃহৎ শক্তির কর্তৃত্ব তার হাতে। সে-কারণে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে সকলেই ভয় পায়।

তাহলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও কর্তৃত্বের মূল লড়াইটা হবে ভাইয়ে ভাইয়ে। বন্ধুতে বন্ধুতে। অসীম রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে এক অচেনা অজানা ভবিষ্যৎকে কৃষ্ণ দিব্য চোখে প্রত্যক্ষ করলেন। ভারতের রাজনীতিতে আত্মঘাতী এক অন্তর্যুদ্ধ শীঘ্রই প্রবল আকার ধারণ করবে। সে মহা সর্বনাশ থেকে কারও নিস্তার নেই। পলায়নেরও উপায় নেই। নিশ্চিত এবং অবধারিত মৃত্যু সকলকে বরণ করতে হবে। এ এক আশ্চর্য বিধিলিপি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অজ্ঞাতবাস নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পর হস্তিনাপুরে দূত পাঠানোর কথা চিন্তা করছিলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু দুর্যোধনের কু-অভিসন্ধি তাঁর অজ্ঞাত নয়। সে-কারণে দুর্যোধন সম্পর্কে একটা গভীর অবিশ্বাস ও সংশয় তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই, এতটুকু স্বস্তি ও শান্তি নেই যুধিষ্ঠিরের মনে। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় তাঁর কাল অতিবাহিত হয়। দুর্যোধনের পুনরায় রাজ্য প্রত্যার্পণের ইচ্ছা আছে বলে মনে হয় না তাঁর। সর্বপ্রকার অধিকার থেকে পাণ্ডবদের বঞ্চিত রাখাই তার রাজনীতি। এরূপ অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের কর্তব্য নির্ধারণ করা দুরূহ হল। পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ এবং অন্যান্য আত্মীয়, বান্ধব ও অনুগত রাজাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করার একটা প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি।

অভিমন্যুর বিবাহ অনুষ্ঠানে সেই সুযোগ মিলল। দীর্ঘ তেরো বছর পর আত্মীয় ও মিত্রদের সঙ্গে পুনর্মিলন হল। সবাইকে এক সাথে পেয়ে পাণ্ডবেরা আনন্দে আত্মহারা। তারাও খুশী হল অত্যন্ত। মিলনকালে তাদের ইচ্ছা ও মনোভাব সহজেই জানতে পারল পাণ্ডবেরা। তার ফলে, পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ কি হবে বা হওয়া উচিত তা নিয়ে একটা ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ লাভ করল। কৃষ্ণের নির্দেশানুসারে যুধিষ্ঠির একটি গোপন মন্ত্রণাসভার আহ্বান করলেন।

বিরাটের মন্ত্রণাগৃহে রুদ্ধ দ্বার কক্ষে সে বৈঠক বসল। সভায় বিশেষ অতিথির নির্দিষ্ট আসনে কৃষ্ণ উপবেশন করলেন। হাতের উপর মাথা রেখে কৃষ্ণ গভীর

চিন্তায় নিমগ্ন। ক্রূরস্বভাব মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন এবং ততোধিক ক্ষুদ্রমতি কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রের বশে। সুতরাং তাদের কাছে পাণ্ডবদের স্বার্থ ও অধিকার কোন অবস্থায় রক্ষা হবে বলে মনে হল না তাঁর। পাণ্ডবেরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রেরা মনে করত সমগ্র রাজ্যের অধিকারী তারাই। নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্য ভোগ করার জন্যই অজ্ঞাতবাসের শর্ত রেখেছিল। কিন্তু এরকম একটা কঠিন পরীক্ষায় তারা যে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবে এ ছিল তাদের কল্পনাতীত। সে যাই হোক, তের বছর ধরে যে রাজ্য ভোগ করল, তার উপর একটা স্বত্ব এবং লোভ জন্মে গেছে দুর্যোধনের। এ অবস্থায় রাজর্ষি ছাড়া অন্য যে-কোন সাধারণ রাজার পক্ষে তার লোভ ও মোহ ত্যাগ করা সুকঠিন। কাজেই, শান্তিপূর্ণ মীমাংসা অসম্ভব। যুদ্ধই অনিবার্য। তবু, চেষ্টার ত্রুটি না রাখাই ভাল বলে কৃষ্ণ মনে করেন।

সকলের আসন গ্রহণ শেষ হলে সভার কার্য আরম্ভের জন্য যুধিষ্ঠির উঠে দাঁড়ালেন। কোনরূপ ভূমিকা না করে সভাস্থ সুহৃদবর্গকে সম্বোধন করে বললেন: সুহৃদবৃন্দ, অগ্রে আপনারা প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনারা জানেন, সত্য, ধর্ম রক্ষার জন্য আমরা কত কষ্ট করেছি। ধর্মতঃ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছি। এখন আমাদের নিজ নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চাই। এ অবস্থায় আমার করণীয় কর্ম নির্দেশ করে উপকৃত করুন। কৌরবদের সঙ্গে পূর্বে আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল তাও অব্যাহত থাকবে শান্তিও স্থাপিত হবে, এমন ব্যবস্থা করুন।

যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব শুনে সভাস্থ ব্যক্তিরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। সাহস করে কেউ কিছু বলছে না দেখে কৃষ্ণ নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। এবং কোনরূপ বাগাড়ম্বর না করে স্পষ্ট ভাষায় বললেন: সজ্জনবৃন্দ, পাণ্ডবদের আপৎকাল উপস্থিত! আমরা সকলেই তাদের বন্ধু আত্মীয়। আমাদের প্রত্যেকের কিছু কিছু কর্তব্য আছে। বোধ হয় সেই দায়িত্ব গ্রহণের সময় এখন হয়েছে। ব্যাঘ্র শিশু রক্তের স্বাদ পেলে আরও হিংস্র ও বন্য হয়ে ওঠে। তেমনি দুর্যোধন বিপুল ক্ষমতা ভোগ করে গর্বে, দম্ভে অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্মরাজের অধিকার ফিরিয়ে দেবে বলে প্রত্যয় হয় না আমার। ধর্মতো ও ন্যায়েতো সে রাজ্য যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য! কিন্তু রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছা দুর্যোধনের নেই। ধর্মরাজের নামে নানা অপবাদ রটাচ্ছে এবং নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করছে। এ অবস্থার আমাদের নীরব থাকা উচিত নয়। আপনারা একজোট হয়ে তার পাশে দাঁড়ান। এবং মিত্রের ন্যায় আচরণ করুন। সত্য, ন্যায় ও ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করুন। বলা বাহুল্য, দুর্যোধনের বর্তমান অভিপ্রায় আমরা অবগত নই। তবু, চূড়ান্ত কর্তব্য কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাঁর কাছে দূত প্রেরণ বিধেয় বলে মনে করি।

কৃষ্ণের বাক্য সবাই একত্রে অনুমোদন করল। কেবল, বলরাম অন্য কথা বলল। সুরাপানে তার দুই চক্ষু ছিল আরক্ত। তন্দ্রায় বিজড়িত। নিরীহ ভালমানুষের মত সোজাসুজি বলল: বাসুদেব অবশ্য ভালই বলেছে। কিন্তু রাজ্য এখন

দুর্যোধনের। তাকে চটিয়ে স্বার্থ বিরুদ্ধ কোন কাজ করা ঠিক হবে না। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে কৃষ্ণের মাতামাতি আমার ভাল লাগে না। আমরা এসেছি বিবাহ সভায়। নিমন্ত্রণ রক্ষাই আমাদের কাজ। অতিথির মত আসব এবং যাব, ব্যাস্। যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন উভয়েই আত্মীয় আমার। আমি অধর্ম করতে পারব না। যা সত্য তাই বলব। দুর্যোধন দ্যূতক্রীড়ায় পণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সিংহাসন সব জিতেছে। দোষ যুধিষ্ঠিরের। অক্ষ খেলায় দান পর্যন্ত ফেলতে শেখেনি সে। অথচ খেলতে গেল এক পাকা খেলুড়ে শকুনির সঙ্গে। হেরেছে বেশ হয়েছে। এজন্য আমার শিষ্য দুর্যোধন একটুও দায়ী নয়। দোষী যখন নয় তখন যুধিষ্ঠিরকে কেন রাজ্য ফেরৎ দেবে? অবশ্য যুধিষ্ঠির যদি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারে, তাহলে তো খুবই ভাল হয়। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের কারও অকারণে নাক গলানো উচিত নয়।—তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের এইসব দলাদলি আমি ঠিক বুঝি না। তোমাদের জোটের মধ্যে ঘোঁটের মধ্যে আমি নেই। কৃষ্ণ আমায় বেশ শান্তিতে এবং নিশ্চিন্তিতে রেখেছে।

বলরামের উক্তি সকলেই উপভোগ করল। নির্মল কৌতুক আনন্দ লাভ করে মজা পেল। কিন্তু কৃষ্ণ তাদের হাসিতে যোগ দিল না। বিস্ময়ে গম্ভীর হলেন তিনি। মাতালের প্রলাপ মনে করে হলধরের উক্তিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করতে পারলেন না। তাঁর কথায় যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তবু সব সময় সত্য কথা বলা যায় না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু বলরাম সে কথা স্মরণ রাখেন না বলেই কৃষ্ণকে সমস্যায় পড়তে হয়। তেমনি একটি সমস্যার উদ্ভব হল। বলরামের সরল সত্য উক্তি অনেককে বিভ্রান্ত করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। যুধিষ্ঠিরের সরলতা, তার প্রবল ধর্ম বিশ্বাস এবং ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে দুর্যোধন তার স্বার্থ ও অধিকার হরণ করেছে। ছল, চাতুরী, প্রতারণা অবশ্য রাজনীতির অঙ্গ। রাজনীতির গোড়ার কথাই হল শত্রুকে শক্তিশালী হতে না দেয়া। সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষকে যে কোন উপায়ে নির্মূল করার নামই রাজনীতি। এর মধ্যে সত্য মিথ্যা ন্যায়, অন্যায় পাপ পুণ্যের স্থান নেই। এ হল কৌশল। সুতরাং সে বিচারে দুর্যোধন অপরাধী নয়। কিন্তু যুধিষ্ঠির কেন তার পরাজয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ যুধিষ্ঠির তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। এখন দুর্যোধনের উচিত স্বেচ্ছায় তাঁর রাজ্য তাঁকে প্রত্যার্পণ করা। কিন্তু ঘুণাক্ষরে সে কথা প্রকাশ করল না। জ্যেষ্ঠের পক্ষপাতিত্ব ক্ষুব্ধ করল তাঁকে।

কৃষ্ণকে নীরব দেখে সাত্যকি পানোন্মত্ত বলরামকে মৃদু তিরস্কার করে বলল: যেমন তোমার স্বভাব, তেমনি তোমার কথা। যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতে পরাজিত হয়েও তার পণরক্ষা করেছেন। রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দুর্যোধনের কাছে করজোড় করে আবেদন, নিবেদন, অনুনয়, বিনয় করাকে আমি ঘৃণা করি। এ সব করলে রাজার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। স্বেচ্ছায় দুর্যোধন রাজ্য প্রত্যর্পণ না করলে যুদ্ধ করেই আমরা তা উদ্ধার করব।

দ্রুপদরাজ তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ মহামতি সাত্যকির সঙ্গে আমি একমত। ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিকে অনুনয় করা সাজে। কিন্তু দুষ্টমতি, অধর্মচারী দুর্যোধনকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করা যাবে না। বিনয় ও আবেদনকে তারা পাণ্ডবের দুর্বলতা বলে মনে করবে। আমার তো মনে হয় কালবিলম্ব না করে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ প্রবৃত্ত হওয়া ভাল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মিত্র-রাজন্যবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করে অনতিবিলম্বে তাঁদের নিকট দূত প্রেরণ প্রয়োজন। সাধারণতঃ অগ্রে যিনি সাহায্য-প্রার্থী হন, নৃপতিরা তাঁরই পক্ষালম্বন করেন :

বিরাট রাজা বললেন ঃ আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। রাজনীতিতে ক্রোধ, অভিমান বলে কিছু নেই। যে কোন উপায়ে কার্যসিদ্ধি করাই রাজনীতির লক্ষ্য। অবশ্য প্রত্যেকে তার নিজস্ব নীতি ও আদর্শ অনুসারে কর্মপন্থা ও কৌশল স্থির করে। তাই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সব রকম প্রয়াস রাজনীতিতে স্থান পায়। এ সব কূটনীতির এক একটা অংশ। সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্ন নিয়ে মান অভিমান না করে রাজনৈতিক জয় পরাজয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই অধিক লাভজনক। এরূপ কর্মপ্রয়াসের ফলে অনেক সময় শত্রুপক্ষীয় মিত্র রাষ্ট্র নিরপেক্ষ রাজনীতি আশ্রয় করে। কিংবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কালক্ষেপ না-করে আমাদের উচিত, একটা সঠিক কর্মনীতি নির্ধারণ করা। পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ তার ভার গ্রহণ করুন। তারপর, আপনারা যদি অনুমতি করেন তাহলে আমার সভাপণ্ডিতকে কৌরবসভায় দূত রূপে পাঠাতে পারি। মিত্ররাষ্ট্রদের বন্ধুত্ব ও সাহায্য লাভের জন্য শীঘ্রই আমাদের সর্বত্র দূত প্রেরণ করা আবশ্যক।

এতক্ষণ পর কৃষ্ণের অধর মৃদু হাস্যে রঞ্জিত হল। খুশী হয়ে বললেন ঃ উত্তম প্রস্তাব। যারা সংঘাতের জন্য তৈরী এবং সংঘাতের উত্তেজনা ছড়ানো যাদের নীতি তাদের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা প্রকৃষ্ট রাজনীতি। হিংসা কেবলই নতুন হিংসার জন্ম দেয়। তাই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে যেতে হবে। দুর্যোধন লোভ, হিংসায়, অহংকার, দম্ভে অন্ধ হয়ে যদি সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আপনি ও ধর্মরাজ আমাদের আহ্বান করবেন। সভার কার্য আজ এখানেই সমাপ্ত করাতে মহারাজকে অনুরোধ করছি।

অতঃপর সব নৃপতিরা তাঁদের স্ব-স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল। কৃষ্ণও ফিরে গেলেন দ্বারকায়! মৎসরাজ্যে আবার পূর্বের গতানুগতিক জীবনযাত্রা ফিরে এল। রাজনৈতিক যোগাযোগ দ্রুত করার ব্যবস্থা হল। দ্রুপদ রাজ ও বিরাট রাজ উভয়েই জামাতাদের স্বার্থে তার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পঞ্চপাণ্ডব তাদের কার্য ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করল। কৌরবেরাও বসে থাকল না। তারাও সৈন্য সংগ্রহে সর্বত্র দূত প্রেরণ করতে লাগল।

কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই অর্জুন এল সেখানে। কৌরব ও পাণ্ডবের আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনায় চতুর্দিক অস্থির। কৃষ্ণকে সেইসব সংবাদ দিতে এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করতেই অর্জুন গেল কৃষ্ণের কাছে।

পাণ্ডবদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর দুর্যোধনের সজাগ দৃষ্টি। নিয়মিত সংবাদ সরবরাহের জন্য প্রচুর গুপ্তচর নিযুক্ত হল। কৃষ্ণ ও বলরামের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তনের সংবাদ সে পূর্বাহ্ণেই সংগ্রহ করেছিল। আত্মীয়তার দাবি নিয়ে তাঁদের উভয়ের সাহায্যের জন্য দুর্যোধন দ্বারকায় যাওয়া স্থির করল। কিন্তু আজ-কাল করে কেবলই দেরী হচ্ছিল। অবশেষে, সংবাদ এল অর্জুন দ্বারকায় রওনা হয়েছে। দুর্যোধন আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করে দ্রুতগামী রথে দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কিন্তু অর্জুনের আগে পৌঁছনো তা সম্ভব হল না। রথ থেকে নেমেই সে অর্জুনের খোঁজ নিল। তার পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে সে আর বিলম্ব করল না। চুপি চুপি কৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করল।

সুসজ্জিত মনোরম কক্ষ। অগুরু চন্দনে সুবাসিত। দেয়াল গাত্রে নয়নাভিরাম বিচিত্র-বিচিত্র চিত্র অংকিত। কর্মযোগী কৃষ্ণের বিশাল কর্মময় জীবনের বহুবিধ ঘটনার ছবি রুক্মিণী বিশিষ্ট শিল্পীদের দিয়ে নিজের মনের মত করে আঁকিয়ে টানিয়েছে। প্রত্যেকটি ছবিই রঙ ও রেখায় অপূর্ব। লৌহ কারাগারে বন্দী নির্যাতিত বসুদেব ও অসহায় জননী দেবকীর সকরুণ আঁখি, কংসের নিকট দুঃখিনী মায়ের প্রাণভিক্ষা, সুদর্শন চক্র হস্তে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণের অনলবর্ষী দৃষ্টির সম্মুখে মৃত্যুভয়ে ভীত কংসের বিবর্ণরূপ, পর্বতগুহার অভ্যন্তরে রাজর্ষি মুচকন্দের নয়নবহ্নিতে দগ্ধ কালযবনের প্রাণহীন দেহপার্শ্বে উপবিষ্ট কৃষ্ণের অশ্রুবর্ষণ, প্রজ্বলিত খাণ্ডব বনে কৃষ্ণার্জুনের অগ্নিবরণ রূপ এবং জরাসন্ধ ও ভীমের মল্লযুদ্ধে কৃষ্ণের দর্শকরূপে উপস্থিত প্রভৃতি চিত্রসমূহ দেখতে পেল দুর্যোধন।

কক্ষে প্রবেশ করে দেখল কৃষ্ণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। কৃষ্ণের প্রসন্ন প্রশান্ত মুখের স্নিগ্ধ রূপ ও লাবণ্যে বিমোহিত হল দুর্যোধনের হৃদয়। কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য অন্তরের মধ্যে এক সুগভীর পিপাসা জেগে উঠল তার। মনে হল, কৃষ্ণকে জয় করলে বিশ্ব তার বশীভূত হবে। কিন্তু এখন মনে উদ্বেগ, বুকে শঙ্কা। ভয় অর্জুনকে! সে এলে সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়। অর্জুনের আগমনের পূর্বেই যদি কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় তাহলে পাণ্ডব সখা কৃষ্ণকে পাবে না যুধিষ্ঠির। পাণ্ডবদের গর্ব আস্ফালন শক্তি হবে নিস্ফল! শকুনি ও কৃষ্ণের বুদ্ধি সমন্বয় হলে পাণ্ডবেরা আবার ভিখারী হবে। বনবাসেই শেষ হবে তাদের জীবন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল দুর্যোধন। দেয়াল চিত্রগুলির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল। আর, কেমন একটা ভয়ে ও ভাবনায় তার কণ্ঠ তালু শুকিয়ে আসছিল। দুর্যোধন বসার জন্য ব্যস্ত হল। কিন্তু ছিমছাম কক্ষে উপবেশনের কোন আসবাবপত্র ছিল না। কেবল একটি পালঙ্ক ছিল প্রশস্ত কক্ষের মধ্যস্থলে। কৃষ্ণ সেখানে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁর শিয়রের পাশে অবশ্য একটি সুন্দর মণিরত্ন

খচিত মনোরম আরাম কেদারা ছিল। বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কৃষ্ণ নিজে সেই কেদারাটি ব্যবহার করেন। তাতে উপবেশন করতে দুর্যোধন একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ প্রতিক্ষায় অটল থাকতে পারল না। সব দ্বিধা, সংকোচ ত্যাগ করে সে শিয়রদেশে রক্ষিত কেদারায় উপবেশন করল।

এমন সময় অর্জুন সেখানে এল। উৎকৃষ্ট আসনে দুর্যোধনকে উপবিষ্ট দেখে সে একটু অবাক হল। দুর্যোধন খুবই দাম্ভিক এবং অহংকারী। তার পক্ষে এই রকম আচরণ করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য অর্জুনের মুখে কোন ভাব প্রকাশ পেল না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে পালঙ্কে কৃষ্ণের পাদদেশের দিকে উপবেশন করল।

অর্জুন এবং দুর্যোধনের আগমন বার্তা কৃষ্ণ পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছিলেন। তাই, ইচ্ছে করেই কপট নিদ্রার অভিনয় করতে হয়েছিল তাঁকে। দুর্যোধনের চরিত্র ও স্বভাব কৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়। তার, কথা মনে রেখেই শয়নকক্ষ সাজানো হয়েছিল। দুর্যোধন যেহেতু দাম্ভিক এবং অহংকারী সেহেতু পালঙ্কে উপবেশন করবে না। তাই, কৃষ্ণ মনোরম একটি আরাম কেদারা রেখেছিলেন শিয়রের পাশে। তিনি জানতেন, দুর্যোধন এই আসন ছাড়া আর কোথাও বসবে না। অর্জুনের অভিলাষিত প্রার্থনা পূরণের জন্যই কৃষ্ণ এই কৌশল করলেন।

জাগ্রত হয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথম দেখলেন। তারপর, পিছন দিকে তাকিয়ে দুর্যোধনকে দেখলেন। মৃদু হেসে উভয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সহাস্য বদনে বললেন ঃ কি হেতু তোমরা এসেছে ?

অর্জুনের প্রত্যুত্তরের পূর্বেই দুর্যোধন বলল ঃ কৃষ্ণ, আসন্ন কুরু-পাণ্ডবের মহারণে তুমি আমার সহায় হও। অর্জুনের পূর্বেই আমিই এসেছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিকে বরণ করে থাকেন।

দুর্যোধনের বাক্যে অর্জুনের শ্বাসরুদ্ধ হল। প্রস্তরীভূত প্রায় অবস্থা তার। নিমেষহীন দৃষ্টি। উন্মুক্ত প্রায় ওষ্ঠে নিষেধের ইংগিত। কৃষ্ণের দৃষ্টি এড়াল না। কিছুক্ষণ প্রিয় বন্ধুর দুর্দশাটা উপভোগ করে মৃদু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন ঃ চক্ষু উন্মীলিত করে আমি পার্থকেই প্রথম দেখলাম। সুতরাং তার অভিলাষ আগে জানব। তারপর তোমার কথা শুনব দুর্যোধন। বলাবাহুল্য তোমাদের দুই ভ্রাতাকেই সাহায্য করব আমি।

অর্জুনের দুই চক্ষু আনন্দে দীপ্ত হল। কৃষ্ণ চাতুরী করে যে তাকে অগ্রাধিকার দিল এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ছিল না অর্জুনের। মনের মধ্যে উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস জেগে উঠল তার। অর্জুনের সে বিহ্বল অবস্থা গভীর হওয়ার আগেই কৃষ্ণ তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কিভাবে সাহায্য করতে পারি বল ? তবে মনে রেখ, একপক্ষ পেতে পারে আমার সমযোদ্ধা দশকোটি নারায়ণী সেনা এবং অন্যপক্ষ শুধু আমাকে পাবে। কিন্তু যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না আমি। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন ঃ এ দুয়ের মধ্যে কোনটি তোমার গ্রহণযোগ্য বল ?

কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনে মনে মনে খুশী হল দুর্যোধন। তাকে নিয়ে ভয়

ছিল তার। এখন নিশ্চিন্ত হতে পারল। কিন্তু স্থির হতে পারল না। অর্জুন যদি কৃষ্ণের সমকক্ষ দশকোটি নারায়ণী সেনা দাবি করে তাহলে তার আসাই নিরর্থক হবে। অর্জুনকে দশকোটি নারায়ণী সেনার সাহায্যের জন্যই হয়ত কৃষ্ণ কৌশলে অর্জুনের দাবি প্রথম শুনতে আগ্রহী হলেন। সমর-কুশলী সৈন্যবল যার যত বেশি, যুদ্ধে তার জয় সুনিশ্চিত হয়। কুটিল চিন্তার অব্যক্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার রেখাগুলি দুর্যোধনের মুখাবয়বে স্পষ্ট ও গভীর হল।

ভ্রূকুটির অর্থ বুঝল অর্জুন। কিন্তু দুর্দিনের বন্ধু পাণ্ডবের পরম হিতৈষী কৃষ্ণকে যে-কোন মূল্যে গ্রহণ করতে অর্জুন কৃতসংকল্প। সেজন্য তার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। কণ্ঠস্বরেও ছিল না কোন আড়ষ্টতা। কৃষ্ণের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলল ঃ আমি তোমাকেই বরণ করলাম সখা।

একটা শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেল দুর্যোধন। সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তার। কৃষ্ণার্জুন চকিতে ফিরে তাকাল সেদিকে। দুর্যোধনের মনে হল, ইন্দ্রপ্রস্থের মত পুনর্বার সে যেন কৌতূহল ও কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠেছে। ভীষণ লজ্জা লাগল তার। সুগোপন ইচ্ছাটা তার যেন প্রকাশ হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ! কৃষ্ণ এবং অর্জুন তাকে কি মনে করল? ভেবে আকুল হল। অনুতাপে কষ্ট ভোগ করতে লাগল! লজ্জায় মাথা তুলতে পারল না। মাথা নত করে প্রায় অর্ধস্ফুট-স্বরে বলল ঃ কৃষ্ণ!

হাসলেন কৃষ্ণ। তাঁর সেই নিজস্ব অভ্রান্ত হাসি। বললেন ঃ তা-হলে নারায়ণী সেনা নিয়ে আজই তুমি যাত্রা করতে পার।

কৃষ্ণের বাক্যে উৎফুল্ল হল দুর্যোধন। ক্ষণমাত্র অপেক্ষার প্রয়োজন বোধ করল না আর। কৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করে ঝড়ের বেগে প্রস্থান করল। তার গন্তব্য পথের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন কৃষ্ণ। রহস্য কুটিল হাসিতে বঙ্কিম হল তাঁর অধর। কিন্তু পলকের জন্য সে। অর্জুনের সতর্ক ও সচেতন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না কৃষ্ণ। অকারণ বিপদ আশংকায় অর্জুনের অন্তর ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত হল। কৃষ্ণ তার ভীরু, গম্ভীর বিষণ্ণ মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলেন। মুখে তাঁর দুর্বোধ্য প্রসন্নতা। শান্ত ও মধুর স্বরে কৃষ্ণ বললেন ঃ পার্থ, তোমাকে বুদ্ধিমান বলে জানতাম। এখন দেখছি তুমি অতিশয় নির্বোধ। নিষ্কর্মা বন্ধুকে নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের মহারণে কি করবে? বোঝার মত বইতে হবে তাকে।

অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে বলল ঃ তোমার তুল্য ব্যক্তি নেই। আপৎকালে পাণ্ডবের দরকার একজন জ্ঞানী মন্ত্রণাদাতা এবং বিচক্ষণ নেতা। ভাল নেতৃত্ব ছাড়া যুদ্ধ জয় অসম্ভব। দেশ ও জাতির শ্রী ও সমৃদ্ধির জন্য তোমার মত প্রজ্ঞাবান নেতার আবশ্যক। তাই, তোমাকে আমার দরকার। তুমি পাশে থাকলে তেজ ও বলে সমস্ত কৌরবদের বধ করতে পারি আমি। তোমার বন্ধুত্ব, তোমার পরামর্শ হবে আমার পাথেয়। আর যুদ্ধে আমার সারথী হবে তুমি। আমার এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করে চরিতার্থ কর আমায়।

অর্জুনের বাক্যে আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। অব্যক্ত আনন্দের শিহরণে সারা দেহ

রোমাঞ্চিত হল। কৃতার্থ হয়ে কৃষ্ণ বললেনঃ বড় নিবিড় বাঁধনে বাঁধলে সখা। তোমাকে ছেড়ে থাকার উপায় রইল না। তোমার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণ প্রয়োজনে সবই করবে।

কৃতজ্ঞচিত্তে অর্জুন বলল ঃ ধন্য ধন্য সখা! কৃতার্থ পার্থ আজ। আলিঙ্গন দাও হে সখা তোমার!

অর্জুন প্রস্থান করলে কৃষ্ণের মন অকারণে বিষণ্ণ হল। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়ার জন্য কক্ষমধ্যে আপন মনে পায়চারি করতে লাগলেন।

আকাশ ভরা তারার মৌন কৌতূহলী দৃষ্টি যেন আসন্ন মহাযুদ্ধের অজানা রহস্যকে দেখার জন্য লোভী হয়ে উঠেছে। এই শান্ত সন্ধ্যাই কৃষ্ণকে সারাজীবন বিচলিত করে। রাত্রির জমাট অন্ধকারের মধ্যে জীবন ব্যাপ্ত হতে পারে না। তাই সন্ধ্যায় জীবন রহস্য ঘন হয়ে ওঠে। সৃষ্টির প্রতি কোণ্ হতে বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা অন্ধকারের কালো চাদরে মুড়ি দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। সময়ই বড় দ্রষ্টা। সে ভীষণ নিরপেক্ষ। কাউকে ভালবাসে না, কাউকে ঘৃণা করে না, কেবল প্রবল বেগে আকর্ষণ করে। কালের সুতীব্র আকর্ষণ কৃষ্ণ মনে মনে অনুভব করলেন। কেমন একটা অস্থিরতা পেয়ে বসল তাকে। অনেক ঘটনা, অনেক মানুষ, অনেক বৈচিত্র নিয়ে তাঁর জীবন। এ জীবন আদায় করে নিয়েছে অনেক। কিন্তু প্রতিবারেই দিয়েছে নিত্য নূতনের আস্বাদ। কর্মে ও ভাবনায় এনেছে উম্মাদনা। বারে বারে এ জীবন তাঁর হাতে লাভ করেছে এক নূতন রূপ। রূপকার করেই বিধাতা সৃষ্টি করেছেন তাঁকে।

'রূপকার' উচ্চারণ করলেন বারবার। রাত জাগা পাখীর একটানা চিৎকার মনের মধ্যে উপদ্রব বাঁধাল। পাখীর কর্কশ স্বর 'রূপকার' শব্দটাকে যেন বিদ্রূপ করল। প্রেম ও মহত্বের আদর্শ স্থাপন করে যে অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ছিল তাঁর, দুর্যোধন তাকে ভেঙে তছনছ করতে উদ্যত হল। প্রকৃতপক্ষে, সে জরাসন্ধের উত্তরাধিকার। পাণ্ডবদের সম্মুখে রেখে কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করছে।

ভারতবর্ষে একটা বিশেষ মিলনাত্মক ঐতিহ্য ছিল। তার বিশেষত্ব হল বহুকে এক করার। এককে বহু করার নয়। তাই, মানুষ ও রাষ্ট্রের মূলে স্বার্থগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন তিনি। সেবার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করেছে এমন একজন ব্যাক্তির অন্বেষণে দীর্ঘদিন কেটেছে তাঁর। তারপর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় সাক্ষাৎ হল সেই মহানায়কের সঙ্গে। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁকেই দিয়েছেন বহু স্বার্থের মিলনভূমি রচনার নেতৃত্ব। বিশ্বাস, প্রেম, মৈত্রী, সহযোগিতা ও সহবস্থানের মহাজাতি সংঘ গঠনের এক আদর্শ পুরুষ তিনি। একমাত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যেই বহু মানুষের বহু মত ও পথের মিলিত সংগঠন তৈরী হতে পারে। আদর্শের জন্য, ধর্মের জন্য, নীতির জন্য, যে দুরূহ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার দরকার একমাত্র যুধিচিঠর ও তার ভাইদের দ্বারাই সম্ভব। তাই, বিপুল উৎসাহে যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে এক নতুন ভারতবর্ষ গঠনে উদ্যোগী হলেন। ভারতবর্ষের সর্ব প্রান্তের

মানুষকে যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্যের রাজছত্র তলে একত্রিত করে দেশগঠন করতে পারলে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে নতুন চেতনা আসবে, নতুন গণজাগরণ ঘটবে। দেশে দেশে গণরাজ্য স্থাপিত হবে। যুধিষ্ঠির হবেন তার অধিনায়ক। এর ফলে, পারস্পরিক বিভেদ বিদ্বেষের অবসান হবে। বহু দলের ও বহু স্বার্থের মিলিত কর্মপ্রয়াস রাজনীতিতে নতুন জীবন স্পন্দন ঘটাবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন রাজনীতির সূচনা হবে। সামগ্রিকভাবে যার নাম হবে প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্র।

কিন্তু? চিন্তার ছন্দপতন হল কৃষ্ণের। বাসা ছাড়া পাখি ধায় কোন্ অন্ধকারে? লক্ষ্যহীন অন্তহীন যাত্রা তার? আপনাকেই প্রশ্ন করলো কৃষ্ণ। প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে দুর্যোধন এই বিশুদ্ধ মানুষটিকে নানাভাবে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও বঞ্চিত করে এক ভীরু কাপুরুষে পরিণত করেছে। কর্মে তাঁর দ্বিধা, মনে তাঁর সংশয়। আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে তিনি ভীরু। দুর্যোধন ধর্মরাজের এই ভীরুতা অবহিত হয়েই তাঁকে সবংশে সংহার করতে উদ্যত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের পতনের অর্থ, ন্যায়, ধর্ম ও সত্যের মৃত্যু। অখণ্ড ভারতরাজ্য গঠনের স্বপ্ন ও শ্রমের সমাধি। কিন্তু মানুষ তার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। স্বপ্ন ফুরিয়ে গেলে জীবন হয় অর্থহীন। মরুভূমির মত রুক্ষ ও রিক্ত।

সারা রাত্রি ধরে তিনি অস্থির উত্তেজনা ভোগ করলেন। ভোরের আলো ফুটতেই সারথিকে রথ প্রস্তুতের নির্দেশ দিলেন। এবং অল্পকালের মধ্যে রথে আরোহণ করলেন। রথ চলল বায়ুবেগে।

দু'পাশে বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ছুটতে লাগল রথ। বহু পার্বত্য পথ অতিক্রম করে অবশেষে কৃষ্ণ এসে উপনীত হল উপপ্লব্য নগরে। রথ সরাসরি এসে থামল পাণ্ডব শিবিরে।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। অস্তগামী সূর্যের রশ্মির আভায় আকাশ রক্তবর্ণ। সন্ধ্যার কৃষ্ণ ছায়া দিগন্তের কোলে ক্রমে ক্রমে গাঢ় হচ্ছে। পাখীরা প্রাণপণ ছুটছে নীড়ের সন্ধানে। ধ্রুবতারা জেগে উঠেছে পূর্ব দিগন্তের শেষে। নীল আকাশ রাত্রির মত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিমুহূর্ত নতুন তারারা জন্ম নিচ্ছে আকাশে। নিবিড় কালো অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য যেন বেশী করে প্রতিভাত হচ্ছে।

রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন কৃষ্ণ। তাঁকে ঐ ভাবে নামতে দেখে অবাক হলেন যুধিষ্ঠির। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে প্রীতি জানালেন। তারপর তাঁকে নিয়ে প্রবেশ করলেন আপন কক্ষে।

কৃষ্ণকে একটুও পথশ্রান্ত বলে মনে হল না। তাঁকে অত্যন্ত সজীব এবং প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তবু যুধিষ্ঠির বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করলেন তাঁকে।

কুরু পাণ্ডবের আসন্ন সংঘর্ষের দুশ্চিন্তায় যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ ও বিমর্ষ। তার সেই অসহায় করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণের মায়া হল ভীষণ। সহানুভূতি

আর সমবেদনায় ছাপিয়ে উঠল তাঁর বুক। সুবিনীত কণ্ঠে মধুস্বাদী বাক্য উচ্চারণ করে বললেনঃ আপনাকে খুবই চিন্তাকুল ও বিব্রত দেখছি। কেন? প্রশ্ন করতে পারি কি?

কৃষ্ণের ব্যাকুলতায় পুলকিত হলেন যুধিষ্ঠির। অকারণ খুশিতে ভরে উঠল মন। বড় ভাল লাগল। মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হল তাঁর অধরদ্বয়। তবু, কর্তব্যে কঠিন করতে হল মন। বললেনঃ আগে বিশ্রাম নাও সখা। তারপর কথা হবে।

কৃষ্ণের দুচক্ষু কৌতুকে ভরপুর। ওষ্ঠে বঙ্কিম হাসি। খুব সহজভাবে উত্তর দিলেনঃ প্রয়োজন নেই তার।

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজনৈতিক নাটকের প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তাঁর ভূমিকা নাট্যমঞ্চে নয়। নেপথ্যে। দৃষ্টির অন্তরালে। তাই, তাঁকে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। পাণ্ডবের সর্বকর্মের নির্ভরযোগ্য এই সাথীকে দেখলে হৃদয় আনন্দে চঞ্চল হয়। কৃষ্ণকে দেখা থেকেই তাঁর মনে নানা প্রশ্নের ভীড় করছিল। এখন কৃষ্ণের সম্মতি ও সমর্থন পেয়ে বিষন্ন কণ্ঠে বললেনঃ সখা অবশেষে দ্যৌত নিষ্ফল হল। দুর্যোধন কোনরূপ নিষ্পত্তি চায় না। সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সে। এমন কি পাঁচ ভাইর জন্য পাঁচখানা গ্রামের ন্যূনতম প্রার্থনাও অগ্রাহ্য করল।

কৃষ্ণের কণ্ঠে ও আচরণে কোন বিস্ময় প্রকাশ পেল না। যুধিষ্ঠিরের উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা বরং তাঁকে অধিক কৌতূহলী করল। মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেনঃ হঠাৎ দুর্যোধনের কাছে পাঁচখানা গ্রামের প্রস্তাব করলেন কেন? জানতে বাসনা হচ্ছে।

যুধিষ্ঠির বললেনঃ তুমি বলো, সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা প্রকৃষ্ট রাজনীতি। অকারণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিরীহ নিরপরাধ মানুষগুলির বিপদ ও দুঃখ বাড়ে। তাই দুর্যোধন যাতে যুদ্ধের সুযোগ না পায় সেজন্য অধিকারের প্রতীক হিসাবে পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করলাম। তুমি যাকে বলো কৌশলে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অকেজো করে দেয়া। আমিও সেইভাবে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলাম। জানি, পাণ্ডবদের অধিকার একবার প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রসার কেউ রুখতে পারবে না। পাঁচ পা পিছিয়ে এক পা অগ্রসর হওয়ার যুদ্ধ কৌশল নিয়েছিলাম।

কৃষ্ণের হাসি পেল। প্রাণ খুলে হাসলেন। সরল রসিকতার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলেন না। বললেনঃ তাহলে দুর্যোধনের কাছে আপনার রণকৌশল টিঁকল না।

সখেদে যুধিষ্ঠির বললেনঃ পরিহাস নয় সখা। পেতে হলে সর্বদা দিতে হয় কিছু। ভাই বলে তার সঙ্গে সেই দেওয়া-নেওয়ার নীতি গ্রহণ করছিলাম। বিশ্বজন জানুক পাণ্ডবেরা যুদ্ধ চায় না। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কখনও কাম্য নয় তাদের। তারা চায় শান্তি। সহযোগিতা। বন্ধুত্ব। সহাবস্থান। ভ্রাতৃপ্রীতিবশতঃ দুর্যোধনের সামান্য অনুগ্রহ নিয়ে সর্বস্ব দিতে চাইলাম। কিন্তু মহত্বের আদর্শ স্থাপন করে রাজনীতির দাবা খেলায় জিততে চাইলাম।

কি উপায়ে জয়ী হতেন আপনি? প্রশ্ন করল কৃষ্ণ।

তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে যুদ্ধের সময় তার একটা অদল-বদল

হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। সত্য ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, বঞ্চনার প্রতি ঘৃণা, বিবেক ও বুদ্ধির সংঘাত—যুদ্ধের চরম উত্তেজনা মুহূর্তে অনেক সময় মানুষের মনকে পরিবর্তন করে। তার স্খলন, পতন, সংশোধনকে অনিবার্য করে তোলে। আগে ভেবে যা ঠিক করেনা তাই ঘটে যায় আকস্মিক ভাবে।

যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য বোধগম্য হল না কৃষ্ণের। অবাক হয়ে তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরের মনের কথা অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। আসন্ন কুরু-পাণ্ডবের সংঘাতের বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে যুধিষ্ঠির তাঁর মনের বেশির ভাগ শক্তি কাজে লাগাচ্ছেন। তবে ধর্মপ্রাণ মানুষ বলে রাজনৈতিক হিসাবের গরমিল হচ্ছে। তাঁর কথা শুনে কৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেনঃ আপনি আদর্শবান, ধার্মিক ব্যক্তি। অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। শুনলে দুঃখ পাবেন ধর্ম ও নীতির উপর দুর্যোধনের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। দুর্যোধন বর্তমানে যে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী তা তার অর্জিত নয়। পিতৃ-পুরুষের নিকটও প্রাপ্য নয়। দস্যুর মত অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে নির্লজ্জের মত ভোগ করছে। আর ন্যায়, ধর্ম, সত্যের জন্য আপনি পথে পথে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনার মত রাজর্ষির ধর্ম তার মত নীচাশয় দুর্মতি বুঝবে না।

বলতে বলতে কৃষ্ণের মুখ ক্রোধে রক্তিম হল। যুধিষ্ঠির হতভম্বের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কৃষ্ণের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন। নিছক মনোকষ্ট দেবার জন্য কিংবা বিবেকের আঘাত করার জন্য কৃষ্ণ কিছু বলেননি তাঁকে। তবু, স্বাভাবিক হতে পারলেন না যুধিষ্ঠির। নিজেকে অপরাধী ভেবে চুপ করে রইলেন।

এইভাবে চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। তারপর যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন কৃষ্ণ। তাঁর সেই চির অভ্যস্ত নিজস্ব মধুর হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল। যুধিষ্ঠিরের বিষণ্ণতা দূর করার জন্য বললেনঃ আপনার অনুমান যথার্থ। বিবাদ ও বিভেদের অন্তঃস্রোতে শত্রুপক্ষের শক্তি ক্ষয় হয়। মতানৈক্য বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিত্বের সংঘাত তীব্র হয়। ক্ষমতা ও নেতৃত্ব নিয়ে যত রেষারেষি হয় ততই সুবিধা।

যুধিষ্ঠির তখন উৎফুল্ল হয়ে বললঃ কৃষ্ণ তোমার কাছে শেখা বিদ্যার একটা ঘটনা বলি, শোন। পাণ্ডবদের আমন্ত্রণে নানা দেশ থেকে রাজারা তাদের বিশাল বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে যোগ দিতে। নকুল সহদেবের মাতুল মদ্ররাজ শল্য বিরাট সৈন্যদল এবং তাঁর মহাবীর পুত্রদের নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে আসছিলেন। গুপ্তচরের মুখে সে খবর পেয়ে দুর্যোধন পথিমধ্যে তাঁর সম্বর্ধনা ও বিশ্রামের জন্য এক সুন্দর মণ্ডপ ও শিবির নির্মাণ করল। সুদক্ষ স্থপতি ও কারিগরদের দিয়ে নির্মিত হল সে মণ্ডপ। অপূর্ব, অদ্ভুত। আমোদ-প্রমোদ, খাদ্য পানীয় প্রভৃতির অফুরন্ত ব্যবস্থা করল দুর্যোধন। শল্য যাওয়া মাত্র দুর্যোধনের সচিব ও অমাত্যগণ তাঁকে পুষ্পমাল্য দিয়ে অভিনন্দিত করল।

তারপর, বিনয় বচনে তুষ্ট করে বিশ্রামের জন্য তাঁকে শিবিরে আমন্ত্রণ করে আনল। দুর্যোধনের মন্ত্রীগণ দেবতার ন্যায় পূজা করল তাঁকে। যত্ন ও আতিথেয়তার দ্বারা শল্যের প্রীতি উৎপাদন করল। তাদের আপ্যায়নে অত্যন্ত প্রীত ও হৃষ্ট হলেন মদ্ররাজ। ঘুরে ঘুরে দেখলেন মণ্ডপের শিল্প শোভা। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বললেন ঃ কোন্ শিল্পী এমন সুন্দর কাজ করেছে ? ডাক তাকে, পুরস্কার দেব।

দুর্যোধন অন্তরীক্ষ্যে অবস্থান করছিল। মন্ত্রীরা তাকে এনে হাজির করল। সবিনয়ে করজোড় করে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে। শল্য তাকে দেখে বললেন ঃ তোমার সেবা ও আতিথেয়তায় আমি প্রীত হয়েছি। শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়েছি। এখন তোমার কিছু অভিষ্ট থাকলে বল ! সাধ্যানুসারে পূরণের চেষ্টা করব।

দুর্যোধন এরকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। সবিনয়ে বলল ঃ আপনাকে সেবা করতে পেরে আমিও কৃতার্থ বোধ করছি। অধমের সেবায় যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে আমার প্রধান সেনাপতিত্বের ভার গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

শল্য তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গিয়ে বলল—বেশ, তাই হবে।

কৃষ্ণ ম্লান হেসে বললেন ঃ আশ্চর্য ! মাতুল হয়ে আপনাদের স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ করলেন কি করে ?

খুব সহজ সরলভাবে যুধিষ্ঠির বলল ঃ মদ্ররাজ আসলে অত্যন্ত সহজ, সরল আত্মীয়বৎসল। দুর্বল স্বভাবের মানুষ। উভয়কে সন্তুষ্ট করাই নীতি তাঁর। তাই, রাজনীতি, কূটনীতির শিকার হলেন। দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। এবং অকপটে পথের ঘটনা বিবৃত করলেন।

কৃষ্ণ বলল ঃ অপরাধ নেবেন না। শত্রুর ছলনা সম্পর্কে আপনি এখন থেকে খুব সতর্ক থাকবেন। দুর্যোধনের এই দুষ্ট বুদ্ধির কাছে আপনার রাজনৈতিক পরাজয়ের কোন তুলনা হয় না।

কৃষ্ণের ভর্ৎসনা বাক্যে যুধিষ্ঠির একটুও ক্ষুণ্ণ হলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে লাগলেন। ধর্মরাজের এই রহস্যের কিনারা করতে না পেরে কৃষ্ণ মনে মনে সংকুচিত হলেন। না বুঝেই বোধ হয় বেশী রূঢ় আচরণ করেছেন তাঁর প্রতি। একটা অকারণ অপরাধবোধে ক্লিষ্ট হল তাঁর চিত্ত। কৃষ্ণের অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠিরের ওষ্ঠাধরে স্মিত হাসির আভাস ফুটে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বলল ঃ সখা তোমার অযোগ্য শিষ্য আমি। সারা জীবন ধরে শুধু ভুল করব, এই তোমার ধারণা ? জানি আমার বুদ্ধির উপর তুমি ভরসা কর কম। তবু মাঝে মাঝে একটু নির্ভর কর। একেবারে নির্বোধ নই।

কৃষ্ণ কুন্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলল ঃ ধর্মরাজ, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। সন্দেহবশে বিড়ম্বিত করবেন না আমায়। আমার বাক্যের জন্য অনুতপ্ত আমি। আমার অপরাধ মার্জনা করে বলুন, শল্যকে আপনি কি উপায়ে জয় করলেন ?

যুধিষ্ঠির বলল ঃ আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন তুমি। রাজনীতিতে যত ঝগড়া মত নিয়ে। তুমি তো শিখিয়েছ সখা—রাজনীতিতে পুরো জয় বা পুরো পরাজয়

বলে কিছু নেই। রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্বার্থ ও সুবিধা। বহু উপায়ে তাকে লাভ করা যায়। দুর্যোধনের কাছে আমার পরাজয়কে কিছু জয়ের মর্যাদা দেওয়ার জন্য মহারাজ শল্যকে বললাম: আপনার সত্য ভঙ্গ করব না আমি। কিন্তু চিত্ত দৌর্বল্যবশতঃ কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে আপনি আমাদের দাবি ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছেন। এখন অকর্তব্য হলেও ভাগিনেয়দের মঙ্গলের জন্য আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। মাতুলের কাছে এটা আমাদের দাবি।

শল্যরাজ স্মিত হেসে বললেন: বল।

বললাম,—যুদ্ধে আপনি বাসুদেবের সমান। কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি। আর, আপনাকে হতে হবে কর্ণের সারথি। নইলে সমানে সমানে যুদ্ধ হবে না। কর্ণের সারথি হয়ে দুটো কাজ আপনাকে করতে হবে—অর্জুনকে রক্ষা করা, আর কর্ণের তেজ নষ্ট করা।

কৃষ্ণ কোন কথা বলল না দেখে যুধিষ্ঠির তার বক্তব্য আরও একটু বিশ্লেষণ করে বললেন: ভেবে দেখলাম, সেনাপতি শল্য যদি কর্ণের সারথি হতে চায় তাহলে কর্ণ দুর্যোধন কেউ সন্দেহ করবে না তাঁকে। শল্য রথের সারথি হয়ে কর্ণকে নানাভাবে বিপদে ফেলে বিভ্রান্ত করবে। তখন কর্ণ অহংকার ও দম্ভে ক্ষিপ্ত হয়ে শল্যের সঙ্গে কলহ করবে। কর্ণের উপর গুরুর অভিশাপে আছে, যুদ্ধে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হলে তার তেজ ও শক্তি ক্ষয় হবে। অস্ত্র বল বিস্মৃত হবে।

কৃষ্ণ তন্ময় হয়ে শুনছিল। তাঁর বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি অনুসরণ করে যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন: আমার কথায় রাজী হয়ে গেল শল্য।

প্রত্যুত্তরে বলল: মাতুলের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে শল্য কখনও কুণ্ঠিত হবে না। অর্জুনকে রক্ষার জন্য এ কাজ নিশ্চয়ই করব আমি। যুদ্ধের সময় কর্ণকে এমন প্রতিকূল অবস্থায় ফেলব এবং অহিতকর বাক্য বলব যাতে সে ক্রুদ্ধ হয়। ক্রোধে জ্ঞানহীন হলে তার পৌরুষ, তেজ, বল-বীর্য সব বিনষ্ট হবে। তখন অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতে পারবে। এছাড়া তোমার ভালোর জন্যে যদি আরো কিছু করতে হয় বল, আমি হৃষ্টমনেই করব।

কৃষ্ণ সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না। এতখানি কূট রাজনীতি যে কিভাবে যুধিষ্ঠিরের মাথায় খেলল তাই ভেবে অবাক হলেন। বিস্ময়ে তাঁর ভ্রূযুগল ঘন ঘন আন্দোলিত হল। চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হল। আবেগ ও অনুরাগে রঞ্জিত হল মুখমণ্ডল। বিহ্বল অবস্থা কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তাঁর। তারপ মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বললেন: আমি অভিভূত। আপনাকে অভিনন্দন জানানো ভাষা আমার নেই। চিরকাল আপনাকে ভালমানুষ এবং ধর্ম পুত্র বলেই শ্রদ্ধা কে এসেছি। কিন্তু আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠির ে একজন কূট রাজনীতিজ্ঞ তা নতুন করে জানলাম। আপনার সাফল্য অনন্যসাধারণ মিথ্যাচারণ, মিথ্যাভাষণ ব্যতীত এ জয় অসম্ভব। অথচ, অকপট সত্যভাষণে আপনি সেই মহা-জয় সম্পন্ন করলেন। পাণ্ডবদের বিরাট বিপর্যয় থেকে কিছুটা জয় আদায় করে নেওয়ার এই কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আপনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

কৃষ্ণের খুব আশ্চর্য লাগল তাঁর ও যুধিষ্ঠিরের চিন্তাধারা এক সরল রেখা ধরে চলেছে। অথচ, কেউ কারো কাছে মনের সেই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছে না। কর্ণকেই পাণ্ডবদের একমাত্র ভয়। আসন্ন কুরু-পাণ্ডবের লড়াইতে কর্ণার্জুনের সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। তাই অর্জুনকে রক্ষা নিয়ে উভয়ে চিন্তা করছে। কিন্তু চিন্তার মধ্যে তাঁদের পার্থক্য আছে। কর্ণের বাসব অস্ত্র ও নাগবাণ-এর জন্যই যুধিষ্ঠিরের দুর্ভাবনা। কিন্তু কৃষ্ণের চিন্তা সম্পূর্ণ অন্য। যুধিষ্ঠির জানেন না কর্ণ তাঁর সহোদর ভাই। কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ হবে ভাইয়ে ভাইয়ে। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সে জন্যেই কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। কর্ণ অর্জুনকেই তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তার সঙ্গে সে কোন আপোষ করবে না। ভাই জেনেও নিবৃত্ত হবে না সংগ্রামে। প্রাণ দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে লড়বে সে। দুর্যোধনের পক্ষে একমাত্র কর্ণই তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, ক্ষোভ, অপমান ও ক্রোধ নিয়ে মহাবিক্রমে লড়বে। অর্জুন তার শৌর্য-বীর্য, স্নেহ ও প্রেমের একমাত্র চির প্রতিদ্বন্দ্বী। কর্ণের ক্রোধ ও প্রতিহিংসাকে কৃষ্ণ তাই ভয় করেন। শল্য কর্ণের সারথি হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের মত তিনিও খুশি হলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। উদ্বেগ রয়েই গেল।

চতুর্দশ অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মাত্মা ব্যক্তিকেই ধৃতরাষ্ট্রের ভয়। তাঁর মত সৎ ও সাধু ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হলে বিশ্বচরাচর রসাতলে যায়। সাধুতাই তার শক্তি। তাই ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। তাঁকে বিভ্রান্ত ও ছলনা করার জন্য তিনি সঞ্জয়কে উপপ্লব্য নগরে পাঠালেন।

বিরাট রাজার পুরোহিত পাণ্ডবের দূত হয়ে কৌরবসভায় গিয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরলেন তিনি। তারপরেই যখন ধৃতরাষ্ট্রের বিশেষ দূত হয়ে সঞ্জয় এল উপপ্লব্য নগরে তখন যুধিষ্ঠির সহ অন্যান্য ভ্রাতারা আশান্বিত হলেন। শুভ সংবাদের প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হল তাদের চিত্ত।

কৃষ্ণ কিন্তু সঞ্জয়ের আকস্মিক আগমনকে সন্দেহের চোখে দেখলেন। এর মধ্যে গভীর কোন রহস্য আছে বলে তাঁর ধারণা। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে দুর্যোধনের মত বদলে গেল? বিশ্বাস হল না কৃষ্ণের। সঞ্জয়ের অভিসন্ধিটা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইদের মধ্যে বিভেদ জাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কি সে হস্তিনাপুর থেকে এসেছে বলে তাঁর ধারণা হল? অন্তর্কলহের বীজ রোপন করা কিছু বিচিত্র নয়। মোট কথা, যুধিষ্ঠিরকে নতুন বিপদে জড়ানোর জন্যই সঞ্জয় এসেছে। যুধিষ্ঠির নিজেও সে বিপদ সম্পর্কে অবহিত নয়। তাই, তাঁকে সজাগ করে দেওয়ার জন্য কৃষ্ণ ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে। কুঞ্চিত ভ্রূ ভঙ্গিমায় তাঁর

বিরক্তি, প্রচ্ছন্ন ভৎর্সনা ও প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত। সঞ্জয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কৃষ্ণ হেসে ফেললেন। রহস্যপূর্ণ মধুর সে হাসি। কৃষ্ণের অভিপ্রায় বোঝার কোন সুযোগ হল না সঞ্জয়ের। তারপরেই তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন ঃ সব শুভ তো!

করজোড় করে সঞ্জয় সকলকে নমস্কার করে কুশল জিগ্যেস করল। যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমি আপনার হিতৈষী হয়েই এসেছি। আপনারা দুর্যোধনের কোন অপকার করেননি তথাপি সে সর্বদা আপনাদের অনিষ্ট চিন্তা করে। আপনাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন।

তারপর চিন্তার ভান করে বলল ঃ যতদূর জানি, কৌরবেরা বিনা যুদ্ধে রাজ্য দেবে না। তাই, আপনাকে অনুরোধ, বুদ্ধিবলে শান্তির উপায় স্থির করুন। যুদ্ধের মত বীভৎস হত্যাকাণ্ড করে যে জয়লাভ হয় তা শোকাতুর মাতা, বন্ধু ও সন্তানদের বিলাপ, দীর্ঘশ্বাসে করুণ ও বিষণ্ণ। আপনার মত মহাত্মা সে পথ কখনও গ্রহণ করবে না বলে বিশ্বাস করি। দুর্যোধন অধম বলে আপনাদের উত্তম হওয়া'তো কোন বাধা নেই।

যুধিষ্ঠির তন্ময় হয়ে শুনছিল। সঞ্জয়ের বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছিল। ধর্মরাজের সাগ্রহ কৌতূহল সঞ্জয়কে উদ্দীপিত করল। সকলের মুখ নিরীক্ষণ করে সে পুনরায় বলল ঃ অজাতশত্রু আপনি। আপনার মত মহৎ ব্যক্তির হীন কর্ম করা উচিত নয়। মহাবলশালী পাণ্ডবেরা যুদ্ধের মতো জঘন্য কোন কর্মে প্রবৃত্ত হবে বলে আমি মনে করি না। আপনার নিষ্কলুষ চরিত্র জ্ঞাতি হত্যার পাপে কলঙ্কিত হবে, এ কথা ভাবাও পাপ। দীর্ঘকাল ধরে যে আদর্শের পিছনে ঘুরে ঘুরে আপনারা বনবাসের অশেষ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করলেন তা যদি সিংহাসন লাভের জন্য এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বিপর্যস্ত হয়, যদি এক মনুষ্য-বিনাশী যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলে কি মূল্য থাকল এই দুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগের? রাজ্যলাভের অভিপ্রায় যদি আপনার কাছে বড় হয় তা হলে বনবাসে না গিয়ে ক্রোধান্ধ হয়ে সেদিনই চিরশত্রু কৌরবদের বিনাশ করতে পারতেন। কিন্তু আপনি প্রকৃতই মহাত্মা বলে সেই জঘন্য কার্যে লিপ্ত হতে পারেন নি। আজ দুর্যোধন যুদ্ধ চায় বলেই আপনি কেন সেই অপ্রিয় কর্মানুষ্ঠান করবেন? আপনার ধর্ম, ব্রত আদর্শ ত্যাগ করবেন কেন? কার জন্যে এবং কোন স্বার্থে করবেন? আপনার মত ঋষিতুল্য ব্যক্তির কাছে জয়-পরাজয়ের কোন পার্থক্য নেই। যশের জন্য যুদ্ধ করা আপনার মত মহাত্মার কখনও শোভা পায় না; দয়া ও ক্ষমা আপনার চরিত্রের অলংকার। ক্ষুদ্র স্বার্থ সুখের কথা চিন্তা করে স্বর্গপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া আপনার মত মহাত্মার শোভা পায় না। সর্বদোষকর তিক্ত ক্রোধ ও তীব্র ভোগাকাংখা শুধুমাত্র সাধু ও মহৎ ব্যক্তিরাই নির্দ্বিধায় হজম করতে পারেন।

ন্যায়ধর্ম ও কূটনীতির অসাধারণ মিশ্রণে রচিত সঞ্জয়ের অনবদ্য হৃদয়গ্রাহী ভাষণে যুধিষ্ঠির অভিভূত হলেন। কৃষ্ণ হলেন ক্ষুব্ধ। কিন্তু মুখে কেউ কিছু প্রকাশ করলেন না। কৃষ্ণের চিন্তা কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে। যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ধর্ম ও কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বে যুধিষ্ঠিরের চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। যুধিষ্ঠিরের ললাটদেশে চিন্তার বলিরেখাগুলি গভীর হল। সহজে তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

যুধিষ্ঠির খুব আশা করেছিলেন সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সঞ্জয় গ্রহণযোগ্য একটি মীমাংসার সূত্র উপহার দেবেন তাঁকে। কিন্তু সঞ্জয়ের ভাষণে তার কোন আভাষ না পেয়ে যুধিষ্ঠির মর্মাহত হলেন। আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় তাঁকে কাতর ও বিষণ্ণ দেখাল। নিশ্চল চক্ষু তারকাদ্বয়ে না পাওয়ার আর্তি ও বেদনা ফুটে বেরোল। আবেগ গাঢ় স্বরে বললেন: যুদ্ধে আমি ইচ্ছুক এমন কথা তোমায় বলিনি সঞ্জয়। তবু ভীত হচ্ছ কেন তুমি? যুদ্ধ না করে যদি তার ফল লাভ করা যায় তবে, কোন মূর্খ যুদ্ধ করে না। বিনা যুদ্ধে কৌরবেরা আমার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে যদি অল্প কিছুও দেয় তাহলেই যথেষ্ট মনে করব। তাতেই সন্তুষ্ট হব আমি।

যুধিষ্ঠিরের এরকম উক্তিতে কৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন: ধর্মরাজ স্বধর্ম ত্যাগ করলে অধর্ম হয়। যার যে কাজ ঠিকমত না করলে জীবনস্রোত অবরুদ্ধ হয়। তাই না সঞ্জয়? যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন এতে ধর্মলোপ হবে কেন? তুমিই বল, ক্ষত্রিয় রাজাদের যুদ্ধ করা কি ধর্মসম্মত নয়?

কৃষ্ণের বাক্যে যুধিষ্ঠির আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন: কৃষ্ণ ঠিক বলেছে। দুর্যোধন ও তার ভ্রাতারা অত্যন্ত লোভী। তারা নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্য ভোগের জন্য পাণ্ডবদের পিতৃপিতামহের রাজ্য ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য সব রকম হীন কার্য করেছে এবং এখনও করে চলেছে। তারা যদি সামান্যতম লোভ ত্যাগ করে তাহলে এই সর্বনাশা যুদ্ধ হয় না। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যদি হয় তাহলে পাপাত্মা দুর্যোধনই ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ তার জন্য দায়ী। তার লোভ ও জেদের জন্য এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর তখন ব্যঙ্গে বিদ্রূপে আরও শাণিত হল। উষ্মা প্রকাশ করে বলল: ধর্মরাজও ক্ষুব্ধ আজ! দুর্যোধন যা করল তার সঙ্গে তস্করের কার্যের কোন প্রভেদ দেখি না। দস্যুর মত সবলে পরের ধন-সম্পত্তি হরণে প্রবৃত্ত সে। তার দুষ্কর্মের কোন তুলনা নেই। তুমি বল সঞ্জয়, কেউ কখনও ভার্যার অসম্মান ভুলতে পারে? না ভোলা যায়? তোমারা যারা তার লাঞ্ছনা চোখে দেখেও কিছু করলে না, তাদের আচরণ কি ক্ষমা করা যায়? তাদের মত মানুষকে কি বিশ্বাস করা উচিত? তোমার শুষ্ক উপদেশ পাণ্ডবদের বক্ষের উত্তাপকে কেবল প্রখর করল। তাদের মনের আগুন উস্কে দিল। আচ্ছা সঞ্জয়, তুমি নিরুত্তর কেন? তুমি তো শাস্ত্র জান। পাপী ও দুরাত্মা বধ করলে পুণ্য হয়। দুর্যোধন ও তার ভ্রাতাদের সঙ্গে পাপাত্মাদের কার্যের ও চরিত্রের কোন ইতরবিশেষ দেখতে পাও তুমি?

মুহূর্তের জন্য থামলেন কৃষ্ণ। সঞ্জয় কোন কথা খুঁজে পেল না। মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শ্বাস মোচন করে বিনীত কণ্ঠে বলল: সকলের মঙ্গলের জন্য আমি সন্ধি প্রার্থনা করছি। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র চান আপনারা শান্তি স্থাপন করুন।

চোখে একটা প্রশান্তির ভাব ফুটিয়ে তুললেন কৃষ্ণ। মুখে তাঁর বিজয়ীর হাসি। চোখে কৌতুক। জীবন রহস্যের না হোক, জীবন যাত্রার রহস্য বুঝতে পারার কৌতুক। সঞ্জয়ের চোখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—দ্যাখ সঞ্জয় আমি দুই পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শান্তি ভিন্ন অন্য কোন উপদেশ দিতে চাই না। পাণ্ডবেরা শান্তিকামী কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রেরা অত্যন্ত লোভী প্রতিহিংসা-পরায়ণ। তারা কি আমার শান্তির উপদেশ গ্রহণ করবে?

সঞ্জয় চলে গেলে যুধিষ্ঠির কেমন যেন হয়ে গেলেন। সঞ্জয়ের উক্তিগুলো তাঁর চিন্তা ভাবনার সঙ্গে এক সরলরেখায় মিশে গেল। চুপচাপ, একস্থানে স্থির হয়ে বসে রইলেন। অসংখ্য প্রশ্ন তাঁর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা দুরূহ হল। 'যুদ্ধে অকারণ প্রাণীহত্যা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি বরং শ্রেয়'—সঞ্জয়ের এই বাক্যটি তাঁর হৃদয়দেশ আলোড়িত করতে লাগল। ক্ষমাই ব্রহ্ম ও সত্য। ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। একটা অনিশ্চিত অস্থিরতা তাঁর সমস্ত চিত্তভূমি গ্রাস করল। সংশয়ে ভীরুতায় দুর্বলতায় চিত্ত হল আচ্ছন্ন। মনে হল, যুদ্ধ সত্যই তাঁর আত্মদ্রোহ ছাড়া কিছু নয়। এ কেবল নিজের সঙ্গে নিজেরই বৈরীতা সৃষ্টি। সমাধানহীন এক কঠিন আত্মদ্বন্দ্বে তাঁর চিত্ত পীড়িত হতে লাগল।

রঙ্গভূমির বিভীষিকার কথা ভাবলে ভয়ে যুধিষ্ঠিরের বুক কেঁপে ওঠে। নিরীহ মানুষবধের কলংক থেকে ইতিহাস কোনদিন রেহাই দেবে না তাঁকে। দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর নামও মসীলিপ্ত হবে। ইতিহাস কার্য ও ঘটনার নির্মম বিচারক। ইতিহাস কালপ্রবাহের সৃষ্টি। মহাকালই সব ঘটনার নিয়ন্ত্রা। সেই কাল যেন প্রবলবেগে আকর্ষণ করছে তাঁকে। তিনি নিরুপায়। কালের হাতে বন্দী এক অসহায় মানুষ। বিস্তর দুঃখের মূল্যে হয়ত পরিশোধ করতে হবে তাঁকে মহাকালের ঋণ।

কৃষ্ণ তাঁকে বিমর্ষ, চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখে বললেনঃ ধর্মরাজ, আপনি না সম্রাট! শুভ বুদ্ধি ও দৃঢ় সংকল্পই আপনার কাছে প্রত্যাশা করি। দ্বিধা আপনার শোভা পায় না। সিদ্ধান্তে অবিচল থাকাই রাজকর্তব্য। মনে রাখবেন, বনবাসেব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকারের মূলে আছে সত্য ও ধর্ম-রক্ষার শপথ, দ্রৌপদীর অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার প্রতিকারের অঙ্গীকার, দুর্যোধনের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অমার্জনীয় অপরাধের সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ স্থায়ী সমাধান। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। দোষীর শাস্তিবিধান আমাদের কাম্য। ন্যায় ও ধর্ম রক্ষাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধর্ম নিজের হাতেই তার দণ্ড দেবেন। আমি, আপনি তার প্রতিনিধিমাত্র।

যুধিষ্ঠির স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেনঃ সখা তুমি যা বললে সব সত্যি। তবু মানুষ যুধিষ্ঠির মানুষের দুঃখেই কাঁদে।

আবেগ সংবরণের জন্য থামল যুধিষ্ঠির। কিছুটা সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টাতেই ঈষৎ মলিন হাসল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেনঃ সঞ্জয়ের মুখে সবই শুনেছ সখা। পাণ্ডবের সাম্রাজ্য দুর্যোধন একলা ভোগ করতে চায়। কোন অংশীদার চায় না সে। হিংসার আগুনে সমগ্র ভারত যদি পুড়ে ছারখার হয় তাহলেও নিবৃত্ত হবে না সে। দুর্যোধনের হাতে ভারতের রাজনীতি কদর্য ও বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের রাজনীতির অন্ধকার আকাশে তুমিই একমাত্র উজ্জ্বল তারকা। রাজনৈতিক তমসার মধ্যে তুমিই পাণ্ডবের একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়। তুমিই পার এ অন্ধকারের মধ্যে আলো আনতে। তাই আমার ইচ্ছা শীঘ্রই তুমি হস্তিনাপুরে গিয়ে আপোষের শেষ চেষ্টা করে দেখ। তোমাকেই দিলাম সন্ধি স্থাপনের দায়িত্ব। আমার অনুরোধ গ্রহণ করে কৃতার্থ কর সখা।

যুধিষ্ঠিরের আকুল আবেদন কৃষ্ণকে অভিভূত করল। জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য দেখাতে ভীম ও অর্জুন সমস্বরে বলল ঃ সখা, এমনভাবে কথা বলো যাতে শান্তি স্থাপিত হয়। কখনও ভয় দেখিও না তাদের। ভরতবংশ বিনষ্ট হয় এমন কিছু কর না।

ভীম ও অর্জুনের উত্তাপহীন কণ্ঠস্বর এবং বক্তব্য শুনে চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। অবাক লাগল ভীষণ। এত আশ্চর্য বোধ হয় জীবনে খুব কমই হয়েছেন তিনি। বিমূঢ়ের মত উভয়ের মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। অবিশ্বাস্য বলে মনে হল তাঁর। কিন্তু তাদের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কিছুতে ভুলতে পারলেন না। কানের মধ্যে কেবলই প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তা। তবে কি, পাণ্ডবদের অদৃষ্ট লাঞ্ছিত জীবন দুঃসহ বিড়ম্বনা, দুঃখ গ্লানি, অবসাদ, নৈরাশ্য আজ তাদের নিজের অঙ্গে বৈরীতা করছে? আত্মবিশ্বাসে দেউলে না হলে এমন করে পরানুগ্রহ ও পরানুকম্পার উপর নির্ভর করতে পারে কেউ? নিজেদের পৌরুষ, বল ও তেজ নিগ্রহ করে পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের কৃপাপ্রার্থী হচ্ছে কেন? ভেবে পেলেন না কৃষ্ণ? জীবনীশক্তির এতবড় অপচয়কে কোনমতে সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে বললেন ঃ আপনার বুদ্ধি ধর্মাশ্রিত। যুদ্ধ না করে যা পাওয়া যায় তাকেই আপনি যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যুদ্ধ বিমুখতা ক্ষত্রিয়ের দুর্বলতা। দুর্যোধন আপনাকে দুর্বল ভেবে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে।

তারপর গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। ভীমার্জুনের দিকে। ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ভীমের উপরই জেগে উঠল তাঁর দুর্জয় অভিমান। কাম্যক বনে যে ভীমকে তিনি দেখেছিলেন এ যেন সে ভীম নয়। তার প্রেতচ্ছায়া।

কৃষ্ণের মুখমণ্ডল বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠল। ভ্রূ-কুঞ্চিত হল। ভীম ও অর্জুন অপরাধীর মত মাথা নীচু করে রইল। কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ চাহনি তাদের সূঁচের মত বিদ্ধ করছিল। কিছুক্ষণের জন্য শব্দহীন নীরবতা সেখানে বিরাজ করতে লাগল। কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর হঠাৎ একই সঙ্গে গম্ভীর শান্ত অথচ শাণিত হয়ে উঠল। ভীমের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ ভীমসেন!

কৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে ভীমের সর্বশরীর শিহরিত হল। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। পলক পড়ল না বহুক্ষণ।

তুমি কি লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলে? কৌরব-সভায় সর্বসমক্ষে তুমি না বলেছিলে, দুঃশাসনের বক্ষ রক্তে রঞ্জিত করবে দ্রৌপদীর কেশপাশ। মনে পড়ে বৃকোদর, ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ করে শপথ করেছিলে, দুর্যোধনকে বধ করবে। ক্ষিপ্ত হয়ে সে সময় বলেছিলে, পূর্বদিকে সূর্যোদয় এবং পশ্চিমদিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব তেমনি তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য।

ক্ষণকাল নীরব থেকে রূঢ় ব্যঙ্গ হাস্যের সঙ্গে বললেন: ক্রোধে তুমি নিদ্রা যাও না, উবুর হয়ে শোও, সর্বদা অশান্ত বাক্য বল, অকারণ হাস, কাঁদ। দুইজানুর মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষু বুজে থাক। এসব কি যজ্ঞসেনীকে সন্তুষ্ট করার অভিনয়? না, তার প্রিয় হওয়ার জন্য তোমার লম্পট ছলনা? আশ্চর্য মানুষ তুমি বৃকোদর। যুদ্ধকাল উপস্থিত হল আর অমনি একজন শান্তির বড় প্রবক্তা হয়ে গেলে। যুদ্ধের উৎসাহ তোমার ফুরিয়ে গেল? লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞা হল খেলনার বস্তু? এত অযোগ্য বলে জানতাম না তোমায়। ধিক্ তোমার ক্ষাত্রধর্মের!

কৃষ্ণের বাক্যে অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত চমকে উঠল ভীম। ক্রোধে রক্তবর্ণ হল তার চক্ষু। উত্তেজনায় তার দেহ থর থর করে কাঁপছিল। ভীম অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল। কিন্তু কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরে তার উষ্মা প্রকাশ পেল। বলল: সখা উদ্দেশ্য না বুঝে ভৎর্সনা করলে। ভীমকে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে কেহ সাহস পায় না। কিন্তু তুমি আজ, না বুঝেই তিরস্কার করলে। অবশ্য এ তিরস্কার আমার প্রাপ্য। আত্মপ্রশংসা করা পাণ্ডুপুত্রদের আদর্শবিরুদ্ধ। তবু নিজের কথা বলতে তুমি আমাকে বাধ্য করছ। অপরাধ নিও না।

কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণ। মুখে তার রহস্যময় কৌতুক হাসি। ভীম সেদিকে না তাকিয়ে বলতে লাগল: ভরতবংশ রক্ষার কথা চিন্তা করেই শান্তির সমর্থক হয়েছিলাম। রক্তক্ষয়ী কুলক্ষয়ী যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর পাণ্ডবদের সাম্রাজ্য গড়ে উঠুক; এ আমি চাই না। পাণ্ডবের বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঈর্ষায় কলুষিত না হয় যেন যুদ্ধ। দুর্যোধনের মূঢ়তার জন্য যদি যুদ্ধ একান্ত অনিবার্য হয় তাহলে রণক্ষেত্রে আমার পরিচয় পাবে। তখনই বুঝবে ভীমের প্রতীজ্ঞা কী ভীষণ কঠিন ও কঠোর। এ বক্ষে ভয় লেখা নাই। যুদ্ধে দেহ আমার শ্রান্ত হয় না কখনো, মনও হয় না অবসন্ন। দেবতা ক্রুদ্ধ হলেও ভয় পাইনা আমি।

খুশী হলেন কৃষ্ণ। আনন্দে পরিপ্লুত হল তাঁর হৃদয়। আবেগে অনুরাগ তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন: ধন্য সখা। এই তো ভীমের মত কথা! তুমি ক্লীবের ন্যায় কথা বলেছিলে সেজন্য শঙ্কিত হয়ে তিরস্কার করেছি তোমাকে। সে ছিল শুধু উদ্দীপিত করার জন্য। তোমার অবসন্ন, ক্লান্ত, পৌরুষকে তেজে দীপ্ত ও বলে বলীয়ান করার জন্য প্রণয়বশে ছলনা করলাম।

কৃষ্ণের মুখে সাফল্যের প্রত্যয় তৃপ্তির মৃদুহাস্য মিলে এমন এক অব্যয় অভিব্যক্তি লাভ করল যা দেখে অর্জুন ও ভীমের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হল। সহজাত বাস্তব

বুদ্ধিতে অর্জুন বুঝতে পারল যে যুধিষ্ঠিরের সন্ধি প্রস্তাবের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যে কৃষ্ণ ভীমকে তিরস্কার করল। এবং যুধিষ্ঠির যাতে কুরু-পাণ্ডবের সংকটময় পরিণাম সম্বন্ধে বেশী করে সতর্ক ও সাবধান হয় সেজন্যই কৃষ্ণ ক্রোধ প্রকাশ করলেন। যুদ্ধ যেখানে অনিবার্য সেখানে আপোষের সুরে কথা বলা অর্থহীন। যুধিষ্ঠিরের এই প্রয়াস কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে ? আপনাকে প্রশ্ন করল অর্জুন। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, কিন্তু সে তার গৌরবকে ঢাকতে পারে না, ম্লানও করে না। তাহলে ধর্মরাজের সন্ধি বা আপোষের উদ্যম গৌরবের না হলেও অগৌরবের কালিমায় পাণ্ডবদের মহিমাকে অন্ততঃ অন্ধকার করতে পারবে না। তাই, কৃষ্ণকে সে বলল ঃ সখা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষ আসন্ন! তবু সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। কিন্তু সব সময় হবে, এমন বাঁধাধরা নিয়মও নেই। অনিশ্চিত মনে করেই চেষ্টা করা। তবে, তুমি যদি মনে কর, ওদের বধ করাই উচিত তাহলে বৃথা কাল হরণ না করে সেই উপদেশ দাও।

নকুলের অভিমত জানার জন্য কৃষ্ণ তার দিকে তাকালেন। নকুল একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ কালোচিত কর্মই বিধেয় বলে মনে করি।

তারপর সর্বকনিষ্ঠ সহদেবের মত জানতে চাইলেন কৃষ্ণ। সহদেবের গৌরবর্ণ মুখখানা সহসা বেদনায় কঠিন হয়ে উঠল। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হল। তার অন্তরে বিদ্রোহের নিনাদ বেজে উঠল। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলল ঃ না কৃষ্ণ, না। কৌরবেরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। দ্যূতসভায় পাঞ্চালীর নিগ্রহের প্রতিশোধ যদি নিতে না পারি তবে, আমাদের ক্রোধ কি করে শান্ত হবে ? কি করে এই হৃদয় জ্বালা জুড়োবে বলতে পার ? ধর্মরাজ আর ভীমার্জুন যদি ধর্ম নিয়েই থাকেন তাতে আমি ক্ষোভ করব না, কিন্তু আমি ধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধ করব।

সহদেবের কথা শুনে সাত্যকি তাকে সাধুবাদ করল। কৃষ্ণ নিজেও পুলকিত হলেন অন্তরে। কিন্তু সে বিহ্বলতা প্রকাশ পেল না তাঁর আচরণে কিংবা ভাষণে।

সহদেবের বাক্যে যুধিষ্ঠিরের ভ্রূকুঞ্চিত হল। তার বিরোধিতায় ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। কিন্তু রুষ্ট হওয়া ধর্মরাজের স্বভাব নয়। কষ্ট করে আত্মসংবরণ করতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল! তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে মুখস্ত বুলির মত কৃষ্ণকে বললেন ঃ যে যা বলুক তোমায়! কৌরব সভায় গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দাও তুমি! এ আমার অনুরোধ। মানুষকে মুগ্ধ ও বশীভূত করার কৌশল তোমার জানা আছে। যে বাক্য পাণ্ডবের পক্ষে হিতকর হয় তা মৃদু ও কঠোর ভাষায় বলবে তুমি।

অমনি দ্বারের অন্তরাল থেকে বিদ্যুতের মত আত্মপ্রকাশ করল দ্রৌপদী। যুধিষ্ঠিরের শেষ কথাটি শোনার জন্য প্রতীক্ষা করছিল সে। অরণি কাষ্ঠ সংঘর্ষজাত অগ্নির মত ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলে উঠল দ্রৌপদী। দুই চক্ষু তার অগ্নিময়। প্রদীপ্ত রোষে মুখখানিও গণ্ গণ্ করছিল। রুদ্ধ আবেগ ও উত্তেজনার বশে দাঁত দিয়ে নিম্নের ওষ্ঠভাগে চেপে ধরল। ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনার অসংযত আবেগকে প্রাণপণে দমনের চেষ্টা করতে লাগল।

কৃষ্ণের সামনে কৃষ্ণার হঠাৎ আবির্ভাবে, চমকে উঠলেন যুধিষ্ঠির। তাকে দেখে

ধর্মরাজের মাথা নীচু হয়ে গেল। তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলল: সখা কিছুই অবিদিত নয় তোমার। প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে নিরুদ্ধ রেখে আমি তেরো বৎসর কাটিয়েছি। এখন ভীমার্জুন সহ ধর্মরাজ তাদের প্রতিজ্ঞা, ক্রোধ কর্তব্য সব বিস্মৃত হয়েছে। দীন ভিক্ষুকের মত তারা দুর্যোধনের অনুকম্পা প্রার্থনা করছে। তাদের এই কাপুরুষতায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। চিত্ত অনুতাপানলে জ্বলে যাচ্ছে। বলতে লজ্জা করে দ্যূত সভায় এই পঞ্চ স্বামীর সম্মুখেই নিগৃহীত হয়েছি। আজ নিজের দিকে তাকিয়ে আমি গর্বের বদলে লজ্জা অনুভব করি। আত্মগ্লানিতে আমার বুক পুড়ছে। আমার এই দেহটা দস্যুর লোভ লালসার হস্তস্পর্শে কলুষিত। আমার বীর্যবান স্বামীরা স্ত্রীর সেই দুঃখ, লজ্জা, অপমান, অসম্মানের প্রতিকার না করে ক্লীবের মত নরাধম দুর্যোধনের পদতলে মাথা রেখে তার দয়া ও করুণা প্রার্থনা করছে। হা ধিক, আমার অদৃষ্ট!

উন্মাদের মত দ্রৌপদী শিরে করাঘাত করতে লাগল। তাঁর এলায়িত রুক্ষ বিন্যস্ত কেশদামের ফাঁক দিয়ে আগুনের গোলার মত জ্বল জ্বল করছিল দুটি চোখ। ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছিল তাকে। দ্রৌপদী কৃষ্ণের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। চোখের উপর চোখ রেখে জিগ্যেস করল: সখা, আমি যে তোমার ভরসায় রয়েছি। আমার স্বামীরা অক্ষম, অপদার্থ। এখন তুমি আমায় বল, দুঃশাসন যে কৃষ্ণবর্ণ বাহুদ্বারা আমাকে আকর্ষণ করেছিল তার সেই হস্তদ্বয় ধূলিলুণ্ঠিত দেখব কবে? বল সখা, দুর্যোধন যে জানুতে আমাকে আহ্বান করল তার ভগ্নরূপই বা দেখব কবে? নীরব থেকো না, বল? হোমাগ্নিউদ্ভূতা যাজ্ঞসেনীর হৃদয় জ্বালা জুড়োনোর জন্যে তুমি কী করছ?

বলতে বলতে আত্মধিক্কারে তার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হল। সে আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কৃষ্ণার বাক্য কৃষ্ণের মন গভীরভাবে স্পর্শ করল। কৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: শোন, প্রিয়সখী আমার। দুঃখ কর না। অশ্রু সংবরণ কর তুমি। তোমার এক বিন্দু অশ্রু কৌরব রমণীদের সহস্র অশ্রুবিন্দুর মূল্যে পরিশোধ করতে হবে। তোমার ক্রোধ অগ্নিরূপে সমগ্র ভারতভূমিকে প্রজ্জ্বলিত করবে। দুর্যোধন রণাঙ্গনে নিহত হয়ে শৃগাল কুকুরের খাদ্য হবে। তুমি আবার ভারত সম্রাজ্ঞী হবে।

মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা পদ্মকোরক তুল্য হস্তে মুখ আবৃত করে সাভিমানে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল: এ কথা জেনেও কি তুমি হস্তিনাপুরে যাবে?

নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন কৃষ্ণ: যাব সখি।

মুখ থেকে হস্ত অপসারণ করে দ্রৌপদী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে। কৃষ্ণের নিশ্চল আঁখিদ্বয়ে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি। মৃদুস্বরে বলল: প্রিয় সখি, এ হল রাজনীতি। বড় দুর্জ্ঞেয় বড় জটিল! ধর্মরাজের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন নেই, নিজের স্বার্থের জন্যেই যাওয়া দরকার।

'কেন'—এ কথা জিগ্যেস করার মত অবস্থা রইল না দ্রৌপদীর। কেমন একটা সম্মোহন অবস্থা তার। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইল। চোখে তার

বিহ্বলতা। কৃষ্ণের মুখে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় হাসি। বললেনঃ মৃত্যুপাশ থেকে কৌরবদের কেউ বাঁচাতে পারবে না জেনেও কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কেন জান ভামিনী? লোকে বলবে, কৃষ্ণ একটু চাইলেই ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ বন্ধ হত। এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুধু কৃষ্ণ পারে বাধা দিতে। এরপরে চেষ্টা করে যদি নিষ্ফল হই তাহলে নিন্দুকের মুখ বন্ধ হবে। ধর্মরাজের ইচ্ছাও রক্ষা হবে। পাণ্ডবের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে! এই সর্বনাশা মহাযুদ্ধের দায়ভাগী হবে না সে। আর আমারও গৌরব অম্লান থাকবে। কথাগুলো বলে, কৃষ্ণ অদ্ভুতভাবে হাসলেন।

শত্রু ক্ষুদ্রই হোক আর তুচ্ছই হোক তাকে অবহেলা করেন না কৃষ্ণ। সর্বাবস্থায় তার শত্রুতা আশংকা করে সাবধান থাকেন। অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে উপলব্ধি করলেন যে বর্তমান অবস্থায় তিনিই দুর্যোধনের প্রধান শত্রু। পাণ্ডবদের কাছ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দেবার সবরকম চেষ্টা করবে দুর্যোধন। এ জন্য যেকোন হীন কর্ম করতেও কুণ্ঠিত নয় সে। দুর্যোধন জানে পাণ্ডব প্রাণ কৃষ্ণকে কোনক্রমে বন্দী করতে পারলে পাণ্ডবেরা তাঁর মুক্তির জন্যে রাজ্যের দাবী ত্যাগ করে পুনরায় বনবাসী হতে রাজি হবে। দ্বারকার মানুষও তাঁর জন্যে কৃচ্ছ্র সাধনে রাজি। তবু কৃষ্ণ দুর্যোধনকে সে সুযোগ করে দেবে না।

দুর্যোধন তাঁকে কাছে পেয়েও যে তাকে সহজে ছেড়ে দেবে না জানে। বিপদ জেনেও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে তাঁকে হস্তিনায় যেতে হবে। তাই হস্তিনাপুরে দূত হয়ে যাওয়ার সময় কৃষ্ণ সর্বরকমের সতর্কতা অবলম্বন করলেন। দুর্যোধন এবং তার মন্ত্রণাদাতাদের প্রতি তাঁর কোন বিশ্বাস নেই। তাদের আক্রমণ সম্ভাবনা বিবেচনা করে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হলেন। শ্রেষ্ঠ যুদ্ধরথ গরুড়ধ্বজ, চক্র, গদা, বর্ম ধনু, তূণ, শর প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করা হল। সাত্যকি এবং কৃতবর্মার মত দুই মহাবলকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করলেন। এ ছাড়া অগণিত রথ, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনীও কৃষ্ণের সঙ্গে যাত্রা করল।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসছেন শুনে দুর্যোধন এবং তার ভ্রাতারা বহু অমাত্যসহ তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য নগরের প্রধান ফটকের সম্মুখে অপেক্ষা করতে লাগল। কৃষ্ণের রথ সেখানে পৌঁছনো মাত্র দুর্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে সপ্রীতি নমস্কার জানাল। তারপর মাল্যভূষিত করল তাঁকে। পুরোহিত এসে রক্ত চন্দনের তিলক এঁকে দিল ললাটে। সৌহার্দমূলক কথাবার্তার পর দুর্যোধন বললঃ কৃষ্ণ তুমি আমাদের অতিথি। কৌরব রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করে ধন্য কর আমাদের।

নির্দ্বিধায় কৃষ্ণ বললেনঃ তা হয় না রাজা।

কৃষ্ণের মুখে প্রথম 'রাজা' সম্বোধন শুনে দুর্যোধন একটু আশ্চর্য হল। অনেকক্ষণ

তার বাক্যস্ফূর্তি হল না। এক দৃষ্টে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : তোমার কাছে এরকম আপত্তি আমি প্রত্যাশা করি নি। তুমি কুরুপাণ্ডবদের দুই পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়। তথাপি, তুমি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করলে কোন দোষে, জানতে পারি ?

ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ মধুর স্বরে বললেন : ধীমান্, পাণ্ডবের দূত আমি। তাদের কার্য সম্পন্ন করতে এসেছি। সেই হিসাবে তুমি আমার হতে পার না। পাণ্ডবেরা আমার পরম মিত্র ও প্রাণস্বরূপ। তাদের শত্রু ও আমার শত্রুতে প্রভেদ নেই। যারা পাণ্ডবের শত্রু তারা আমারও শত্রু, সে কারণে আমরা এখন কেউ কারো আত্মীয় হতে পারি না! পরস্পরকে শত্রু ভেবে চলা মঙ্গল! শত্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত। নানা অনিষ্টের আশংকা করেই আমি তোমার আতিথ্য নিতে পারলাম না। পারলে সুখী হতাম অবশ্য। মহামতি বিদুরের গৃহেই আতিথ্য নেব বলে স্থির করেছি।

কৃষ্ণের স্পষ্ট জবাবে দুর্যোধন অত্যন্ত অপমান বোধ করল। মুহূর্তে কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল তার হৃদয় রাজ্যে। মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। এক অব্যক্ত হৃদয় যন্ত্রণায় কাতর হল সে।

চির ঈর্ষান্বিত দুর্যোধনকে এই অবস্থায় দেখে কৃষ্ণ পুলকিত হলেন। তার এই যন্ত্রণা-বিধুর অবস্থাটি তিনি উপভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু ঠোঁটের কোণে সেই মধুর স্নিগ্ধ হাসিটি তখনও লেগেছিল। একটুও ভাবান্তর ঘটল না তাঁর। শত্রু কুপিত হওয়ার মত কোন আচরণ করেন না কৃষ্ণ। মনুষ্যচরিত্রের দুর্বলতম স্থান-গুলিকে চিনে রাখেন তিনি। সেস্থানে মৃদু আঘাতও সহ্য হয় না। অভিমানী দুর্যোধনকে সেরকম এক মৃদু আঘাতে বিমূঢ় করে দিলেন। বাক্যাহত দুর্যোধনকে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কৃষ্ণের হাসি পেল। কিন্তু সে হাসির সঙ্গে বিদায়কালীন প্রীতি বিনিময়ের ঈষৎ মধুর হাস্য যুক্ত হয়ে তা এক অনির্বচনীয় রূপ লাভ করল। শির সঞ্চালন করে যাত্রার ইংগিত করলেন। লাগাম টানতেই অশ্ব টগবগিয়ে উঠল। তেজস্বী চতুরশ্বযোজিত রথ নিমেষকাল মধ্যে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

পরদিবসে আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা করে বিদুরের গৃহ থেকে কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরের রাজসভায় আনা হল। সহস্র শস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য কুচাকাওয়াজ করে চলল কৃষ্ণের আগে আগে। বহু হস্তী, রথ, অশ্বের মধ্যবর্তী হয়ে কৃষ্ণ এলেন হস্তিনাপুরের রাজসভায়। শঙ্খ, বীণা, বেণু বেজে উঠল তাঁর আগমনে। নানাদিক থেকে পুষ্প বর্ষিত হতে লাগল তাঁর মস্তকে। তারপর মাল্যচন্দনে ভূষিত হয়ে বিদুর ও সাত্যকির সঙ্গে কৃষ্ণ রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসনের সম্মুখে আরও একটি সুবর্ণ নির্মিত মণি-রত্ন খচিত সিংহাসন ছিল কৃষ্ণের জন্য। সভায় প্রবেশ করে পিতামহ ও ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। কর্ণ, দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন প্রমুখ কৌরবপক্ষীয় ব্যক্তিরা কৃষ্ণের পশ্চাদভাগে একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করছিল। অকপট বিস্ময়ের ভাণ করে কৃষ্ণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন সভাগৃহ, সভাস্থ অমাত্যবর্গ এবং উপস্থিত নৃপতিবৃন্দকে। বিশেষ করে দুষ্টমতি দুর্যোধন ও তার সঙ্গীদের প্রতি সতর্ক ও সাবধানী দৃষ্টি রাখার জন্যেই সভাগৃহের সৌন্দর্য দেখতে অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস অনুধাবন করতে কষ্ট হল না তাঁর। সকলের চোখ নিরীক্ষণ করে বুঝলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য। সন্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হবে। সুতরাং অনুনয় বিনয় করে কোন লাভ নেই। বরং বক্তব্যকে স্পষ্ট ভাষায় জোরাল ও ধারাল করে তুললে বিরুদ্ধপক্ষের বিতর্কের ধার ও ভার কমে যায়। কিন্তু আক্রমণাত্মক হলে শত্রু বিব্রত ও অসহায় বোধ করে। ক্রোধে বাক্‌রুদ্ধ হয়। অনেক ভেবে কৃষ্ণ স্থির করলেন, কোন বাগাড়ম্বর না করেই ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের অভিপ্রায় জানাবেন।

সভাস্থলে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন: মহারাজ, প্রয়োজন যেখানে বড় সেখানে ভূমিকা নিরর্থক। দেশ কাল অবস্থা থেকে প্রমাণ হয়। আপনার পুত্রেরা অত্যন্ত লোভী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, বিবেকহীন এবং নিষ্ঠুর। তাদের লোভের আদিঅন্ত নেই। সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করতে তারা উদ্যত। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আপনার পুত্রদের সংঘাত আদর্শ বা নীতির নয়। ন্যায় ও ধর্মের সঙ্গে লোভ ও মাৎসর্যের এক কুৎসিৎ লড়াই। পাণ্ডবদের মহত্ত্ব নিয়ে তাই তারা বিদ্রূপ করে। বিশাল সাম্রাজ্যের বিনিময়ে পাঁচ-খানি গ্রাম প্রার্থনা তাদের দুর্বলতা নয়। সহযোগিতার অঙ্গীকার। দুঃখের বিষয়, আপনার পুত্রদের সীমাহীন লোভ তাদের সম্মান ও গৌরব ধরে টান দিয়েছে। আপনার পুত্র দুর্যোধন অধর্মের পথে চলেছে। বিশাল পৃথিবী তার বশে থাকলেও দেবতার আশীর্বাদ পাবে না সে। দেবতার রুদ্ররোষে ধ্বংস তার অনিবার্য। সময় থাকতে আপনি তাকে নির্বৃত্ত করুন।

এক মুহূর্তের জন্য থামলেন কৃষ্ণ। বিস্ময় বিমোহিত হয়ে সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ছে না কারও। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে তারা। চির রহস্যময় হাসির ছোঁয়া লেগে মুখখানি তাঁর অনবদ্য সুন্দর হয়ে উঠল। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট শকুনি, কর্ণ, ভগদত্ত প্রভৃতির দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃষ্ণ বললেন: মহারাজ, আপনার পুত্রেরা যাদের পরামর্শে ও সাহায্যে এ গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তুলল তারা কেউই মিত্র নয় তাদের। নিজ নিজ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত আক্রোশ ও ক্রোধ চরিতার্থ করতে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছে। নির্বোধ দুর্যোধনের হিতৈষী সেজেছে। একদিন তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে দেউলিয়া হতে হবে তাকে। যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের পর নিজের বলে তার দাবি করার

কিছু থাকবে না। এমন কি বিজয়ের গৌরব ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে সে। অতএব, মহারাজ, সময় থাকতে নিবৃত্ত করুন তাদের। পাণ্ডবদের অজেয় শক্তি নিয়ে নির্ভয়ে পৃথিবীর অধিপতি হোন। ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবে না। মহারাজ, পাণ্ডবেরা আপনার সেবা করতে যেমন প্রস্তুত তেমনি যুদ্ধের জন্য তৈরী তারা। আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন।

কৃষ্ণের ভাষণ সকলের হৃদয় স্পর্শ করল। মনে মনে সকলে প্রসংসা করলেন তাঁকে। ধৃতরাষ্ট্রও মুখে কিছু বললেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে পুত্তলিকাবৎ বসে রইলেন। তাঁর স্তব্ধ বিষণ্ণ পাষাণবৎ সকরুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে বিদুরের মায়া হল। ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখে তাঁর হৃদয় হায় হায় করে উঠল। ধৃতরাষ্ট্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে বিদুর ব্যাকুল কণ্ঠে বললেনঃ মহারাজ, আপনি মৌন থাকবেন না। মহাসংকট উপস্থিত। তাই, কৃষ্ণ নিজে সন্ধির প্রস্তাব এনেছেন। হতভাগ্য পুত্রদের উপর অভিমান ত্যাগ করে এখনই নিবৃত্ত করুন তাদের।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দ্বিধা ও সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বললেনঃ সব জেনেশুনেও অসহায় আমি। আমার শক্তি নেই দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করি। সে আমার বশে নেই।

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে রুষ্ট ও উত্তেজিত হয়ে দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললঃ পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমার নিন্দা করছ তুমি। বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ সকলে আমাকেই দোষ দেয়, পাণ্ডবের দোষ কেউ দেখে না। সবার মুখে পাণ্ডবদের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শুধু রক্ত চক্ষু দেখিয়ে কিংবা রূঢ় বাক্যে আঘাত করে আমার প্রত্যাখ্যান পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ্য পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণের মুখের ঈষৎ হাসি ক্রমে বক্র ও কুটিল হল। নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেনঃ পাণ্ডবেরা কিন্তু তোমার কাছে তাদের অধিকার প্রার্থনা করেছিল। আসলে পাণ্ডবদের ঈর্ষা কর তুমি। তাদের ভাল দেখতে পার না। সর্বদা তাদের অনিষ্ট চিন্তা কর। সবংশে তাদের ধ্বংস করার জন্য সব রকম হীন কর্ম তুমি করেছ এবং এখনও করছ। অন্ধ পিতার মত তুমিও অন্ধ। তোমার দৃষ্টি থাকতেও তুমি দৃষ্টিহীন। নিজের অপরাধ তুমি জান, কিন্তু দেখতে চাও না। পাণ্ডবেরা দ্যূত সভায় হেরে গিয়ে তাদের পণ রক্ষা করল, কিন্তু তুমি রক্ষা করলে না তোমার প্রতিশ্রুতি। এতে তোমার গৌরব কি বাড়ছে? নিজের পাপ কেবল জমিয়ে তুলছ। সে কথা থাকুক। পাণ্ডবদের রাজ্য রাজধানী ঐশ্বর্য সম্পত্তি তোমার ভোগের কোন অধিকার নেই। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও।

কৃষ্ণের বাক্যে ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হয়ে দুর্যোধন আহত সর্পের মত হিস্ হিস্ করে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারল না। তাকে নীরব দেখে ভীষ্ম স্নেহ-বিগলিত হয়ে বললেনঃ বৎস দুর্যোধন, কৃষ্ণের কথা শোন। তুমি অবাধ্য হলে পুরুবংশ ধ্বংস হবে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কি ভাল? তার রাজ্য সে নেবে, তুমি তার বাদ সাধবে কেন? আত্মীয় ও প্রজাদের মৃত্যুর নিমিত্ত হয়ো না। তাদের অভিশাপে কখনও ভাল হয় না। আমার অনুরোধ,

তুমি কৃষ্ণের কথা শোন। এবং অন্ধ পিতার বক্ষ তাপ দূর করে তাঁকে একটু শান্তি দাও।

দ্রোণ বললেনঃ বৎস দুর্যোধন, ভীষ্মের অনুরোধ রাখ।

দুর্যোধন নিরুত্তর। কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনের সঙ্গে সে আলোচনা করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হল। তারপর বললঃ শত্রুর নিকট মাথা হেঁট করব না। পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ দেবারও কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ বললেনঃ তোমার প্রতিশ্রুতি ?

অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসল দুর্যোধন। বললঃ প্রতিশ্রুতি পালনের কোন দায়িত্ব পাণ্ডবদের নেই। তারা শর্ত ভেঙেছে প্রথম। কৃষ্ণকে দিয়ে অপমান করেছে। এখন তো আমি আর কিছু করতে বাধ্য নই। সূচের অগ্রভাগে যে পরিমাণ জমি বিদ্ধ হয়, তাও আমি ছাড়ব না।

ভীষ্ম তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললঃ উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ কর না দুর্যোধন। বিরাটের গোধন হরণকালে একা অর্জুনই সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরদের পরাজিত করে তাদের বস্ত্র হরণ করেছিল। সে কথা কি এর মধ্যে ভুলে গেলে ?

দুর্যোধন জ্যা নিক্ষিপ্ত ধনুকের মত ক্রোধে চঞ্চল হল। বললঃ আপনার এবং দ্রোণের বলের উপর আমি খুব নির্ভর করে নেই। আমি কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনি এই চারজনই সমগ্র পাণ্ডবদের বধ করতে পারি।

ধৃতরাষ্ট্র অসহায়ের মত আর্তকণ্ঠে বললেনঃ ওরে বৎস, ক্ষান্ত হও।

কৃষ্ণ দেখলে ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে। বিক্ষোভ আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বলে মনে হল তাঁর। ক্রোধ চঞ্চল নয়নে অগ্নি জ্বলে উঠল। বজ্র নির্ঘোষবৎ আহ্বান করলেনঃ দুর্যোধন।

কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সভাকক্ষ। সভার কোলাহল হল স্তব্ধ। কৃষ্ণের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে গমগম করতে লাগল সভাকক্ষ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তিরস্কারে তাঁর বাক্য হল ক্ষুরধার। বললেনঃ আজ তুমি নিজের বশে নেই। একটা পাপচক্র তোমাকে যেভাবে চালাচ্ছে তুমিও সেইভাবে চলছ। তুমি তাদের হাতের পুতুল। এদের কার্যধারা সম্বন্ধে তোমার এখন সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। এদের চরিত্র এবং অভিপ্রায়ও তোমার জানতে হবে। তুমি কি জান, এরা তাদের অপ্রিয় কাজগুলি তোমায় দিয়ে করাচ্ছে? নির্বোধের মত তাদের নির্দেশ মেনে তুমি কাজ করছ। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি রাজনীতি করছ? পাণ্ডবেরা তোমার ভাই। তারা তোমার ক্ষতি কামনা করে না। অমঙ্গল চায় না। তাই অধিকারের প্রতীক হিসাবে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করল। এত বড় আত্মত্যাগকে যদি তাদের ভয় বা দুর্বলতা বলে মনে কর তাহলে তোমার সিদ্ধান্তে ভুল হবে। ভীম তার কঠিন প্রতিজ্ঞা ভুলে, দ্রৌপদী তার লাঞ্ছনার অপরাধ ক্ষমা করে, ধর্মরাজ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করে শুধু শান্তির জন্য, এক মহা সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য—সকলের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা ভেবে তোমার সঙ্গে সন্ধি চাইছে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহযোগিতার অঙ্গীকার চাইছে। প্রকৃত বন্ধু ও আত্মীয়কে

মূঢ়ের মত ত্যাগ করে তুমি ভুলই করছ। যাদের সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যাদের তুমি বিশ্বাস কর, তারা কিন্তু তোমার বন্ধু নয় কেউ। পরামর্শদাতা শকুনি তোমার পতন ঘটিয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোমাকে ব্যবহার করছে। অথচ তুমি কিছুই জানতে পারছ না। অন্যান্যেরা ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাঁধিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে আপন প্রভুত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। এখনও তুমি মিত্র চেন না। লোভ মাৎসর্যই তোমার বুদ্ধিভ্রংশ করছে। সময় থাকতে যদি সাবধান না হও তা-হলে সব হারাতে হবে তোমায়।

কৃষ্ণের রূঢ় ভর্ৎসনা দুর্যোধনকে ক্ষিপ্ত করল। উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল তার। দুই আঁখি হল রক্তবর্ণ। দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যের কঠোরতা ফুটে উঠল মুখমণ্ডলে। ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। তারপর, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের দিকে তাকিয়ে দুর্যোধন শিরসঞ্চালন করে কি যেন ইশারা করল।

সাত্যকির দৃষ্টি এড়াল না। দুর্যোধনকে সে চোখে চোখে রেখেছিল। তার অভিপ্রায় বুঝে কৃতবর্মাকে খুব কাছে ডেকে লঘুস্বরে বলল: মতিগতি ভাল নয়। সময় থাকতে তৈরী হওয়া ভাল, তুমি সভাকক্ষের দ্বারদেশে পাহারা থাক। আমি এখনই ছদ্মবেশধারী যোদ্ধাদের ব্যূহবদ্ধ করে অস্ত্র বর্ম নিয়ে আসছি। খুব সাবধান, সব দিকে চোখ রাখবে!

সকলের অলক্ষ্যে সাত্যকি সভাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

কৃষ্ণের মুখের হাসির রেখাটি কুটিল হল।

দুরন্ত ক্রোধে অস্থির হয়ে বললেন, দুর্যোধন: শোন পাণ্ডব সখা, রাজনীতির গোড়ার কথা হল প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা। যুধিষ্ঠির শুধু প্রতিপক্ষ নয়, আমার পরম শত্রু। রাজনীতিতে তার অস্তিত্ব আমার কাম্য নয়। সে শুধু একজন মানুষ নয় বিশেষ একটি আদর্শ ও শক্তি। তার ও আমার আদর্শের মধ্যে সংঘাত বেঁধেছে। তাই তাকে মুছে ফেলতে চাই। তাকে ধ্বংস করতে হলে তার গৌরব, মর্যাদা, সম্মান—সব ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু তার অন্তরায় তুমি, তোমার জন্যেই আমরা সুখে শান্তিতে নিশ্চিন্তে রাজ্য ভোগ করতে পাচ্ছি না। তোমার স্বার্থ-সাধনের জন্য তাদের উত্তেজিত কর তুমি। আজ যদি তোমাকে বন্দী করে নির্মূল করতে পারি তাহলে এ যুদ্ধ হবে না। তুমি বন্দী হলে বৃষ্ণিরাও আমার বশে থাকবে। সমগ্র ভারতবর্ষের অধিপতি হব আমি। অতএব তোমাকেই বন্দী করে নিষ্কণ্টক হব আজ।

দুর্যোধনের কথা শুনে কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করে উঠল। বললেন: মূর্খ। তুমি কি মনে করেছ আমি একা? চেয়ে চেয়ে দেখ দ্বারে, দাঁড়িয়ে আছেন মহাবল কৃতবর্মা ও সাত্যকি। আমরা তিনজনে ত্রিভুবন জয় করতে পারি। কিন্তু এখানে বলপ্রয়োগের কোন আবশ্যকতা দেখি না।

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর গান্ধারীকে সঙ্গে করে সভায় প্রবেশ করলেন। উদ্ধত, দুর্বিনীত পুত্রদের অবাধ্যতার সংবাদ গান্ধারীকে বিদুর জানিয়ে-ছিল। তাই, খুব ব্যস্ত হয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি। তারপর পুত্রদের

সম্বোধন করে উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ বৎসগণ, ক্রোধের বশে কুলনাশ কর না। কৃষ্ণ, পিতৃব্য, বিদুর যা বললেন, সবই তোমার কল্যাণের জন্যে। রাজত্বের অর্থ প্রভুত্ব নয়, সর্বজনের মঙ্গল সাধন। রাজনীতির জন্য দরকার দূরদৃষ্টির আর নিরাবেগ চিত্ত। এমন কি নিজেকে নিয়ে অসাধারণ কৌতুক করার ক্ষমতা। এসব শক্তি ও ক্ষমতা তোমার আয়ত্ত নয়। পিতৃব্য, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণকে পেয়ে ভেবেছ তুমি ত্রিভুবনজয়ী হবে। কিন্তু বৎস ভুল। এঁরা সবাই তোমার অন্নে পালিত ও আশ্রিত। তোমার ইচ্ছার অধীন তারা। বেতনভুক কর্মচারী মাত্র। তোমার জন্য তারা কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করবেন, জীবনও বিসর্জন দেবেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কখনও শত্রুর ন্যায় আচরণ করবেন না। তোমাদের মতই পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁরও স্নেহ সম্বন্ধ। ওরে, অভিমানী পুত্র, মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে তোমরা যুদ্ধ থেকে এখনি নিবৃত্ত হও।

গান্ধারীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সভাক্ষেত্র নিস্তব্ধ হয়েছিল। এত নীরব যে একটি সূঁচের পতন শব্দ পর্যন্ত কানে শোনা যায়। গান্ধারীর চক্ষুদ্বয় পট্টবস্ত্রে আবৃত না থাকলে তিনিও দেখতে পেতেন দুর্বৃত্ত পুত্রেরা তাঁর সতর্ক বাণী শেষ হওয়ার আগেই কি ভীষণ অধর্ম কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে! দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন ব্যূহ রচনা করে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এক পা, এক পা করে কৃষ্ণের দিকে এগোতে লাগল।

কৃষ্ণ কিন্তু সেজন্য একটুও ভীত বা বিচলিত হল না। কোনরূপ ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। মুখে তাঁর নির্বিকার প্রশান্তি বিরাজ করতে লাগল। অধরে তাঁর রহস্যমণ্ডিত কৌতুক হাসি। স্থির বিহ্বল দৃষ্টিতে সম্মোহনের যাদু। সে মোহন আঁখির দিকে তাকিয়ে কেউ দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরব ও নিশ্চল হয়ে বসে রইল। সকলেই সম্মোহিত। দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর, যখন তন্ময়তা ভাঙল, বিহ্বলতা কাটল, তখন সভাস্থ ব্যক্তিরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে দেখল ঃ কৃষ্ণ সভাকক্ষে নেই। চার পাষণ্ড আক্রমণের ভঙ্গীতে কাষ্ঠ পুতুলবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পলক পড়ে না তাদের। নিজের চোখকেও বিশ্বাস হয় না। সব অবিশ্বাস্য স্বপ্ন বলে মনে হয়। সকলের মনে একই প্রশ্ন, এরকম অত্যাশ্চর্য, অবিশ্বাস্য, অলৌকিক ঘটনা সত্যি বাস্তবে ঘটে? শ্রদ্ধায় ভক্তিতে, বিশ্বাসে তাঁরা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য প্রণাম করলেন।

বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন হতাশ হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধির শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কৃষ্ণ নিজেও পারল না আসন্ন কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষ রোধ করতে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হল সমাধানের একমাত্র পথ। কিন্তু কৌরবদের মত পাণ্ডবদের সৈন্যসংখ্যা, ত্রিভুবনত্রাস মহারথী এবং রথীর সংখ্যা তাদের বিপুল নয়। তাদের একমাত্র শক্তি সাধুতা ও সত্যবাদিতা। কিন্তু যুদ্ধে সৈন্যসংখ্যা, সমর উপকরণ, দক্ষ রণনিপুণ যোদ্ধা ও সৈন্যাধ্যক্ষের সংখ্যা যার যত অধিক যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা ততই তার অনুকূলে যায়। এ অবস্থায় পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে হলে বিস্তর পরিশ্রম, বুদ্ধি এবং কৌশলের আবশ্যক।

উপপ্লব্য নগরের পাণ্ডব শিবিরে ফিরে যাওয়া তাই কৃষ্ণের কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ল। বিদুর কুন্তীর অনুরোধেও তিনি আর হস্তিনাপুরে একদণ্ড কাটাতে চাইলেন না। সন্ধির সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা করে এখনই যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা অবশ্যক। যুদ্ধের মাত্র সাতদিন বাকি আর। এর মধ্যে সব ব্যবস্থা শেষ করতে হবে তাঁকে। কর্মের গুরুত্ব বুঝে আর কেউ আপত্তি করল না। কৃষ্ণকে বিদায় জানানোর জন্য বিদুর, কুন্তী, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিরা এসেছিলেন। তাঁদের সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণকালে কৃষ্ণ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। চোখে মুখে তার আর্তি প্রকাশ পেল। সকলে ভাবলেন, কৃষ্ণের অন্তর তাঁদের জন্যই কাতর হয়েছে।

আসলে, কর্ণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই কৃষ্ণের ভাবান্তর হল। কর্ণকেই ভয় কৃষ্ণের। অর্জুন বধই তার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। সকাল সন্ধ্যায় সেজন্য নিয়মিত দেবতার আরাধনা করেন, ব্রত, উপবাস পালন করে ইষ্টদেবতাকে সন্তুষ্ট করেন। একদিনের জন্য সে অর্জুন বধের কথা ভুলে থাকে না। কর্ণের মত প্রচণ্ড বিদ্বেষীর হাত থেকে অর্জুনকে রক্ষা করা শুধু দুরূহ নয়, ভীষণ আয়াসসাধ্য কর্ম।

কর্ণের বীরত্ব, মহত্ত্ব, দানশীলতার প্রতি কৃষ্ণের শ্রদ্ধা অপরিসীম। কিন্তু সে অত্যন্ত নীচ, ক্রূর, নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ। তার পরামর্শেই দুর্যোধন বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করে অগ্নিসংযোগের ষড়যন্ত্র করেছিল। কপট দ্যূতক্রীড়ায় কর্ণের ভূমিকা অবহেলার নয়! তারই বুদ্ধিতে বনবাসী পাণ্ডবদের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য সকৌতুকে উপভোগ করার জন্য কৌরবেরা সপরিবারে দ্বৈতবনে গিয়েছিল। এই যুদ্ধোদ্যগের পশ্চাতেও কর্ণ ছিল। এই যুদ্ধের নায়ক সে। তার ইচ্ছায় যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, বললে অত্যুক্তি হয় না। দুর্যোধনের সমস্ত বল ভরসা সে। তার প্রবল পাণ্ডব বিদ্বেষকে দুর্যোধন আপন স্বার্থ-সাধনে ব্যবহার করছে। কর্ণের আনুগত্য ও সাহায্য না পেলে দুর্যোধন পাণ্ডবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হত না। দুর্যোধন জানে একমাত্র কর্ণই তার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে অপমান, অসম্মান ও ক্রোধ নিয়ে লড়বে। কৃষ্ণের মনে হল ; এই কর্ণকে যদি পাণ্ডবদের অনুকূলে আনা যায় তাহলে দুর্যোধনের সংগ্রামের ইতি ঘটবে। সুতরাং কর্ণের আনুকূল্য যে কোন

মূল্যে অর্জন করতে হবে তাকে। অবশ্য তার মত দৃঢ়চেতা পুরুষসিংহকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু আংশিকভাবে তার চিত্ত জয় করা হয়তো কিছু কঠিন নয়।

কর্ণের পাণ্ডব বিদ্বেষের মূল প্রোথিত তার জন্মকুণ্ডলীতে। সে বৃত্তান্ত অজ্ঞাত কর্ণের! প্রিয়তম অর্জুনের জীবন রক্ষার্থে এবং পাণ্ডবদের কল্যাণার্থে সে রহস্য উদ্ঘাটন করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হল কৃষ্ণের। অর্জুনকে সহোদর জানলে কর্ণের সর্বক্ষণ মনে হবে সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাণ্ডুপুত্রেরা সকলেই তারা অনুজ ভ্রাতা। একথা মনে হলে, কর্তব্য ও বুদ্ধির মধ্যে তার একটা সংশয় উপস্থিত হবে। বিদ্বেষ অনুরাগে পরিণত হবে। তখন অর্জুনকে আর শত্রু মনে নাও হতে পারে। দুর্বার স্নেহ ও ভালবাসা তার হৃদয়কে অস্থির করতে পারে। মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে হাত কাঁপবে তখন। পাণ্ডবদের প্রাণ রক্ষায় এর চেয়ে ভাল উপায় জানা নেই তাঁর।

কর্ণের বিশ্বাসের ভিত ভেঙে গেলে সে আর দাঁড়ানোর মাটি পাবে না! এ কাজে কুন্তীই উপযুক্ত। কিন্তু তার পক্ষে কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য। কর্ণ তার আত্মজা। প্রথম যৌবনের অনাঘ্রাত কুসুম। লোকনিন্দা সমাজ নিন্দার ভয়, কুমারীত্বের লজ্জা ঢাকার জন্য জীবনের মাল্য থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিল তাকে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাকে বিসর্জন দিল নদীতে। আজ পুত্রের দাবি নিয়ে কোন্ অধিকারে দাঁড়াবে তার সম্মুখে? কি জবাব দেবে সে কর্ণকে? তবু এ কাজ কুন্তীকেই করতে হবে।

মায়ের পরিচয় দিয়ে দাবী করতে হবে তাকে। পিতৃ-মাতৃ স্নেহ বঞ্চিত কর্ণের তৃষিত হৃদয় বাৎসল্যের সুধারসে সিক্ত করে তার সব ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমানের জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে আপনার বক্ষ মাঝে তাকে টেনে নিতে হবে। অশ্রুধারায় ভিজিয়ে দিতে হবে তার শুষ্ক বক্ষদেশ। কুন্তীর মাতৃস্নেহকে কর্ণজয়ের উপায়রূপে ব্যবহার করলে পাণ্ডবেরা লাভবান হবে। কর্ণের পাণ্ডব বিদ্বেষ প্রশমিত হবে তার ফলে। তার প্রচণ্ড ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসার উত্তাপ ক্ষয় পাবে তাতে। কিন্তু সে কাজের গোড়াপত্তন তাকেই করতে হবে। এরকম অনুকূল পরিবেশ ভবিষ্যতে আর নাও মিলতে পারে। তা-ছাড়া নতুন করে যোগাযোগের সময় হবে না। কৃষ্ণ মনস্থির করে ফেললেন। এইসব চিন্তা ভাবনা করতে কৃষ্ণের কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল।

কৃষ্ণকে বিদায় দিতে যাঁরা এসেছিলেন তার মধ্যে কর্ণও ছিল। কিন্তু অপরাধীর মত সর্বদা দূরে দূরে ছিল সে। কৃষ্ণ ইচ্ছা করেই প্রথম থেকেই তাকে উপেক্ষা করছিলেন। তারপর প্রয়োজনের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য সুন্দর মুগ্ধতা নিয়ে তাকালেন তার দিকে। কর্ণের দৃপ্ত পৌরুষ লজ্জায় মলিন হয়ে আছে। গত দিনের ঘটনার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি সে। তাই, এক অবশ যন্ত্রণায় বিষণ্ণ বিবর্ণ তার মুখ। পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত এবং অদৃষ্ট লাঞ্ছিত চির ভাগ্যহত এই মানুষটিকে দেখলে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত কর্ণের মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কৃষ্ণ। সে

দৃষ্টিতে ঈষৎ কৌতুকের হাসি খেলে গেল। কর্ণের অধর কোণে সঞ্চারিত হল তার পরম প্রশান্তরূপ। স্নেহবশে তার কাছে যাওয়ার জন্যেই রথ হতে অবতরণ করলেন কৃষ্ণ। সহাস্য, সস্নেহে বললেন : তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা অসূয়া নেই কর্ণ। অর্জুনের মত তুমিও আমার প্রিয় এবং পরম আত্মীয়। তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন। অভিমান ত্যাগ করে এস আমার সঙ্গে।

কর্ণও যেন এমন একটা মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিল। কৃষ্ণ প্রীতি ও ক্ষমা লাভের জন্য মনে মনে সে অত্যন্ত আকুল হয়েছিল। তাই, কোন আপত্তি না করে কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথে আরোহণ করল। এত সহজেই যে কর্ণের আনুকুল্য পাবেন, স্বপ্নেও ভাবেননি কৃষ্ণ। মুখে তাঁর আত্মপ্রসাদ মিশ্রিত সাফল্যের হাসি: কর্ণও যোগ দিল তাঁর সঙ্গে।

রথ ছুটল বায়ুবেগে। রথের ধুলোয় আকাশ হল আচ্ছন্ন। সস্নেহে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন : তোমায় কিছু বলার আছে। তোমার পাণ্ডব বিদ্বেষ আমাকে মর্মাহত করে। তারা কেউই ক্ষতি করেনি তোমার। অথচ, তাদের ক্ষতি দেখলে তুমি সুখী হও। দুঃখ দুর্দশায় উৎফুল্ল হও। কিন্তু তুমি জান না তারা তোমার কে? তুমি কে তাদের? তোমরা সবাই সহোদর ভাই। কুন্তীর কানীন পুত্র তুমি। যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। ন্যায়ত ধর্মত যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন তোমার। তুমিই তার উত্তরাধিকারী।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল কৃষ্ণ। বিদ্যুতের মত চমকে উঠল কর্ণ। এ গভীর রহস্যের তল পায় না খুঁজে। দু'চোখের পাতায় পাতায় বিস্ময়। তবু বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অবিশ্বাস কবার মত জোর পায় না মনে। এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীটা তার কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ হয়ে উঠল। পরশুরামের অভিশাপের কথা মনে পড়ল। অসীম সহিষ্ণুতা দেখে অস্ত্রগুরু তাকে ক্ষত্রিয় বলে সন্দেহ করেছিল। গুরুর অনুমান তাহলে যথার্থ! কুন্তীর পুত্র সে! হু-হু করে মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল। দুর্বিষহ চিত্ত বেদনায় তার অন্তর কাতর হল। দু'চোখে তার আর্তি ঝরে পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারল না কর্ণ। বাথাবিকৃত কণ্ঠে কর্ণ ধীরে ধীরে বলল : তোমার কথাই যদি সত্য হয় কৃষ্ণ, তবে জন্মের-সঙ্গে সঙ্গেই সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে আমার। এখন আমি অধিরথ পুত্র। সেই সম্বন্ধই একমাত্র সত্য ও বাস্তব।

কর্ণ আর কিছু বলার আগে কৃষ্ণ সস্নেহে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মস্তক আঘ্রান ও চুম্বন করে বললেন : অভিমানের সময় এখন নয় কৌন্তেয়। পাণ্ডবগণ এবং বৃষ্ণিগণ তোমার সহায়। আমার সঙ্গে পাণ্ডব শিবিরে চল তুমি। সিংহাসনের অধিকারী তুমি। যুধিষ্ঠির তোমার মস্তকে রাজছত্র ধরবেন। দ্রৌপদী তোমার সেবিকা হবে। অন্ধক, বৃষ্ণি, সত্রাৎ তোমার পরম মিত্র ও সহায় হবে। আমরা সবাই মিলে তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করব।

দীর্ঘকাল পরে এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করল সে। এ অভিজ্ঞতা জীবনে তার প্রথম। তাই দুঃসহ ক্লেশে হৃদয় পীড়িত হল। দুঃখে দুর্ভাগ্যে কোন আঘাতই

জীবনের চূড়ান্ত বলে মনে হয়নি কর্ণের। আজ যেন কৃষ্ণের একটি কথায় সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আঁখিকোণে অশ্রুবিন্দু টলটল করতে লাগল। সুপ্রশস্ত বক্ষদেশ অশ্রুতে প্লাবিত হল। চিত্রার্পিতের ন্যায় কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল: মাতৃস্নেহ বঞ্চিত চির অভাগা আমি। অমন করে লোভ দেখিও না আমায়। স্নেহে-প্রেমে কর না দুর্বল। কর্তব্যে এন না সংশয়। আমি চির রাধেয়!

ঈষৎ হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন: ভ্রান্তিবশতঃ যা করেছ তা নিয়ে আক্ষেপ কর না। পাণ্ডবদের স্বার্থ রক্ষাই তোমার কর্তব্য। অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে স্বভাব-বিরোধী কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছ।

কর্ণ বাধা দিয়ে বলল: সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাইছ? আমি নিরুপায়। পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন জেনেও দুর্যোধনকে ত্যাগ করব না। সকলের পাপে ও দোষে পৃথিবী ধ্বংস হবে, তবু আমি, শকুনি, দুঃশাসন ত্যাগ করব না। পৃথিবীর বিনিময়েও নয়।

এই বলে কর্ণকে কৃষ্ণ গাঢ় আলিঙ্গন করে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে ভগ্ন হৃদয়ে প্রস্থান করলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যুদ্ধের সর্বোৎকৃষ্ট কাল হল অগ্রহায়ণ মাস। এ সময় বৃক্ষসমূহ ফলবান, নদী ও দীঘি জলে পরিপূর্ণ, মাঠ সবুজ তৃণে ঢাকা। রাস্তা শুকনো। মনুষ্য খাদ্য ও পশু খাদ্যের অভাব নেই। শ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদও কম থাকে এ সময়। সুতরাং এরকম একটি সময় যখন বিনা প্রতীক্ষাতেই পাওয়া গেল তখন কালক্ষয় না করে কৃষ্ণ অগ্রহায়ণের একাদশী তিথিতে যুদ্ধের শুভারম্ভের দিন ঘোষণা করলেন।

কৌরবদের যুদ্ধোদ্যোগের খবরাদি সংগ্রহের জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত হল। মূক ও বধির সেজে তারা গোপনে সংবাদাদি সংগ্রহ করে পাণ্ডব শিবিরে কৃষ্ণের নিকট পৌঁছে দিতে লাগল। সেজন্য তাদের পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক প্রদানের পরিমাণ বাড়ানো হল। হস্তিনাপুরে পদার্পণ করেই এসব কার্য গোপনে গোপনে সম্পন্ন করলেন কৃষ্ণ।

কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষের ভাবনায় কৃষ্ণ সর্বদা উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুর্যোধনের বিপুল সৈন্যবাহিনীর তুলনায় পাণ্ডবদের সৈন্য সংখ্যা অল্প। কৌরবেরা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রণাঙ্গণ সৃষ্টি করে যুদ্ধকে বিস্তৃত করে পাণ্ডবদের অসুবিধায় ফেলতে পারে। কিন্তু সেজন্য কৃষ্ণ খুব চিন্তিত নন। তাঁর ভয় ও ভাবনা ভীষ্মকে নিয়ে! পাণ্ডবের সাত-অক্ষৌহিনী সেনা তিনি একাই নির্মূল করতে সক্ষম। সমগ্র পাণ্ডব-

সৈন্য একসাথে বধ করবেন বলে দুর্যোধনকে জানিয়েছেন। তারপর থেকে কৃষ্ণের দুর্ভাবনার শেষ নেই। উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় তাঁর দিন কাটে। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম সাধারণের মত মৃত্যুর অধীন নয়। ইচ্ছা না করলে কেউ হত্যা করতে পারবে না তাঁকে। সেজন্যই ভাবনা কৃষ্ণের। যুদ্ধে তাঁকে পরাভূত করা স্বয়ং ইন্দ্রেরও সাধ্যাতীত। একমাত্র কৌশলেই তাঁকে জয় করা যেতে পারে! কিন্তু সে উপায় নির্ধারণে অক্ষম হলেন।

ধ্যানস্থ হয়ে কাটল বহুক্ষণ। পাণ্ডবদের সঙ্গে ভীষ্মের অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক। তাদের সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধ গভীর। ধৃতরাষ্ট্রদের আচরণ ও অশিষ্ট ব্যবহারে তিনি কুপিত। তাদের সঙ্গে অন্নের বন্ধন তাঁর। কাজেই পাণ্ডবদের কোন অমঙ্গল যা বৃহৎ ক্ষতি ভীষ্ম কখনও করবেন না, কিন্তু কর্তব্য সম্বন্ধে ভীষ্ম অত্যন্ত সচেতন। তাহলে পাণ্ডবদের রক্ষার কি হবে?

কৃষ্ণকে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখে হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির বললেঃ সখা, বিশাল কৌরব বাহিনীর সৈন্যাধক্ষ হয়েছেন পিতামহ ভীষ্ম। সর্বশক্তি দিয়েও তাঁকে প্রতিরোধ করা সাধ্যাতীত। যুদ্ধে তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না। এ আমি কি করলাম সখা! রাজ্যোদ্ধারের আশা আমার ত্যাগ করাই ভাল ছিল।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে বললঃ ধর্মরাজ অকারণ আপনি বিচলিত হচ্ছেন। মনস্তাপ ত্যাগ করুন। নিমেষ মধ্যে ত্রিলোক সংহারের অস্ত্র পাশুপাত আমার আছে।

ভীমসেনও বজ্র গম্ভীর স্বরে বললঃ ধার্তরাষ্ট্রদের শমন ভবনে যাত্রা আসন্ন।

ভীমার্জুনের কথার উত্তরে মৃদু হাসলেন কৃষ্ণ। বললেনঃ দিব্যাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে লোকহত্যা অনুচিত। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংসের জন্য শুধু ব্যবহার করা যেতে পারে। অমিততেজা ভীষ্মের কথা ভেবেই শঙ্কিত হচ্ছি আমি।

সকল বিপদ ও বিপর্যয়ের যিনি অনুদ্বিগ্ন থাকেন সেই কৃষ্ণ যখন এত উদ্বেগাকুল তখন তার পরিণাম নিশ্চয়ই ভয়াবহ। হতাশ হয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, তাহলে কি হবে?

কৃষ্ণ নিরুত্তর রইলেন। মুখের চেহারার দৃষ্টিতে উদ্বেগ অনিশ্চয়তার কোন চিহ্ন নেই। নিশ্চিন্ত প্রশান্তির মধ্যে অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠল। জীবন যাত্রার রহস্য বুঝতে পারার কৌতুকে দৃষ্টি তার রহস্যময়। খুব সহজ ভাবে বললঃ কুটবুদ্ধির কৌশলেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণকে জয় করতে হবে। বধ করাও তাঁদের অসম্ভব নয়।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেনঃ আবার সেই কৌশল?

কৃষ্ণ একটু রুষ্ট হয়ে বললেন হ্যাঁঃ মহারাজ, আদর্শবাদ দিয়ে রাজনীতির চাকা ঘোরানো শক্ত! আপৎকালে আরও কঠিন। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সময় ন্যায়, নীতি ও আদর্শ যেভাবে মেনে চলা সম্ভব, রাজনীতিতে এবং যুদ্ধেতে কিন্তু সেরূপ হয় না। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে তার রূপ হয় ভিন্ন। সমাজনীতিতে আদর্শবাদের স্থান আছে, কিন্তু রাজনীতিতে শুধুই স্বার্থ। সমাজনীতির আদর্শ

মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করা, রাজনীতির লক্ষ্য হল জয়। যে-কোন উপায়ে সেই জয় আদায় করে নেওয়া রাজনীতির আদর্শ। রামচন্দ্রের মত ধার্মিক সত্যবাদী রাজাও যুদ্ধে ন্যায় নীতি মেনে চলেননি। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিরপরাধ বালীকে বধ করেছেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধনীতি না মেনে অন্যায়ভাবে মেঘনাদকে হত্যা করেছে। যুদ্ধ ও রাজনীতিতে ন্যায়, ধর্ম নীতি, আদর্শ বলে কিছু নেই। শুধু জয়-ধর্ম আছে। রাজনীতিতে মানুষের উত্থান, পতন, ত্রুটি, বিচ্যুতি নিয়েই সে সম্পূর্ণ।

যুধিষ্ঠিরের মুখে সহজে কথা সরলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেনঃ তোমার এসব কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছি না।

মহারাজ, আপনাকে সতর্ক ও সাবধান করে দেওয়ার জন্যে রাজনীতির জটিল ও গূঢ় রহস্যের কথা বললাম। কারণ ধর্মপথে চলাই আপনার আদর্শ। কিন্তু পাত্র ভেদে স্থান ভেদে ধর্মের রূপও হয় আলাদা। ঋষিদের উপদেশ আপনার অজানা নয়। ধর্ম আসলে এক বহুরূপী ধারণা। অনেক বিপরীত আচরণকেও ধর্মের দ্বারা সমর্থন করা যায়। আপৎকালে সব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতিতে তাই প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই নীতি নির্ধারণ করা হয়। কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করা যুদ্ধে সম্ভব হয় না। মিথ্যার সঙ্গে আপোষ, বিবেকের সঙ্গে ছলনা করে চলতে হয়।

সনিঃশ্বাসে বললেন ধর্মরাজ—আমার নেতৃত্বে অনেক দোষ দুর্বলতা আছে জেনেই তুমি এসব কথা বলছ। কিন্তু ধর্ম ও সত্যকে বাদ দিয়ে যে যুদ্ধ, সে জঙ্গলের যুদ্ধ।

যুধিষ্ঠিরের কথায় কর্ণপাত করলেন না কৃষ্ণ। আগের কথার সূত্র ধরেই তার জবাব দিলেনঃ সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। মিথ্যা কখনও কখনও সত্যের মত হিত হয়। সত্য কোথাও মিথ্যার মত ক্ষতিকর হয়। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য মিথ্যা বললেও অধর্ম হয় না।

কৃষ্ণের অকাট্য যুক্তির প্রতিবাদ করার মত ভাষা ছিল না যুধিষ্ঠিরের। তবু মনের মধ্যে একটা নিরন্তর অস্বস্তি বিদ্ধ করতে লাগল তাঁকে।

কুরুক্ষেত্রের হিরন্মবতী নদীর তীরবর্তী উন্মুক্ত প্রান্তরে কৌরব ও পাণ্ডবের বিশাল সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করা হল। পাণ্ডবেরা সসৈন্য পূর্বমুখ হয়ে অবস্থান করছিল। নিজ নিজ দলের সৈন্যদের সহজে চেনার জন্য উভয় পক্ষই তাদের সৈন্য-বাহিনীর পোশাক ও আভরণ ভিন্ন ভিন্ন করল। বিচিত্রবর্ণের পতাকাসমূহ বাতাসে নিরন্তর আন্দোলিত ও হিল্লোলিত হচ্ছিল। অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তির বৃংহণে, রথের ঘর্ঘর শব্দে, সৈন্যদের কোলাহলে, অস্ত্রের ঝনঝনায়, রঙ্গভূমি মুহুর্মুহু শিহরিত হল। উৎক্ষিপ্ত ধূলো ও বালিতে আকাশ হল আচ্ছন্ন। সূর্যরশ্মি নিষ্প্রভ ও ম্রিয়মান হল।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট ক্ষণে, যুদ্ধ ভেরী বেজে উঠল। ভীমনাদে শঙ্খ ধ্বনিত হল। আকাশ, বাতাস হল উতলা। অশ্ব, গজ, রথী শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হর্ষোৎফুল্ল হল। সৈন্যগণ তুমুলরবে কোলাহল ও চীৎকার করে উঠল।

পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সৈন্যরা অস্ত্র ধারণ করে প্রস্তুত হয়েছিল। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যুদ্ধোন্মত্ত হল তারা। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত সৈন্যবাহিনী আক্রোশে, রোষে গর্জন করতে লাগল।

চতুর্দিক থেকে শঙ্খ ও ভেরীধ্বনি একত্র হয়ে তুমুল কোলাহলের উৎপত্তি হল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির তাঁর রণসাজ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে রথ থেকে নেমে পদব্রজে রণম্মোত্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দিয়ে নির্ভয়ে কৌরব বাহিনীর অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। কৃষ্ণের ইংগিতে অর্জুন ও ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। চিরঅভ্যস্ত রহস্যময় হাসিটি কৃষ্ণের অধর কোণে বঙ্কিম ও কুটিল হয়ে ফুটল।

যুধিষ্ঠিরকে এমনভাবে আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্য এবং অন্যান্য বীরগণ অত্যন্ত বিস্মিত হল। পরস্পরের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, যুধিষ্ঠির ভীরু কাপুরুষ। যুদ্ধে অশক্ত। তার জন্যই ভাইদের দুর্গতি। কৌরবদের সমরকুশলী সৈন্যবাহিনী দেখে ভীত তিনি। তাই, পিতামহ ভীষ্মের কাছে করুণা-ভিক্ষার জন্য উন্মত্তের মত ছুটে আসছেন।

ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের অপ্রত্যাশিত আগমন উপলক্ষ্য করে দুর্যোধনের মনে নানা সংশয় ও জিজ্ঞাসা প্রবল হল। লোকক্ষয়ের কথা বিবেচনা করেই হয়ত ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির সংগ্রামের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে চান। তাই বোধ হয়, শান্তির জন্য ভীষ্মের শরণাপন্ন হচ্ছেন। যুধিষ্ঠির তার ভাইদের নিয়ে আবার বনবাসী হবে, সে কথা চিন্তা করে দুর্যোধন অত্যন্ত পুলকিত হল।

কোন কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে যুধিষ্ঠির নতমস্তকে ভীষ্মের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রথ প্রদক্ষিণ করে তাঁর চরণে মাথা নত করলেন। ভীম ও অর্জুন তাঁকে অনুসরণ করলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এবং মহাব্রত সাধনের জন্য তাঁর আশীর্বাদ চাইলেন।

যুধিষ্ঠিরের বিনয় আচরণে ভীষ্ম অত্যন্ত প্রীত ও হৃষ্ট হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ক্ষোভ ও হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন: বৎস, আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ সত্য ও ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে পারলাম না বলে আমার অপরাধ নিও না। দুর্যোধনের অর্থ ও অন্নের দাস আমি। সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব মৃত্যুতে। এখন বল, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?

বিনীত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির বললেন: পিতামহ আপনার স্নেহ ও প্রীতিসূত্রে বন্ধ আমরা। আমাদের কোন ক্ষতি অমঙ্গল আপনি করবেন না জানি। তবু, অনুগ্রহ করে বলুন, আপনাকে কোন্ উপায়ে জয় করব?

ভীষ্ম ঈষৎ হেসে বললেন: বৎস, ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী দেবব্রতকে যুদ্ধে পরাজিত

করতে পারবে এমন পুরুষ দেখি না। স্ত্রী থেকে পুরুষ হয়েছে এমন লোককে আমি শরাঘাত করি না। শিখণ্ডী আমাকে বাণদ্বারা আঘাত হানলেও বধ করব না তাকে। তবে সে সময় হয়নি এখন। ঠিক সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ তোমাদের জানাবেন।

ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির গেলেন দ্রোণের কাছে। ভীষ্মের মত দ্রোণও অন্নদাস হওয়ার পরিতাপ করলেন। যুধিষ্ঠির একই প্রশ্ন করলেন তাঁকে। প্রত্যুত্তরে দ্রোণ জানালেন ঃ অস্ত্রত্যাগ না করলে কেউ আমায় বধ করতে পারবে না। অপ্রিয় সংবাদে যদি কখনও অচেতন প্রাণ হয়ে মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই বধ করা যেতে পারে আমাকে।

তারপর কৃপাচার্য, শল্যকে অনুরূপ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্যদলের মধ্যে ফিরে গেলেন।

অনেক ভেবে কৃষ্ণ সামাজিক শিষ্টাচার ও সৌজন্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে ব্যবহার করলেন। উদ্দেশ্যকে আন্তরিক এবং অকপট করার জন্য ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে নিযুক্ত করলেন। এবং তাঁর বিনয়োচিত নম্র আচরণ ও মধুর ব্যবহারকে কূট রাজনীতির হাতিয়ার করে তুললেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের হৃদয় জয় করে যুধিষ্ঠির বিজয় গৌরবে শুধু প্রত্যাবর্তন করলেন না, তাদের বধোপায়ও জেনে এলেন। পাণ্ডবদের জয়লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সমাপ্ত হওয়ার সাফল্যে ও প্রচ্ছন্ন গর্বে কৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল এক অবর্ণনীয় কৌতুকানুভূতির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অনুভূতির মধ্যে এক অজ্ঞাত নূতন জগৎ যেন ধীরে ধীরে দ্বার খুলে দিল। প্রতিদিন আপনার দূরদৃষ্টির মূল্য ও তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। আর সে মূল্য বোঝেন বলেই আপনার বিশ্বাস ও বুদ্ধিকে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগের চিন্তা করেন।

ঘোরনাদে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে পাণ্ডব সৈন্য অত্যন্ত অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করল। প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে তারা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করতে লাগল। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রমুখ বীরেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে নির্মমভাবে পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করতে লাগল। অগণিত অশ্ব, হস্তী, রথী নিহত হল। কালান্তক ভীষ্মের হস্তে যেভাবে পাণ্ডব সৈন্য ও রথীরা প্রাণ হারাতে লাগল প্রতিদিন তাতে কৃষ্ণ নিজেই বিচলিত বোধ করলেন। পরিতাপ ও অনুশোচনায় যুধিষ্ঠির বিমূঢ়। শোকার্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন ঃ বুদ্ধির দোষে এ আমি কি করলাম সখা! কালান্তক ভীষ্মের হাত থেকে আমাকে উদ্ধারের পথ বলে দাও।

অদূরে মাথা নত করে বসেছিল অর্জুন। কুণ্ঠা ও সংকোচের অন্ত ছিল না তার। যুদ্ধকালে পিতামহ ভীষ্মের প্রতি মানবসুলভ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে কৃষ্ণের দৃষ্টি এড়ায়নি। এই আকস্মিক যুদ্ধ অনীহা তার এক অক্ষম্য আত্মবিদ্রোহ। অবজ্ঞা মিশ্রিত কৃপাদৃষ্টিতে কৃষ্ণ তার দিকে তাকালেন। পলকের তরে কেঁপে উঠল অর্জুন। আত্মধিক্কারে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

ক্রোধে কৃষ্ণের সর্ব শরীর জ্বালা করছিল। ব্যঙ্গ বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে

অর্জুনের বিবেক ও কর্তব্য বুদ্ধিকে বিদ্ধ করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেনঃ মহারাজ, পরিতাপ করা আপনার উচিত নয়। আপনার মর্মবিদারী দুঃখের জন্য তৃতীয় পাণ্ডব দায়ী। পাণ্ডবদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য তৃতীয় পাণ্ডবের প্রগাঢ় কৌরব প্রীতিই একমাত্র কারণ। ভীষ্মের সাথে যুদ্ধ পরাঙ্মুখ অর্জুন। তাই, সর্বদা দূরে দূরে অবস্থান করছে। প্রীতিবশতঃ ভীষ্ম কিন্তু কর্তব্যভ্রষ্ট হননি। কালান্তকের মত নির্বিচারে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করছেন। অর্জুন তার প্রতিরোধে অশক্ত। ধিক্‌; অর্জুনের পরাক্রমে। আপনার আজ্ঞা পেলে আমিই ভীষ্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি। পাণ্ডবের শত্রুকে সংহার করতে আমার বাধা কোথায়? বলতে বলতে খুবই উত্তেজিত হলেন কৃষ্ণ। বিদ্যুতের মত চক্ষু তাঁর জ্বলে উঠল।

কৃষ্ণের রূঢ় বাক্যে অর্জুনের হৃদয় প্রজ্জ্বলিত হল। ক্রোধে ভয়ংকর হল তার মুখ। এক অনুচ্চারিত দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায় তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠিন হয়ে উঠল। ভ্রূকুটি করে আরক্ত চোখে তাকাল কৃষ্ণের মুখের দিকে। পৌরুষের স্পর্ধায় তার কণ্ঠস্বর হল আবেগকম্প।—না, না, সখা ক্রোধ সংবরণ কর। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে গাণ্ডীবীকে লাঞ্ছিত করার আর দরকার হবে না। আমার উপর বিরক্ত হয়ে থাকলে শাস্তি দাও। মোহ ও দুর্বলতাবশতঃ যে অন্যায় ও ক্ষতি করেছি পাণ্ডবদের, তার প্রায়শ্চিত্ত করব এখন থেকে। পুত্রের নামে শপথ করছি, প্রতিজ্ঞা কখনও লংঘন করব না।

কৃষ্ণ প্রচ্ছন্ন হয়ে রথে উঠলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে সর্বদিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন।

নয়দিন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেও পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে নিরস্ত্র করতে পারল না! অর্জুনও ব্যর্থ হল তাঁকে প্রতিরোধ করতে। বিপুল পাণ্ডবসৈন্য ও রথীর মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির বিমর্ষ ও শোকমগ্ন। কৃষ্ণ চিন্তান্বিত। গাণ্ডীবী হতবুদ্ধি। ভীম স্তম্ভিত। অন্যান্য মিত্রেরা বিভ্রান্ত। সৈন্যেরা নিরুৎসাহ।

পাণ্ডব শিবিরে সকলেই শোকমগ্ন। বিষাদ সাগরে ডুবে আছে ত্যরা। কালান্তক ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণের স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। একটা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন আকাশ থেকে খসে পড়েছে পাণ্ডব সৈন্যের উপর। ভীষ্মের যুদ্ধ কৌশল আশ্চর্য সুন্দর। ক্ষিপ্রগতিতে তিনি আক্রমণ করেন শত্রুকে। আক্রমণের পূর্বেই আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র ও বিভ্রান্ত করেন। তাঁর, রণকৌশল শুধু অভিনব নয়, সর্বতোভাবে আধুনিক। প্রতিদিন তিনি বিচিত্র ব্যূহ রচনা করেছেন। বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধ করেছেন।

ক্রমাগত যুদ্ধ করে ভীষ্মও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রমজনিত ক্লান্তির অবসাদে দেহ তাঁর অবসন্ন। আহত হওয়ার বেদনায় অঙ্গ তার আড়ষ্ট। চোখে তাঁর অব্যক্ত আকৃতি। মুখ মলিন ও বিষণ্ণ।

যুদ্ধে তাঁর মনোযোগের অভাব। তাঁকে রক্ষার জন্য দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি রথীরা সর্বদা পাশে পাশে অবস্থান করছেন।

বিশ্বস্ত চরেরা প্রতিনিয়ত কৃষ্ণকে খবর দিচ্ছে যে ভীষ্ম অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

অধর্মের যুদ্ধে বহু পাণ্ডব সৈন্য, বীর রথী হত্যা করে তিনি ভীষণ আত্মগ্লানি অনুভব করছেন। তাদের বিয়োগজনিত দুঃখের মর্মপীড়ায় তাঁর বিবেক ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। যুদ্ধে তাঁর অনিহা জেগেছে। বিতৃষ্ণা জন্মেছে নিজের উপর! এই পঞ্চভূতের শরীর ধারণে তাঁর আর ইচ্ছা নেই। দেহরক্ষার সংকল্প জেগেছে মনে।

ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্যুৎরেখার মত এক বিচিত্র হাসি খেলে গেল কৃষ্ণের। অস্ফুট কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেনঃ 'নিয়তি, সবই নিয়তি।' হঠাৎ এরকম একটি কথা মুখ দিয়ে প্রকাশ হওয়ায় ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হলেন তিনি।

অধীর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব তাকিয়েছিল কৃষ্ণের দিকে। প্রদীপের আলোয় ভাল করে কারও মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই কৃষ্ণের মুখের ভাব তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। মনের দ্বিধা, জড়তা ও সংকোচ কাটিয়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিগ্যেস করলেন: সখা ভীষ্ম জীবিত থাকতে পাণ্ডবের বিজয় অসম্ভব। কালান্তক ভীষ্মের প্রতিরোধের উপায় বল, অথবা কর্তব্য নির্দেশ কর।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন আত্মসচেতন করল কৃষ্ণকে। বিহ্বল চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর হল। বিপদের সময় মানুষের দৃষ্টি যেমন সতর্ক হয় ঠিক তেমনই একটা সাবধানীভাব তাঁর আচরণে প্রকাশ পেল। যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন: মহারাজ, ভীষ্ম রণক্লান্ত। মৃত্যুর লগ্ন উপস্থিত তাঁর। ভীষ্ম বধ নির্ভর করছে অর্জুনের পরাক্রমের উপর।

অপরাধীর মত তাকাল অর্জুন। সীমাহীন বিষণ্ণতায় দৃষ্টি তার বেদনাবিধুর। চিত্ত ও বুদ্ধির সংঘর্ষে অত্যন্ত ক্লান্ত। মিনতি করে বলল: আমায় ক্ষমা কর সখা। বাল্যকালে তাঁর কোলে উঠে পিতা বলে ডেকেছি। কত আদর করে চুম্বন এঁকে দিয়েছে মুখে। বুকে চেপে ধরে তিনি কত আদর করেছেন, ঘুম পাড়ানির গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন, খেলার নিত্য সঙ্গী হয়েছেন। আজ নিষ্ঠুর শরে তাঁর হৃদয় বিদ্ধ করতে পারব না, কিছুতেই না। তিনি যেমন ইচ্ছা সৈন্য ধ্বংস করুন। আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

এক অশ্চর্য সুন্দর মুগ্ধতা নিয়ে কৃষ্ণ তাকালেন তার দিকে। ওষ্ঠে তার রহস্যময় কৌতুক হাসি। বললেন: সখা তুমি ক্ষত্রিয়। একদিন কিন্তু ভীষ্ম বধের প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এ কি সখার সঙ্গে সখার কৌতুক? তুমিও জান ভীষ্মকে বধ করতে না পারলে লোকে কাপুরুষ বলবে তোমাকে। শত্রুরা হাসবে। মিত্ররা আশাহত হবে। ভ্রাতাদের কাছে চির অপরাধী হবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের লজ্জায় গাণ্ডিবীর পৌরুষ হবে কলঙ্কিত। প্রিয়তম সখার দুঃখ ও লজ্জার গ্লানি আমিও সইতে পারব না। তা হলে সখার ইচ্ছা কি আমি আত্মবিসর্জন দিই।

অর্জুন স্তব্ধ। নির্বাক বিস্ময়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। অর্জুনের চোখে নীরব সম্মতি লক্ষ্য করে পুলকিত হলেন কৃষ্ণ। ঈষৎ হাস্য করে বললেন: শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ কর তুমি। শিখণ্ডীকে দেখা মাত্র ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করবেন। শিখণ্ডী তাকে শরবিদ্ধ করবে তখন। কিন্তু সে বাণে ভীষ্মের মত মহারথী আহত হয় কিন্তু নিহত হয় না। শিখণ্ডী অগ্রে

থাকলে তোমার শর হানা কোন বাধা হবে না। ভীষ্ম ভাববেন শিখণ্ডীই শর হানছে তাঁকে।

পরদিন প্রভাতে পাণ্ডবেরা সর্ব শত্রুজয়ী ব্যূহ রচনা করল। তাদের ব্যূহ রচনার কৌশল দেখে দুর্যোধন মনে মনে প্রমাদ গণল। মুহূর্তে পাণ্ডব বাহিনী সমগ্র রণাঙ্গণ জুড়ে তাণ্ডব শুরু করল। ভীষ্মের সাহায্যের পথ বন্ধ হল। তখন কৃষ্ণের নির্দেশ মত শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অর্জুন শর বর্ষণ করতে করতে ধাবিত হল ভীষ্মের দিকে। জীবনের আশা ত্যাগ করে ভীষ্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু ক্লান্ত শরীর অল্পতেই কষ্টবোধ করছিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার। মরণার্তনাদে চিত্ত মুহুর্মুহু চঞ্চল হচ্ছিল। বারংবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। অধর্মের পক্ষে যুদ্ধ করতে কোন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ধনুতে শরসংযোজন করতে তাঁর হাত কাঁপছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল শরগুলি। দুর্যোধন দূর থেকে সবই দেখছিল, কিন্তু কাছে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পেল না। ভীষ্ম এত পরিশ্রান্ত যে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে যুদ্ধ করছেন।

এমন সময় শিখণ্ডীকে অর্জুনের রথে আরূঢ় দেখে ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ত্যাগ করলেন। বজ্রতুল্য বাণের ভীম প্রহারে যখন তাঁর দেহ বিদ্ধ হতে লাগল তখন বুঝতে পারলেন এ বাণ শিখণ্ডীর নয় অর্জুনের। তখন ভীষ্ম শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অর্জুন মধ্য পথেই তা খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। ভীষ্ম তখন ঢাল ও খড়্গ নিয়ে আক্রমণের জন্য রথ থেকে নামবার উপক্রম করলেন। কিন্তু অর্জুন তীক্ষ্ণশরজালে তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেললেন যে, এক পাও অগ্রসর হতে পারলেন না। প্রতি-আক্রমণের কোন সুযোগও অর্জুন দিল না তাঁকে। সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হল তাঁর দেহ। ভীষ্ম আর রথে বসতে পারলেন না। উল্টে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ভীষ্মের পতনে কৌরবগণ বিমূঢ় হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা রোদন করতে লাগল। অর্জুন এবং তার অন্যান্য ভ্রাতারা মৃত্যু পথযাত্রী পিতামহকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য নতমস্তকে দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করল। কৃতকর্মের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করল অর্জুন। তারপর তাঁর দেহ প্রদক্ষিণ করে শিবিরে ফিরে যাওয়ার জন্য পঞ্চভ্রাতা সহ কৃষ্ণ রথে আরোহণ করল।

ষোড়শ অধ্যায়

কর্ণ এতদিন যুদ্ধ করেনি। ভীষ্মের পতনের পর অস্ত্র ধারণ করবে সে। তার আবির্ভাব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নতুন প্রাণসঞ্চার করবে। আনবে নতুন উন্মাদনা। যুদ্ধে কর্ণের ইন্ধনের কথা মনে রেখেই কৃষ্ণ ভাবছিলেন, কর্ণ এখনও মন থেকে অর্জুন বিদ্বেষ মুছে ফেলতে পারেনি। পাণ্ডবদের প্রতি দ্বেষ হিংসা ভুলে তাদের ভাই বলে

গ্রহণের যে অন্তিম আবেদন পিতামহ ভীষ্ম করলেন তাতে কর্ণপাত করল না। বরং কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল: মহাবাহু, আমি দুর্যোধনের অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়েছি। অর্জুন বধের জন্য আশ্রয় করেছি তাকে। কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদের জয়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমিও তেমনি দুর্যোধনের জন্য আমার পৌরুষ. বিবেক, কর্তব্য বুদ্ধি এবং জীবন উৎসর্গ করেছি।

যন্ত্রণাকাতর মুখে ঈর্ষৎ হেসে ভীষ্ম বললেন। কর্ণ, পাণ্ডুপুত্রেরা তোমার সহোদর ভাই। তাদের প্রতি তোমার আক্রোশ কিংবা বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। অর্জুনকে শত্রুরূপে দেখাও পাপ। ঈর্ষা, ক্রোধ ত্যাগ করে নিরহংকার হয়ে ধর্মের জন্য, ধর্ম লাভের জন্য, যুদ্ধ কর।

প্রচণ্ড অর্জুনবিদ্বেষী কর্ণ তবু নিরুত্তর! বাসবাস্ত্রের অধিকারী কর্ণ। এই অস্ত্রই কর্ণকে অহংকারী করে রেখেছে। অর্জুন সংহারের জন্য এই শক্তিশালী বজ্রাস্ত্রকে কর্ণ সর্বদা আপনার কাছে রাখে। অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে সে তার ব্যবহার করবে। সেজন্যেই কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন।

দ্রৌপদীর বরমাল্য প্রত্যাখ্যানের মর্মান্তিক অপমানের চিত্তদাহী জ্বালা কর্ণ ভোলেনি, ভুলবে না কখনো। আর সেজন্য অর্জুনকে তার প্রবল প্রতিপক্ষ মনে করে। তাকে বধ করে দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণের জন্য অর্জুনের সঙ্গে তাকে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেই হবে। অস্ত্রযুদ্ধে তার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া অবধি কর্ণের শান্তি ও স্বস্তি নেই।

কুন্তীর আকুল প্রার্থনাও পারেনি তার মন গলাতে। অর্জুন ব্যতীত অন্য সব ভ্রাতাকে সে ভাই বলে গ্রহণ করেছে। তাদের উপর সব আক্রোশ ভুলেছে।

কিন্তু পারেনি কেবল অর্জুনকে ক্ষমা করতে! বৈরীতা থেকে দেয়নি তাকে মুক্তি। সে রয়ে গেল তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্জুন বিনাশের জন্যই কর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। কার্যতঃ যুদ্ধ এখন কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষের পরিবর্তে কর্ণার্জুনের শক্তি পরীক্ষার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। কর্ণ সুকৌশলে দুর্যোধনকে দিয়ে সেই ভাবেই যুদ্ধের কৌশল তৈরী করছে। একমাত্র অর্জুন বধের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই যুদ্ধের চরিত্র ও চেহারা বদলে যাচ্ছে। সুতরাং অর্জুনের প্রাণ রক্ষার কথা মনে রেখেই যুদ্ধনীতি ও কৌশল উদ্ভাবনের কথা ভাবছিলেন কৃষ্ণ!

এমন সময় চর প্রধান কুন্তক প্রবেশ করল সেখানে। কৃতাঞ্জলিপুটে বলল: ভীষ্মের পতনে দুর্যোধনের মনোবল ভেঙে পড়েছে। পরাজয়ের আশংকায় দুর্যোধন উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী ভীষ্মকে যখন পাণ্ডবেরা বধ করতে পারে তখন তাদের অসাধ্য কিছু নেই। যাই হোক, কর্ণের পরামর্শে দ্রোণ ভীষ্মের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু দুর্যোধন তাঁর উপর তেমন নির্ভর করতে পারছে না। কারণ, তার ধারণা, দ্রোণ স্নেহবশতঃ পাণ্ডবদের হত্যা করবে না। তাই, কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার জন্য পরামর্শ দিল তাকে। দ্রোণাচার্য জীবিত অবস্থায় ধর্মরাজকে বন্দী করবে, পুনর্বার তাঁকে দ্যূত ক্রীড়ায় বাধ্য করা হবে।

কুন্তকের সংবাদ শুনে হাসলেন কৃষ্ণ।

কৃষ্ণকে হাসতে দেখে কুন্তক অবাক হল। বলল ঃ এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শুনে আপনার হাসি পেল! আমি ভাবলুম কত বাহবা পাব।

প্রসন্ন কৌতুক দৃষ্টি মেলে কৃষ্ণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। ধীরে ধীরে কুন্তক বলল ঃ যুধিষ্ঠির মহাত্মা। পাশা খেলায় আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষে কঠিন। সকল আহ্বানকে হৃষ্ট মনে গ্রহণ করাই তাঁর ধর্ম। যুধিষ্ঠির রাজী হওয়ায় অর্থ পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্য পুনরায় বরণ করা।

কৌতুকরঞ্জিত হাসিতে কৃষ্ণের চক্ষু দুটি প্রদীপ্ত হল। বলল ঃ তোমার অনুমান যথার্থ। তার কি বুঝলে বল?

এরকম প্রশ্নের জন্য কুন্তক তৈরি ছিল না। তাই একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল ঃ মানে, যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। তাঁকে সর্বদা সতর্ক প্রহরায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কৃষ্ণের দৃষ্টি কুটিল ও বক্র হল। বলল ঃ আর কিছু ভাবতে পার?

কৃষ্ণ কখনও প্রশ্ন করেন না তাকে। খবর সংগ্রহই তার পেশা। কিন্তু তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা কাজ নয় তার। তাই, সে নিয়ে মাথাও ঘামায় না কখনও। কৃষ্ণের আকস্মিক প্রশ্নে তাই বিব্রত বোধ করল সে। বলল ঃ মানে,—আর কিছু মনে পড়ছে না।

হাসলেন কৃষ্ণ। বললেন ঃ আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

দুর্যোধন লোভে সত্যি উন্মাদ হয়েছে। নইলে, জীবিত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার কথা কেউ ভাবতে পারে? যুধিষ্ঠির এখন অনেক বদলে গেছে। আগের মত আর নেই। দুর্যোধন বোধ হয় সে সংবাদ রাখে না। রাখলে এসব স্থূল ভাবনা আসত না তার মাথায়। আপন ভালমন্দ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির এখন অত্যন্ত সচেতন। যুদ্ধের জয় ছাড়া অন্য কোন ভাবনা তাঁর মনে আসে না। রাজধর্মই এখন তাঁর একমাত্র ধর্ম। যুদ্ধ ও রাজনীতির স্নায়ু-যুদ্ধে অনেক অন্যায়, অধর্ম আচরণকে সমর্থন করেছেন তিনি। মাতুল শল্যকে যুদ্ধের সময় সারথির কর্তব্য করতে নিষেধ করেছেন তাকে। ধর্মাধর্ম না মেনেই কর্ণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে প্ররোচিত করেছেন তাকে। কৌরবপক্ষের অগোচরে ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর বধোপায় জেনে নিয়েছিলেন। দ্রোণবধের উপায়ও কৌশলে জানা হয়ে গেছে তাঁর। এরকম আরও অনেক ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় ভবিষ্যতেও হয়ত নিতে হবে তাঁকে। যুধিষ্ঠির এখন মনে প্রাণে একজন ক্ষত্রিয় রাজা। রাজধর্ম ও যুদ্ধধর্মের সঙ্গে চিরন্তন ধর্মের তো প্রভেদ আছে, যুধিষ্ঠির এখন তা সম্যক উপলব্ধি করেছেন। সেজন্য কোন অবস্থাতেই তাঁকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। যুধিষ্ঠির সম্পর্কে কৃষ্ণের তাই বর্তমানে উদ্বেগ নেই। আসলে অর্জুনকে মুখোমুখি লাভ করার জন্য কর্ণ এই ফন্দী করেছে। যুধিষ্ঠিরের প্রাণ রক্ষার জন্য অর্জুন সর্বদা তার দেহরক্ষী হয়ে সংগ্রাম করবে। সেই সুযোগে সে বাসবাস্ত্র প্রয়োগ করে হত্যা করবে তাকে। মনে মনে কর্ণের মেধার প্রশংসা করলেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও আকাংখা এতই স্পষ্ট যে দ্রোণাচার্য পর্যন্ত সে অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। তার অভিপ্রায় ব্যর্থ করার জন্য পাণ্ডবপ্রাণ

দ্রোণাচার্য ক্রূর হেসে বললেনঃ 'যুদ্ধকালে অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে তবে ধরে নিও যুধিষ্ঠির আমাদের বশে এসেছেন। তুমি যে উপায়ে পার অর্জুনকে অপসারিত কর। তাহলেই ধর্মরাজ বিজিত হবেন।

আশ্চর্য বুদ্ধিবলে দ্রোণাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে পৃথক করলেন। সেজন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেন কৃষ্ণ। দুর্যোধন নিজের বুদ্ধির ফাঁদে নিজেই আটকা পড়লেন। কর্ণ হতাশ হল। অথচ, সেজন্য দ্রোণাচার্যকে সন্দেহ করার কোন অবকাশ রইল না। কারণ তাঁর উক্তি অত্যন্ত সত্য। অর্জুন উপস্থিত থাকলে স্বয়ং দেবতাদেরও সাধ্য নেই যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা।

দুর্যোধনের নিয়তিকে কৃষ্ণ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সে যেন চতুর শিকারীর মত অতি সন্তর্পণে এক পা করে অগ্রসর হচ্ছে শিকারের দিকে। শিকারকে সে যেন লক্ষ্যের মধ্যে পেয়ে গেছে। নিশানা স্থির করে শর নিক্ষেপ করতে যেটুকু সময় বাকি। দুর্যোধনের দুর্ভাগ্যের জন্য একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর।

দ্রোণাচার্যের নির্দেশ মানলে দুর্যোধনকে আগামীকাল যুদ্ধ বিস্তৃত করতে হবে। আক্রমণের গতি তীব্র ও ভয়ানক করতে হবে। সংশপ্তক বাহিনী এবং নারায়ণী সেনা ছাড়া কখনও সম্ভব হবে না তা। অর্জুনের হাতে এই দুই বাহিনী ধ্বংস হলে কৌরবদের বল ভরসা বলে কিছু থাকবে না আর। দুর্যোধনকে মনে মনে গালি দিতে ইচ্ছে হল কৃষ্ণের। মূর্খ! অর্জুনের শক্তি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। অর্জুন আশ্চর্য আশ্চর্য দেবাস্ত্রের অধিকারী। নারায়ণী সেনারও সাধ্য নেই তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

এমন সময় পঞ্চপাণ্ডব প্রবেশ করল তাঁর কক্ষে। তাদের দেখে কৃষ্ণ অবাক হল না একটুও। বরং, এমনটাই আশা করেছিলেন তিনি। প্রদীপের ম্লান আলোয় তাদের মুখগুলি ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। কৃষ্ণকে ঘিরে বসেছিল তারা। দ্বিধার ভাব কাটিয়ে অর্জুন বললঃ সখা ধর্মরাজকে আবার পাশা খেলার ফাঁদে ফেলতে চায় দুর্যোধন। কি হবে সখা ?

কৃষ্ণের দু'চোখ রহস্যে পরিপূর্ণ। কৌতুক করে বললঃ ধর্মকে বন্দী করবে কে ?

এক নিঃশ্বাসে বলল বৃকোদর। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য।

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে কৃষ্ণ বললেনঃ দ্রোণাচার্য কেবল তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললঃ কী বলছ সখা? তোমার কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

অবিচলিত কৃষ্ণ। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর. ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বললেনঃ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য যে ব্যবস্থা করেছে পাণ্ডবদের মঙ্গল হবে তাতে।

যুধিষ্ঠির বললেনঃ কৃষ্ণ মিথ্যা বলেনি। দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞার ফাঁক আছে। কিন্তু সে ফাঁকটুকু বোধগম্য হচ্ছে না বলে তোমার কাছে এলাম।

ভীম ও অর্জুনের বিস্ময়ের সীমা নেই। কৃষ্ণের দৃষ্টি মুক্ত বাতায়ন পথে ঘন কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। একদৃষ্টে গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেনঃ ধর্মরাজ, এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশল। আপনার বন্দী হওয়ার কোন আশংকা নেই। কেবল তৃতীয় পাণ্ডবের বিপদ সমূহ।

পঞ্চপাণ্ডব বিস্মিত হল। বাক্যহত হয়ে এ-ওর মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল। একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা নেমে এল সেখানে। কম্পিত প্রদীপ শিখায় তাদের ছায়াগুলি দীর্ঘতর হয়ে কাঁপতে লাগল। বিহ্বলতার আবেশ কাটলে যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন ঃ না, না। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে কৌতুক করছ। অথবা বিরক্ত হয়ে এমন কথা বলছ।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কৃষ্ণ বললেন ঃ মহারাজ যা সত্য তাই বলেছি। অর্জুনকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেওয়া নিরাপদ নয়। কর্ণ, দুঃশাসন, দুর্যোধনের হিংস্র আক্রমণ কেবল উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। এবং সে উত্তেজনায় তৃতীয় পাণ্ডবের জীবনহানি হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

সে কথা শুনে অবাক হল যুধিষ্ঠির। নিজেকে তাঁর বিপন্ন এবং অসহায় বলে মনে হল। মানসিক বল ভরসা ত্যাগ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি।

অর্জুন নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিল। কৃষ্ণের আশংকা তাকে আশ্চর্যান্বিত করল। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কৃষ্ণকে জিগ্যেস করল ঃ সখা, কোন কর্তব্য স্থির করেছ কি ?

নির্দ্বিধায় উত্তর করলেন কৃষ্ণ ঃ করেছি।

চমকে উঠলেন যুধিষ্ঠির। অর্ধস্ফুট স্বরে শুধালেন ঃ কি ?

এক আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টিতে কৃষ্ণ তাকালেন পঞ্চপাণ্ডবের দিকে। তাঁর সুন্দর চক্ষুদুটির স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাদের অভিভূত করল। ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী ক্ষমতা দিয়ে বশীভূত করে রেখেছেন তাদের। তাই, তাঁর কোন আদেশ, নির্দেশ, পরামর্শকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা থাকে না পাণ্ডবদের। নির্বিবাদে, নির্বিচারে মেনে চলে তাঁকে। পাণ্ডবদের এই আনুগত্য ভাল লাগে কৃষ্ণের। পঞ্চপাণ্ডবের মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন ঃ আগামীকালের ভয়ংকর যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবের জয় পরাজয়ের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে। তাই, আমার পরামর্শ হল, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ভীম ও অভিমন্যুই যথেষ্ট। ত্রিগর্তরাজের সেনাপতিত্বে সংশপ্তক বাহিনী ও নারায়ণী সেনার ভয়ংকর যুদ্ধের সঙ্গে অর্জুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

যুধিষ্ঠির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ বাঁচালে সখা। তারপর সস্নেহে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

সংশপ্তক ও নারায়ণী সেনা ধ্বংস করে অর্জুন বিজয়গর্বে শিবিরে প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন যাত্রা করলেন তখন সন্ধ্যার আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হল সে। অকারণে চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হল। মন হল ভারাক্রান্ত। স্বজন হারানোর দুঃখে বুক তার হাহাকার করে উঠল। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র অভিমন্যু বারংবার তার চিত্রপটে উদিত হল। নানা অশুভ ভাবনায় মন হল অস্থির।

দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ রচনার সংবাদ অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রেই পেয়েছিল। কিন্তু

দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করার কৌশল অভিমন্যু ছাড়া পাণ্ডবদের আর কেউ জানে না। অভিমন্যু ব্যতিরেক চক্রব্যূহে প্রবেশ পাণ্ডবদেব অসাধ্য। কিন্তু বিপদকালে ব্যূহ থেকে নির্গত হওয়ার কেশৗল তার জানা নেই। অমঙ্গল আশংকায় অর্জুনের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠল। সর্বশরীর তার কেঁপে উঠল। ভীষণ ভয় করতে লাগল তার। কল্পনেত্রে হঠাৎ অভিমন্যুর ছিন্নবাহু কবন্ধ রক্তমাখা দেহ দেখে আঁৎকে উঠল অর্জুন। ভয়ার্ত কণ্ঠে কৃষ্ণকে জিগোস করল: সখা, অভিমন্যুর জন্য হৃদয় আমার বড় চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়েছে। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমার শ্বাস বন্ধ হওয়ার মত হচ্ছে। সব কুশল তো!

কৃষ্ণ সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। দূতের মুখে অভিমন্যু নিহত হওয়ার সংবাদ তিনি পূর্বেই জেনেছিলেন। বিষাদে তাঁর হৃদয় অধীর। দুই চক্ষু তাঁর অশ্রু পরিপূর্ণ। কণ্ঠস্বর বেদনায় আর্দ্র। আত্মসংবরণ করতে তাই একটু সময় লাগল। উদাসীনভাবে বললেন: তুমি চিন্তিত হয়ো না। তোমার ভ্রাতারা সবাই ভাল আছেন।

দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন: সখা এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবু মায়ার বন্ধন ছিন্ন হলে মানুষ তার জন্য পরিতাপ করে, শোকে বিহ্বল হয়। কিন্তু প্রকৃত বীর কখনও সাধারণ মানুষের মত শোক করে না। অস্ত্র দিয়েই সে দুঃখ ও ক্ষোভের জবাব দেয়।

অর্জুন উদ্বিগ্ন হয়ে বলল: সখা, তুমি এমন কথা বললে কেন?

আত্মবিস্মৃতির জন্য তোমাকে এ কথা স্মরণ করে দিতে হল। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ। কোন কারণে সে ধর্ম থেকে বিচ্যুতি হলে অধর্ম হয় তার। স্বভাবকে হত্যা করা হলে সব হত্যার চেয়ে বড় পাপ, সখাকে এই কথা বার বার স্মরণ করে দিতে হয় বলে আমার লজ্জা করে। তবু না বলে পারি না।

অর্জুন তার জিজ্ঞাসার জবাব না পেয়ে অত্যন্ত বিমর্ষ হল। চুপ করে রথে বসে রইল। রথ যখন শিবিরে পৌঁছল তখন চারিদিক অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এল। আলোকহীন শিবিরে কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি নেই কোথাও। শঙ্খও নীরব। বিজয়ের আনন্দ ও উন্মাদনার কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না অর্জুনের। এমন কি তাকে অভ্যর্থনার জন্য উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কোন সৈনিকও এল না। জ্যেষ্ঠের উন্মুখ প্রতীক্ষায় সংবাদ দিতেও এল না কোন দৌবারিক। রথের চক্রধ্বনি শুনে অভিমন্যু প্রতিদিন দৌড়ে আসে। কিন্তু তার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অর্জুনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা প্রবল হল।

সর্বত্র বিষাদের ছায়া থম থম করছে। সৈনিকেরা সারি সারি ভাবে মাথা নত করে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। অর্জুনকে দেখে তারা অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। কেউবা সসম্মানে সরে দাঁড়াল।

উন্মাদের মত যুধিষ্ঠিরের কক্ষের দিকে ছুটে গেল অর্জুন। কৃষ্ণ তাকে নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টাই করল না। ঘর্মাক্ত কলেবরে অর্জুনকে আচমকা প্রবেশ করতে দেখে চার ভাই চমকে উঠল। অশ্রুসিক্ত আঁখিকোণে আলো পড়ে চিক্ চিক্ করে উঠল। দ্রৌপদীর কোলে মাথা রেখে তখনও তাঁরা ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল। অর্জুনকে দেখে আকুল আবেগে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠল।

শিরে করাঘাত করে সাশ্রুলোচনে যুধিষ্ঠির বললেন ঃ হা, ধিক্ আমায়। আমিই হত্যাকারী অভিমন্যুর। আমার পাপেই মৃত্যু হল তার। সিংহ-শিশুকে একদল হিংস্র শার্দুলের মুখে তুলে দেওয়ার দণ্ড তুমি আমায় দাও।

চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হয়ে রইল অর্জুন। তার মুখে ভাষা নেই। চোখে নেই কণামাত্র অশ্রু। বৃষ্টিহীন বৈশাখের মত তার সর্বশরীর ক্রোধে জ্বলতে লাগল। মনে হল বিশ্বসংসার যেন এখনি সে অগ্নিতে ভষ্মীভূত হবে। শোকে ও বিষাদের এক অব্যক্ত অনুভূতিতে সে স্তম্ভিত।

অভিমন্যুর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী শুনতে শুনতে অর্জুনের মুখের রঙ চোখের চাহনি বদলে গেল। প্রতিহিংসায় চক্ষুদ্বয় ক্রুর ও কুটিল হল তার। অর্জুনের তীব্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে লাগল। অর্জুনের এমন ভয়ংকর রূপ ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি কৃষ্ণ। মনে মনে বিপদাশংকা করে মৃদুস্বরে ডাকলেন ঃ সখা, ধৈর্য ধর। ক্রোধ সংবরণ কর। তুমি ক্রুদ্ধ হলে সৃষ্টি, স্থিতি সব ধ্বংস হবে।

অর্জুন এতই আত্মবিহ্বল হয়েছিল যে কৃষ্ণের আকুল আহ্বান সে শুনতে পেল না। বিকারগ্রস্ত রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে গাণ্ডীবী হাতে করে শপথ করল ঃ পুত্রহন্তা জয়দ্রথের ক্ষমা নেই, গাণ্ডীব স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, কালই সূর্যাস্তের পূর্বে সংহার করব তাকে। যদি না পারি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। অর্জুনের কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে গম্ভীর শান্ত অথচ শাণিত হয়ে উঠল।

অর্জুনের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা শুনে চমকে উঠলেন কৃষ্ণ। পুত্র শোকে উন্মাদ হয়েছে অর্জুন। নইলে এমন কঠিন পণ করে কেউ? রোষ-পরবশ হয়ে অর্জুন যা করল

তাকে উন্মত্ত আত্মঘাত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অর্জুনের বালসুলভ এই আস্ফালনকে কৃষ্ণ ক্ষমা করতে পারল না। পাণ্ডবেরা সকলে শোকে মুহ্যমান। হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে তাদের। অথচ রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ংকর পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। সেজন্য তাদের কোন উদ্বেগ বা ভাবনা পর্যন্ত নেই। নেই কোন বৃহৎ প্রস্তুতি। অথচ আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকী।

জয়দ্রথও একজন মহাবীর। সিন্ধু সৌবীর দেশের অধিপতি তিনি। বহু যুদ্ধের নায়ক। দুর্যোধনের ভগ্নীপতি। সুতরাং কৌরব-পক্ষীয় মহাবলশালী সেনানায়ক রণনিপুণ যোদ্ধারা এবং বিপুল সৈন্যবাহিনী সর্বতোভাবে রক্ষা করবে তাকে। অর্জুনের প্রতিভা ভঙ্গ করার এতবড় সুযোগ কৌরবেরা অবহেলা করবে না। যে-কোন মূল্যে তারা জয়দ্রথকে বাঁচাবে। অর্জুন মরলে তার ভ্রাতারাও মরবে। খুব সহজেই যুদ্ধের নিষ্পত্তি হবে। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের ইতি ঘটবে এখানে। পাণ্ডবেরা গেলে তাঁর আর কি থাকবে? পাণ্ডবের পরাজয় মানে তাঁরও পরাজয়। দরিদ্র বঞ্চিত পাণ্ডবদের যে উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছেন, সে উদ্দেশ্যের ইতি হবে এখানে! কৃষ্ণ তাই অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণ কৌরব শিবিরে গুপ্তচর পাঠিয়ে তাদের গোপন মন্ত্রণা সম্বন্ধে অবগত হলেন। জয়দ্রথকে রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য এক দুর্ভেদ্য চক্রশকট ব্যূহ রচনার পরিকল্পনা নিয়েছেন ব্যূহের পশ্চাতে পদ্ম নামক এক গর্ভব্যূহ এবং তার সূচীব্যূহের সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে জয়দ্রথ এক পার্শ্বে থাকবেন। দ্রোণাচার্য নিজে চক্র শকটব্যূহের মুখে দাঁড়াবেন। এবং সর্বপশ্চাতে প্রায় ছ'ক্রোশ দূরে জয়দ্রথকে রক্ষার জন্য সসৈন্যে থাকবেন ভুরিশ্রবা, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন ও কৃপ প্রমুখ মহাবীররা।

অর্জুনকে রক্ষার কোন রন্ধ্র খুঁজে পেলেন না কৃষ্ণ। তাই ভাবলেন, প্রিয়সখা অর্জুনের প্রাণরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণে দ্বিধা করবেন না। যদিও এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণের কোন ইচ্ছা তাঁর নেই তথাপি প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়। তদ্ব্যতীত আগামীকালের যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক যুদ্ধ। এর সঙ্গে কুরু-পাণ্ডবের লড়াই-এর কোন সম্পর্ক নেই, অর্জুন ও জয়দ্রথের পরস্পরের জীবন নিয়ে এ যুদ্ধ। এ ধরণের যুদ্ধ ইতিপূর্বে হয়নি কখনও। কাজেই, এর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা পালনের কোন সম্পর্ক যেমন নেই, তেমনি নেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশংকা। কিন্তু এ তো তাঁর স্বেচ্ছা আরোপিত নিয়ম। তাই বিবেকের মধ্যে নিরন্তর একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন।

অর্জুন তাঁর দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও বন্ধু। সম্পদে, বিপদে, দুঃখে আনন্দে সর্বদা তাঁর পাশে থাকছেন। তার উপরই তাঁর আস্থা, নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি। আজ সামান্য একটা ভুলের জন্য অভিন্ন বন্ধু ও শিষ্যকে হারাতে হবে তাঁর? এ কথা ভাবতে বুক তাঁর ভেঙে গেল। মনটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। নিয়তি! নাহলে, এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা কেউ করে? তিনিই বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বহু আগেই অস্ত্র ধরবেন না বলে শপথ করলেন কেন?

সারা রাত্রি কৃষ্ণের নিদ্রা হল না। উত্তেজনায় ঘরময় পদচারণা করতে লাগলেন। তবু রহস্যের কিনারা খুঁজে পেলেন না। ভোরের আলো ফুটতেই দেখলেন হিরম্মবতী নদীতে স্নান করে অর্জুন পূর্ব দিকে মুখ করে একমনে সূর্যকে প্রণাম করছে। সূর্যের সমস্ত তেজরশ্মিকে সে যেন নিজের মধ্যে আহরণ করে নিচ্ছে। তারপর একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সূর্যের গরম রোদ লুটিয়ে পড়েছে শিবলিঙ্গের পায়ে। একদণ্ড কাল পাষাণবৎ দাঁড়িয়ে সে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করল। তারপর নতজানু হয়ে করজোরে পুজাঞ্জলি নিবেদন করল শিবলিঙ্গের মস্তকে। অমনি এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সূর্যের সমস্ত আলো কুণ্ডলীকৃত হয়ে তার দেহে প্রবেশ করল। তার শান্ত সৌম্য ধ্যানগম্ভীর তেজোময় তাপসমূর্তির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৃষ্ণ চমৎকৃত হলেন। ভারী সুন্দর লাগছিল অর্জুনকে। এমন নয়নাভিরাম জ্যোতির্ময় মূর্তি তার ইতিপূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কৃষ্ণের। মনের উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল। জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে অর্জুন তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে নিল নিজের মধ্যে। তাহলে পুত্রশোকে উন্মাদ হয়ে অর্জুন কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করেনি। আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত সে। এতক্ষণ পরে কৃষ্ণ কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে যখন রথে আরোহণ করল অর্জুন তখন অসম্ভব শান্ত মৌন সে রথে যেতে যেতে কৃষ্ণের সাথে একটি কথাও বলল না। কৃষ্ণও তার মনোযোগ ব্যাহত করল না। অর্জুনের স্তব্ধতা যেন আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস সূচনা করছিল। এ যেন মহাপ্রলয়ের পূর্বের নির্বিকার স্তব্ধতা।

রণক্ষেত্রে এসে পেঁছিল রথ। কৌরববাহিনীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই ক্রোধে চক্ষু তার জ্বলে উঠল। গাণ্ডীব তুলে নিল হাতে। পলক পড়ার আগে শরযোজন করল। মুহূর্তে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিপক্ষের সৈন্য, হস্তী, অশ্ব ও রথীদেব বিভ্রান্ত করে তুলল। তার আক্রমণে বিব্রত হয়ে ব্যূহের প্রবেশ পথের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হল অর্জুন অনায়াসে দ্রোণাচার্য নির্মিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ চক্রশকটের মধ্যে প্রবেশ করল রথ হতে অবতরণ করে দ্রোণাচার্যকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। তারপর, তিলেক মাত্র সময় নষ্ট না করে ক্ষিপ্রগতিতে রথ নিয়ে দ্রোণাচার্যকে অতিক্রম করে গেল! দ্রোণ আক্রমণের কোন সুযোগই পেলেন না। তার পূর্বেই অর্জুন তাঁর দৃষ্টির আড়ালে উধাও হল। দ্রোণের সঙ্গে কোনরূপে সংঘর্ষ না করে অর্জুন যেভাবে কৌশলে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করল তা দেখে কৃষ্ণ অবাক হলেন। মনে মনে তার বুদ্ধিমত্তার অজস্র প্রশংসা করলেন। এবং জয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন।

কালান্তকের মত অর্জুনকে ভীম বেগে ছুটে আসতে দেখে দুর্যোধন শঙ্কিত হল সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো সে দুর্বার গতিতে শর নিক্ষেপ করতে করতে জয়দ্রথের দিকে ছুটে আসছিল। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, দুঃশাসন, শকুনি প্রমুখ বীরেরা অর্জুনের গতিরোধ করল। কিন্তু নিষ্ফল হল তাদের সংঘবদ্ধ চেষ্টা। অর্জুন যেন মহাকালের বেশে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করল রণক্ষেত্রে। তাকে পরাস্ত করা স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য

চোখের নিমেষে শরজালে আচ্ছন্ন করে সকলের গতিরুদ্ধ করে দিয়ে সে ব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগল। যুদ্ধে তার ক্লান্তি নেই। ভীম, সাত্যকি সমানে তাকে সাহায্য করে চলেছে। অর্জুনের একক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কৌরবদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করল। কালান্তক অর্জুনের হাত থেকে জয়দ্রথকে রক্ষা করা তাদের সুকঠিন হল। ভূরিশ্রবা নিহত, কর্ণ আহত। তাদের দেহ শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত। দুর্যোধনেরও অঙ্গ রুধিরাপ্লুত, দ্রোণের দেহ অবসন্ন, শকুনি শ্রান্ত দুঃশাসনের বীরত্বের আস্ফালনে স্তব্ধ। কৌরবসৈন্য কুণ্ঠিত, জয়দ্রথ বিহ্বল।

এদিকে দিনাবসান ঘনিয়ে এল। ধরণীর বুকে পড়েছে তার কালো ছায়া। ক্রমে তা বিস্তারিত হচ্ছে বনে বনান্তরে। আকাশের বুকে সূর্যের আলোও নিষ্প্রভ হয়েছে কৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। কিন্তু অর্জুনের কোন ভাবান্তর নেই। সে সম্পূর্ণ নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্নও বটে। কৃষ্ণের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য বলল: সখা, দুশ্চিন্তা কর না। কৌরব রথীরা সকলেই শ্রান্ত, আহত। যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা ও শক্তি তাদের দেহে নেই। কুরু সৈন্যরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা আমার বিক্রমের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছে। অনেকে অস্ত্র সংবরণ করেছে। জয়দ্রথ বধের এই সুবর্ণ সুযোগ। যেখানে জয়দ্রথ আছে সেখানে নিয়ে চল আমার রথ। আমি নিমেষকালের মধ্যে গজসৈন্য ভেদ করে, অশ্বারোহীদের ধ্বংস করে সূর্যাস্তের পূর্বেই জয়দ্রথ বধ সম্পন্ন করে প্রতিজ্ঞা পালন করব।

অর্জুনের বাক্যে উৎফুল্ল হয়ে কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিলেন। অর্জুনও প্রচণ্ড ক্রোধে গাণ্ডীবে ঘন ঘন টংকার দিতে লাগল। রণক্ষেত্রে মহাত্রাস জেগে উঠল। রথ চলল ঊর্ধ্বগতিতে। সতীহারা শিবের মত অর্জুন সৈন্য দলিত মথিত করে ভীমবেগে অগ্রসর হতে লাগল। সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে পেল জয়দ্রথকে। মহোল্লাসে চীৎকার করে উঠল অর্জুন। কৃষ্ণ তার পাঞ্চজন্য বাজাল। ভীম দিল রণহুঙ্কার। জয়দ্রথ হতভম্ব হয়ে পড়ল। অসহায়ের মত তাকাল চতুর্দিকে। মরণভয়ে ভীত হয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। রক্ষা কর, রক্ষা কর বলে আকুল আবেদন জানাল দুর্যোধন, কর্ণ, কৃপের কাছে। কিন্তু তারা এতই আহত ও শ্রান্ত যে অর্জুনের সম্মুখে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না তাদের। জয়দ্রথ মরীয়া হয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করল। অর্জুন শরাঘাতে জয়দ্রথের সারথীর মুণ্ড ভূপাতিত করল এবং রথের চাকা ভগ্ন করল। এবং নিমেষকাল মধ্যে তার ধনু ও হস্তধৃত খড়্গ ভঙ্গ করে অস্ত্রহীন করল তাকে। তারপর বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করে তার মুণ্ড ছেদন করল।

সূর্য গেল অস্তাচলে।

সপ্তদশ অধ্যায়

জয়দ্রথের মৃত্যু কৌরবদের মনোবল ভেঙে দিল। দুর্যোধনের বিপুল আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বারংবার প্রশ্ন জাগল মনে, এত শক্তি, সাহস, তেজ, বিক্রম অর্জুন পেল কোথা থেকে? ইন্দ্রও পারে না এত বল ও বীর্যের পরিচয় দিতে। অর্জুনের পরাক্রম যদি ইন্দ্র দেখত তাহলে তিনিও আত্মশ্লাঘা করতে লজ্জা পেতেন। অর্জুনের 'যুদ্ধবিদ্যা সত্যই আশ্চর্য! অদ্ভুত! যুদ্ধে এমন উন্মাদনা সৃষ্টির ক্ষমতা স্বয়ং ভীষ্মেরও ছিল না। পলক না পড়তে মহারথীরা অস্ত্রহীন হয়েছে। এমন কি তাদের সম্মিলিত আক্রমণ এবং প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছে। অর্জুন অসাধারণ!

যন্ত্রণায় টন-টন করছিল পেশী। চোখের কোণ দিয়ে তপ্ত অশ্রু গণ্ড বেয়ে বুকের উপর পড়ল তার। তৎক্ষণাৎ বিহ্বলতা গেল কেটে। আত্মসম্বিত পেয়ে সোজা হয়ে বসল দুর্যোধন। পরম শত্রু অর্জুনের কথা চিন্তা করার জন্য তীব্র আত্মগ্লানি অনুভব করল। অর্জুনই তার সকল সুখের কাঁটা। তাকে নির্মূল করার জন্য উন্মাদ হল সে। কিন্তু দিনের আলোয় তাকে পরাভূত করা দেবতারও অসাধ্য। সে দুর্ধর্ষ, দুর্বার। তার গতিরোধ করার মত মহাবীর কৌরব বাহিনীর মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ হল তার। অর্জুনের আতঙ্ক দুর্যোধনের চিন্তা ভাবনা গ্রাস করল। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় এবং বিপন্ন বলে মনে হল তার।

দুর্যোধনকে দুঃখ ও দুর্ভাবনায় কাতর দেখে অঙ্গরাজ কর্ণ বলল: প্রিয় বন্ধু আমার। অধর্ম করেছি, পাপ করেছি আমরা। বিষ দিয়ে পাণ্ডবদের হত্যার চেষ্টা করেছি, জতুগৃহে অগ্নি দিয়েছি, রাজ্য ও ঐশ্বর্যের লোভে কপট দ্যূতে তাদের পরাজিত করেছি, ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করে আমরা অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছি। সর্বশেষে শর্তভঙ্গ করে অধর্ম করেছি। দৈব আমাদের প্রতিকূল। আমাদের সব উদ্যম, শক্তি নিষ্ফল হবে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য যুদ্ধ করে যাব।

কর্ণের আত্মগ্লানিতে শতধারায় উৎসারিত হল। বিস্ময়ে দুর্যোধন স্তম্ভিত হল। কর্ণের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার অধর প্রান্তে কৌতুক হাসি স্ফুরিত হল। বিদ্রূপ করে বলল: অবশেষে তুমিও ধর্মের প্রবক্তা হয়ে উঠলে তোমরা সকলেই ভীষ্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করছ। অথচ, একদিন তুমিই যুদ্ধে উৎসাহ দিয়েছিলে আমায়। আজ আমি সহায়হীন, বান্ধবহীন। তুমিও ত্যাগ করতে চাইছ। ভাই বলে পাণ্ডবদের জড়িয়ে ধরতে চাইছ। তারা তোমার ক্ষমার পাত্র? আর আমি তোমার অযোগ্য বন্ধু। উত্তম, আমি একাই যাব এই রাত্রে পাণ্ডব আর পাঞ্চালদের ধ্বংস করতে।

দ্রোণ বললেন: বৎস, ক্রোধের সময় নয় এখন।

সক্রোধে দুর্যোধন বলল: বলুন, বৃথা কালক্ষয়ের সময় নেই! আমি চাই জয়দ্রথ হত্যার প্রতিশোধ। এখনি এই মুহূর্তে।

জবাবের প্রত্যাশা না করে উন্মাদের মত ঝড়ের বেগে প্রস্থান করল দুর্যোধন। কর্ণ ও দ্রোণ কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, নিজ নিজ শিবিরের দিকে তাঁরা যাত্রা করল।

পাণ্ডব শিবির জয়োল্লাসে মত্ত। রণসাজ খুলে সবাই বিশ্রাম করছে। দ্রৌপদী এখন অর্জুনের পরিচর্যায় ব্যস্ত। কৃষ্ণ, ভাগিনী সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পুত্র হন্তার নিমিত্তস্বরূপ জয়দ্রথ হত্যার গল্প করছে। নিশ্চিন্ত মনে সকলে বিশ্রাম নিচ্ছে। সুতরাং এই রকম একটি সময়ে পাণ্ডবদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে জয়দ্রথ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর দুর্যোধন হল। বিশ্রাম না নিয়েই সৈন্যবাহিনীকে পুনরায় শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল।

কিন্তু কৌরব শিবিরের সব খবরই গোপন পথে পাণ্ডব শিবিরে চলে যায়। বিশ্বস্ত কৌরব অনুচরেরা অর্থের বিনিময়ে গোপনে খবর সরবরাহ করে। দুর্যোধনের নৈশ আক্রমণের মতলব শুনে কৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল। ক্রোধে অন্ধ হয়েছে দুর্যোধন। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে তার। তাই, ভালমন্দ বিচার না করেই আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়েছে।

নিশাকালে দুর্যোধনের পরিকল্পনাহীন যুদ্ধের তাৎপর্য কৃষ্ণ চেষ্টা করেও বুঝতে অক্ষম হলেন। জিঘাংসায় উন্মাদ হয়েছে দুর্যোধন। তা না হলে হঠকারীর মত এরকম আচরণ করে কেউ? দুর্যোধনের নিয়তিই হয়ত তার পতন ও ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলেছে তাকে দিয়ে। তাই বোধ হয় নিয়তির এই যজ্ঞ আয়োজন।

চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণ-ধারায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত। দিনের আলোর মত সব স্পষ্ট হচ্ছিল। কোথাও একটু আঁধার নেই। তবে, দূরের বস্তু নয়নপথে ছায়ার ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল। লক্ষ্য নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। অকারণ বিপুল সৈন্য-নাশের আশংকাই প্রবল। শুধু তাই না, নানা অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা আছে। এ যুদ্ধে অর্জুনের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। হয়ত তাকে বিপদে ফেলার চক্রান্ত করেছে দুর্যোধন। বিশেষ করে কর্ণের নিকট বাসবাস্ত্র থাকতে অর্জুনকে তার সম্মুখীন হতে দেবেন না কৃষ্ণ। তা-ছাড়া, সে ভীষণ রণক্লান্ত। এখন তার প্রচুর বিশ্রামের আবশ্যক।

এ অবস্থায় পাণ্ডববাহিনীর সেনাপতিত্বের ভার কৃষ্ণ ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের উপর অর্পণ করাই সমীচীন মনে করলেন। রাত্রিযুদ্ধে ঘটোৎকচ অত্যন্ত দক্ষ। সে এক অদ্ভুত যাদু জানে। অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপনের বিদ্যা তার অধিগত। তার দৃষ্টিও অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করে। রাত্রিযুদ্ধে তার সমকক্ষ বীর কৌরব বাহিনীতেও নেই। এ ছাড়া আরও একটি দিক ভাবলেন কৃষ্ণ। কর্ণের ত্রাস পাণ্ডববাহিনীকে রক্ষার জন্য তাদের মনে সাহস ও ভরসা যোগানোর জন্য ঘটোৎকচের মত বীরকে প্রয়োজন খুবই অধিক। কর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি পাণ্ডববাহিনীতে একমাত্র তার ও অর্জুনের আছে। তাকে সামলানো কর্ণেরও

খুব কঠিন হবে। এই যুদ্ধের পরিণাম কৃষ্ণ জানেন না। তবে এক শুভ ফললাভের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল বলে মনে হল তাঁর। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তার ছবি খুব স্পষ্ট নয়। তবে, একটা অনুমান করতে পারেন তিনি।

ঘটোৎকচের আক্রমণ অত্যন্ত ক্ষিপ্র। শত্রুকে আক্রমণ করায় সুযোগ দেয় না সে। সুতরাং কর্ণের মত মহাবীর যে ঘটোৎকচের হাতে লাঞ্ছিত হবে এ সম্পর্কে কৃষ্ণের মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। তাই, মাঝে মাঝে ভাবেন—ইচ্ছে করেই ভাবেন; ভাবতে এবং চিন্তা করতে ভাল লাগে বলেই ভাবেন, যে মান ও প্রাণ বাঁচানোর জন্য হয়ত কর্ণকে অর্জুনের জন্য সংরক্ষিত বাসবাস্ত্র হারাতে হবে তাকে। ঘটোৎকচ সহজবধ্য নয়। সাধারণ অস্ত্রের ভীম প্রহারে সে আহত পর্যন্ত হয় না। তাকে নিরস্ত করতে হলে বাসবাস্ত্রের মত শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। বোধহয়, ঘটোৎকচের মহান আত্মৎসর্গ তার একটা বহুদিনের দুর্ভাবনা দূর করবে।

কৃষ্ণ আর দেরী না করে ঘটোৎকচকে ডেকে পাঠালেন।

দীপ্ত কুণ্ডলধারী কুৎসিত দর্শন মেঘবর্ণ সদৃশ ঘটোৎকচ কৃষ্ণের আদেশ শোনা মাত্র হৃষ্ট হয়ে উল্লাস করতে করতে রণক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হল।

কৃষ্ণের অধরে এক আশ্চর্য সুন্দর রহস্যময় হাসি আরও স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময় হল।

রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে, বিশ্বজগতের নিদ্রা ঘুচিয়ে, নিশাচর প্রাণীদের সুখ ও শান্তি নষ্ট করে আরম্ভ হল এক মহারণ। রণবাদ্যে, সৈন্যের কোলাহলে, রথচক্র নির্ঘোষে অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহিতিতে, আহত মানুষের মৃত্যু-যন্ত্রণায় জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি ভয়ংকর বিভীষিকাময় হল।

মেঘের মত গর্জন করতে করতে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করছিল। তার বলিষ্ঠ আক্রমণের সম্মুখীন হতে না পেরে কৌরব সৈন্যরা ভীত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তাদের বল ও সাহস ফিরিয়ে আনতে ঘটোৎকচকে সংহার করার জন্য অগ্রসর হল। পদাহত সর্পের ন্যায় উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ শরবৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু ঘটোৎকচ তার আক্রমণে ভীত না হয়ে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে কর্ণের উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগল। কর্ণ তার আক্রমণে দিশাহারা হল। কখন কোন দিক হতে শর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল সে তার দিক নির্ণয় করতে পারছিল না। ফলে বাণবিদ্ধ হতে লাগল। সিংহের মত কর্ণকে সে তাড়িয়ে বেড়াল। কুরু সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। কর্ণের রথ ভগ্ন হল, অস্ত্র বিনষ্ট হল। অত্যন্ত বিপন্ন ও অসহায় বোধ করল। ঘটোৎকচের কাছে প্রাণ ও মান রক্ষা করা কঠিন হল। বীর্যাবর্তের গর্ব ধূলিসাৎ হওয়ার উপক্রম হল। পরাজয় হল আসন্ন। চিন্তার অবকাশ নেই। নিরুপায় হয়ে কর্ণ বহুকালের সযত্ন রক্ষিত অর্জুনের মৃত্যুবাণ ইন্দ্র প্রদত্ত বাসবাস্ত্র তার বিজয় ধনুতে যোজন করে নিক্ষেপ করল। ইন্দ্র প্রদত্ত সে বৈজয়ন্তী শক্তি উল্কা পিণ্ডের মত ঘটোৎকচের বক্ষদেশ বিদীর্ণ করল। গগনভেদী আর্ত-চীৎকার করে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল বৃকোদরের বীর পুত্র ঘটোৎকচ।

তার শোকে পাণ্ডবেরা হল মুহ্যমান। আর্তস্বরে বিলাপ করে অশ্রুমোচন করতে লাগল।

একটু দূরে বসে কৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এত আনন্দ কৃষ্ণ জীবনে খুব কম অনুভব করেছেন। বিরাট একটা সাফল্যের আত্মপ্রসাদ তাঁকে আত্মহারা করল। হঠাৎ, সোল্লাসে শঙ্খনাদ করে বিজয় আনন্দ ঘোষণা করলেন। কৃষ্ণের এই আকস্মিক ভাবান্তরের রহস্য পাণ্ডবদের কাছে অনুদ্ঘাটিত রইল।

বহুকালের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার পাত্র শূন্য হল আজ। দীর্ঘকালের একটি আশা পূরণ হল কৃষ্ণের অখণ্ড ভারতরাজ্য এবং ধর্মসংস্থাপনের সংকল্প। এখন আর আকাশকুসুম কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। পাপের সঙ্গে অধর্মের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। সামনে আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। অর্জুনের জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ। সব বিপদ বাধার উর্ধ্বে সে। পৃথিবীর কোন শক্তিই অর্জুনকে নিবারণ করতে পারবে না। সে দুর্বার, দুর্জয়, দুর্দম। দ্রোণ তার মনোবল হারিয়ে পঙ্গু, অথর্ব। কর্ণ বাসবাস্ত্র হারিয়ে মণিহারা ফণী। সাফল্যের গৌরবে, আনন্দে কৃষ্ণ আত্মহারা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগেই কৃষ্ণ বুঝেছিলেন, অন্যায়ের সঙ্গে সত্যের, পাপের সঙ্গে পুণ্যের, অধর্মের সঙ্গে ধর্মের যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে মৃত্যুর মূল্যেই পরিশোধ করতে হবে তার ঋণ। রক্ত দিয়ে ধুতে হবে পাপের ক্ষেত্র। হাহাকার দীর্ঘশ্বাসের অশ্রুতে তর্পণ করে পাপ শুদ্ধ হতে হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালস্বরূপ অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য।

মহাকালের অদৃশ্য ইংগিতেই যেন সব ঘটল একের পর এক। কাল নিয়ন্তা। তিনি তার নির্দেশ মেনে কাজ করছেন কেবল। নিষ্ঠুর কালচক্রের প্রবল ঘূর্ণাবেগে সকলকে সবলে আকর্ষণ করছে। তা থেকে কারও নিস্তার নেই, নিষ্কৃতিও নেই। নিজেকে তাঁর কালের ক্রীড়নক বলে মনে হল।

পরের দিন যুদ্ধ আরও ভীষণ হয়ে উঠল। দুর্যোধনের তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মস্পর্শী বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে দ্রোণ স্থির করেছেন, এই যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। জীবনের মায়া ত্যাগ করেই যুদ্ধ করবেন। কিন্তু চতুর্দশ দিবসব্যাপী ক্রমাগত যুদ্ধ করে এমনিতেই দেহ তাঁর শ্রান্ত। গত দিনের দিবারাত্র বিরামহীন সংগ্রাম করে তিনি আরও পরিশ্রান্ত হয়েছেন। শ্রম করার মত সাধারণ বলটুকুও দেহে নেই। দেহও বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল। ইন্দ্রিয়গুলো পর্যন্ত নিস্তেজ। চক্ষুদ্বয়ে নিদ্রার আবেশ। চক্ষুর কোটরেও পড়েছে কালি। দেহ তার টলছিল। পাপের পক্ষে নিরন্তর পঞ্চদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ করে মনে তাঁর আত্মগ্লানি জমেছে। দেহ তাঁর অবশ। মন শ্রান্ত, ইচ্ছা নিহত। শ্রমজনিত ক্লান্তিতে ধনু উত্তোলনে ব্যর্থ হলেন বারংবার। অন্তিম সময় মনে করে অস্ত্রত্যাগ করলেন। এবং ঈশ্বরের প্রার্থনায় তন্ময় হয়ে রইলেন।

মৃত্যুদূত ধৃষ্টদ্যুম্ন সে অবকাশে খড়্গ দ্বারা তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। অমনি কুরু পাণ্ডবেরা হাহাকার করে উঠল।

দ্রোণের মৃত্যুতে দুর্যোধনের শিবির বিষণ্ণ। কর্ণও ভীত, অত্যন্ত অসহায় এবং বিপন্ন বলে মনে হল নিজেকে। চতুর্দিক থেকে নিয়তি যেন দশ হাত বিস্তার করে তাকে গ্রসে করতে আসছে। আপন ভাগ্যের বিড়ম্বনায় দুঃখ আজ তার হৃদয় গভীরে স্পর্শ করল। দাতাকর্ণ কোনকালেই আপনার বিপন্ন অবস্থার কথা ভাবেনি। আজ সেই ভাবনায় বিমর্ষ হল সে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তবু নিবৃত্ত হওয়ার কোন পথ নেই। দুর্যোধনের একমাত্র হিতৈষীরূপে সে জীবিত। আজ দুর্যোধন একাকী নিঃসঙ্গ। তার বন্ধু, আত্মীয় বলতে কেউ নেই। যা আছে প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। কর্ণ বন্ধুর প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্য কিছুতে বিস্মৃত হতে পারল না।

অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরের বহুকালের আশা-আকাঙ্খার পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পেল বড় দেরী করে। বিধাতাকেই সেজন্য দায়ী মনে হল। যুদ্ধের ষোড়শ দিবস আজ। তাই আশা পূরণ নিয়ে তার মনে দেখা দিল নানা সংশয়। সবই নিয়তি। নিষ্ঠুর অদৃষ্টের গোপন চক্রান্ত।

শুরু হল তুমুল যুদ্ধ।

অর্জুনের শরাঘাতে কর্ণের মণিভূষিত স্বর্ণকিরীট ধূল্যবলুণ্ঠিত, তার বর্ম-ছিন্ন, দেহ ক্ষত-বিক্ষত হল। তবু কর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে কৃষ্ণার্জুনকে শরজালে আচ্ছন্ন করল। অকস্মাৎ অর্জুনের যমদণ্ড তুল্য লৌহময় বাণে কর্ণের রথ চক্র মেদিনীভূত হল এবং অন্যচক্র অর্ধভগ্ন হল। ক্রোধে অশ্রুপাত করতে করতে কর্ণ অর্জুনের কাছে কিছুক্ষণ যুদ্ধের বিরতির জন্য আকুল আবেদন জানাল। ক্ষাত্রধর্মের উল্লেখ করে অর্জুনকে নিরস্ত হওয়ার কথা বললে পার্থসখা কৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে দীপ্ত হল। কম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ এই ধর্মজ্ঞান তোমাব এতকাল কোথায় ছিল কর্ণ? ভুলে গেলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা? ভীমকে বিষ দিয়ে হত্যার চক্রান্ত? জতুগৃহে সুপ্ত পাণ্ডবদের দগ্ধ করার ঘটনা? তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? বালক অভিমন্যুকে তোমরা যখন সাত রক্ষীতে মিলে হত্যা করেছিলে—তখন কোথায় ছিল তোমার ধর্ম? এই সব সময়ে যদি তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম করে কণ্ঠ তালু শুষ্ক করে লাভ কি? নীচ, কপট, পাপাত্মা রাধেয় বিপদে পড়ে তুমি আজ ধর্ম শোনাচ্ছ। আজ তুমি যতই ধর্মাচারণ কর, আর ধর্মের কথা বল কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না পার্থের হাতে। মৃত্যু তোমাকে এখনই আলিঙ্গন করবে।

তড়িৎ প্রবাহের মত হিংস্র ক্রোধ জেগে উঠল অর্জুনের রক্তের শিবায় শিরায়। তুণ থেকে বজ্রঅগ্নি ও যমদণ্ডের ন্যায় করাল অঞ্জলিক বাণ অগ্নি নির্গত করতে

করতে কর্ণের বক্ষদেশ বিদ্ধ করল। ভূপতিত হল কর্ণ। অর্জুনের চিরশত্রু বিদায় নিল।

কর্ণের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ আর যুদ্ধের মধ্যে কোন উত্তেজনা খুঁজে পেলেন না। তবু সর্বশেষ শত্রুর মৃত্যু না হওয়া অবধি যুদ্ধ করতে হয়। তাই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। দুর্যোধনের মৃত্যুতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত।

কুরুক্ষেত্র শ্মশানভূমি।

চারিদিকে মানুষ, অশ্ব, হস্তীর খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন শব। যোদ্ধার রণসাজ দেহচ্যুত আভরণ, ধনু-তীর, অসি, বর্ম, খড়্গ সব এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। শবলুব্ধ শকুন, শৃগাল, কুকুর, পেচক, কাক কাড়াকাড়ি করে ভক্ষণ করছে সুকুমার দেহগুলি।

এই দৃশ্য দেখে যুধিষ্ঠিরের হৃদয় অসহ্য ব্যথায় হাহাকার করে উঠল। অনাথ ভ্রাতৃবধূগণ আর্তরবে ধূলায় লুটোপুটি করছে। নিহত নৃপতিবৃন্দ ও যোদ্ধাদের বধূ, সন্তানদের বক্ষবিদারী আর্তক্রন্দনে আকাশবাতাস বেদনাতুর হয়ে উঠেছে। ধরণীও শোকে মুহ্যমান। চারিদিকে কেবল ক্রন্দন আর হা-হা রব। রক্তভুক্ পশুপাখীর উল্লাস।

পাণ্ডবদের জয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে এক অতলস্পর্শী শোকের ছায়ায়। মহিলারা আর্তনাদ ও বিলাপ করে যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগল: এই মহাশ্মশানে বসে কাকে নিয়ে তুমি রাজ্যভোগ করবে মহারাজ? মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে হারিয়ে কিসের আশায় কোন্ সুখের কামনায় তুমি রাজ্য গ্রহণ করলে?

মহিলাদের বিলাপে যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। শিথিল চরণে মাটি মাড়িয়ে কোনরকমে কৃষ্ণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দুঃসহ হৃদয় যন্ত্রণা বুকের মধ্যে চেপে ধরে আকুল আবেগে অশ্রুরুদ্ধস্বরে যুধিষ্ঠির বললেন: সখা! কৈফিয়ৎ দেবার যে আমার কিছু নেই। মনে হচ্ছে মহাপাপ করেছি। পরিতাপে হৃদয় আমার পুড়ে যাচ্ছে। সত্যি বলছি এই জয় আমি চাই নি। চাই না এ রাজ্য! চাই না সুখ। এ আমার জয় নয়, আমার পরাজয়। আত্মঘাতী সংগ্রাম করে আজ শুধু নিজেদের ধ্বংস করলাম। উঃ! অদৃষ্টের দোষে আমি আজ জ্ঞাতিহীন—বান্ধবহীন। এই রাজ্যে সিংহাসনের কর্তৃত্ব নিয়ে কি হবে আমার?

যুধিষ্ঠিরের মত কৃষ্ণের হৃদয়ও বেদনায় কাতর। কিন্তু তাঁর মত বিচলিত বা বিহ্বল নন। কর্তব্যে কঠিন তিনি। এখনও একটি কাজ বাকী তাঁর। উদ্ধত, অধার্মিক, ক্ষমতামত্ত ক্ষত্রিয়কুলের হাত থেকে, তাদের হিংসা ও লালসা থেকে ধর্মকে

রক্ষা ও ধার্মিকদের উদ্ধার সাধন করে এক অখণ্ড ভারতরাজ্য গঠনের জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নির্বাচিত করেছেন। এবং সকল অবস্থায় তাঁকে সমর্থন করে আসছেন। একমাত্র তাঁর নেতৃত্বেই ভারতের শাশ্বত সত্য ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। সারা ভারতকে এক ধর্মসূত্রে বাঁধার ক্ষমতা এই ধর্মরাজেরই আছে। ধর্মের পাদপীঠতলে সমবেত করবেন সমগ্র ভারতভূমির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ; এই চারিবর্ণের মানুষকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির নিজেই এখন সে কাজের অন্তরায়। দুঃখে, শোকে, বেদনায় তিনি এতই অভিভূত যে অশান্ত হৃদয়াবেগে কিছুতেই শান্ত ও সংযত করতে পারছেন না। কোমলপ্রাণ ধর্মরাজ শোকে যেরূপ উন্মত্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন তাতে কৃষ্ণ অত্যন্ত বিচলিত হলেন। দুস্তর তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সমুদ্র অতিক্রম করে এসে অবশেষে গোস্পদস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের দুঃখ শোকের ক্ষুদ্র ডোবায় নিমজ্জিত হবে কি তাঁর আশা ও সংকল্প ? যুধিষ্ঠিরের নারীসুলভ আচরণে কুপিত হলেন কৃষ্ণ। উষ্মা প্রকাশ করে বললেন ঃ মহারাজ ! আপনি শোকে জ্ঞানশূন্য। ভুলে যাচ্ছেন, কৃতকর্মের ফলেই এই শোকসমুদ্রের উদ্ভব। আপনার তো কোন অপরাধ নেই। ধর্মযুদ্ধ করে রাজ্য জয় করেছেন। দুর্যোধনের লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, নির্যাতন, অপমান, অসম্মানে জর্জরিত হয়ে তবেই না বাধ্য হয়েছেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যুদ্ধে শত্রু সংহার পাপ নয়। মনুও বলেছেন, সংগ্রামে আহূত হলে ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করতে হবে। আর যুদ্ধে রক্তপাত অনিবার্য।

বিষণ্ণক্লিষ্ট যুধিষ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ সখা, আত্মীয়, ভ্রাতা, পুত্র সকলকে নিহত করে তাদের রুধিরলিপ্ত সিংহাসনে বসার আদৌ কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে সান্ত্বনা বাক্য বলে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন কৃষ্ণ। মহারাজ, পরিবারের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য মাতা গর্ভধারণ করেন। দীর্ঘকাল ধরে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করে, নানা ত্যাগ স্বীকার করে সে-ভ্রূণকে জঠরে লালন করেন। তারপর, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে শিশুকে জন্ম দেন। ইহলোক পরলোক সুখী হয় তার আবির্ভাবে। জন্মকালে যে মন শিশুর কলেবর হয় শোণিতসিক্ত তেমনি ধরণী রক্তে সিক্ত হয়ে নতুন রাজ্য জন্ম নেয়। তাই তো অভিষেকের সময় রাজার ললাটে রক্ত তিলক এঁকে দিতে হয়।

নির্বাণোন্মুখ দীপশিখাটি যেন পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল। যুধিষ্ঠিরের মনে ভয় ঘুচল। অন্তরের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব দূর হল। যুদ্ধ শেষে অন্তরে যে বিষাদ ও গ্লানি জমেছিল তার অবসান হল। স্বস্তি ও শান্তির এক বিচিত্র প্রকাশে উজ্জ্বল হল ধর্মরাজের মুখমণ্ডল। কণ্ঠস্বরে অপূর্ব মাধুরী মিশিয়ে আত্মনিবেদনের সুরে বললেন ঃ তোমাকেই চিরকাল বিশ্বাস। তোমার কথা অনুসরণ করেছি। তোমার বুদ্ধি ও শক্তিতে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আমার বুদ্ধি, শক্তি, কর্ম, ধর্ম সমস্তই তুমি। কৃতজ্ঞতার শ্রদ্ধায় তোমাতে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে ধর্মরাজকে আলিঙ্গন করলেন।

মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠল। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ মন্দিরার সুমধুর লহরীতে চতুর্দিক মুখরিত হল। রাজধর্মের বৃহৎ প্রকোষ্ঠে গৌরাঙ্গী, লাবণ্যময়ী রমণীরা পুষ্পমালা, চন্দন ও অর্ঘ নিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়েছিল। মাঙ্গলিক সজ্জায় নারী ও রাজপ্রসাদ যেন মধুময় হল।

হস্তিনাপুরের রাজভবনের রাজসিংহাসনে যেখানে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর মহারাণী গান্ধারী, ভাগ্যের পরিহাসে সেখানে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং সম্রাজ্ঞী দ্রৌপদী। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী উপস্থিত আছেন সভায়। এ ভবনে নিরানন্দ তিনি। দুঃখ ক্ষোভে লজ্জায় মাথা নত করে বসে আছেন তাঁরা। রাজৈশ্বর্যের দীপ্ত সমারোহে তাঁদের চোখ যাতে বিভ্রান্ত না হয়, রোষানলে যাতে ধর্মরাজের রাজ্য পুড়ে ছারখার না হয় সেজন্য বিধাতা তাঁদের একজনকে করছেন অন্ধ এবং অন্যজনের চক্ষুদ্বয়কে করেছেন আবৃত। তাঁদের নিয়তিই যেন জীবনপঞ্জীর কালো অক্ষরে লেখা পাতাগুলিকে অপসারিত করে নতুন এক জীবন অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখল—ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠির।

মনিরত্ন খচিত স্বর্ণসিংহাসনে যুধিষ্ঠির বসেছেন পূর্বমুখ হয়ে। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁর সম্মুখে। ভীম ও অর্জুন তাঁর মাথার উপর সুবর্ণনির্মিত বৃহৎ ছত্র ধারণ করল। নকুল ও সহদেব রজতশুভ্র চামর দ্বারা ধর্মরাজকে ব্যজন করতে লাগল। গজদন্ত নির্মিত রত্নখচিত সিংহাসনে মনকে শান্ত ও সংযত করে সমাহিত চিত্তে বসে আছেন ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর মহিষী গান্ধারী। তাঁদের মধ্যস্থলে আর একটি রত্ন আসনে উপবিষ্ট আছেন কুন্তী। প্রশান্ত বদন তাঁর। দুই নয়নে স্নিগ্ধজ্যোতি।

কৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করে পুরোহিত ধৌম্য অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ করলেন। পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়ে অভিষেককে অভিনন্দিত করলেন কৃষ্ণ। তারপর পাঞ্চজন্যের সুগন্ধ পুণ্যবারি সিঞ্চনে অভিষিক্ত করলেন ধর্মরাজকে। স্বহস্তে ধর্মরাজের ললাটে এঁকে দিলেন রক্ত তিলক। প্রভাত সূর্যের মত জ্বলে জ্বলে করতে লাগল তাঁর ললাট।

অমনি ব্রাহ্মণগণ স্তুতিপাঠ করতে লাগল। প্রজাগণ জয়ধ্বনি দিল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের। প্রসন্নহাস্যে যুধিষ্ঠির তাদের বিজয় অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়।

দ্বারকার আকাশেও রাহুগ্রস্ত হল সূর্য, যেমন হয়েছিল হস্তিনাপুরে। নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেল। আত্মীয়দের ধ্বংস পতনের কথা চিন্তা করে বিমর্ষ হলেন কৃষ্ণ।

আসন্ন ধ্বংসের বার্তা পাঠিয়েছেন মহাকাল।

হস্তিনাপুরের যত দুঃখ, পাপ, অমঙ্গল, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, মোহ, মাৎসর্য অসূয়া ও হিংসা ছিল সমস্তই যেন যদুবংশকে গ্রাস করল। ক্ষাত্রশক্তির গর্বে অহংকারে যাদবপ্রধানেরা উদ্ধত। ঐশ্বর্য ও সম্পদের সমারোহে ও বিপুল ভোগে তারা প্রমত্ত। লোভ ও লালসায় মনুষ্যত্বহীন। তাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে দ্বারকাবাসী বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত। যাদব, অন্ধক, ভোজ, সাত্বৎ, শূরসেন সর্বত্র ভরে গিয়েছেন দ্বন্দ্বে। লোভ ও হিংসায় উন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন তারা। আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। তাহলে কি কংস, শিশুপাল, দুর্যোধন, কর্ণ এখনও নির্মূল হয়নি পৃথিবী থেকে? ধরণীকে দুঃসহ দুঃখ ও লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য শৈশব থেকে কত উপায়েই না সংগ্রাম করেছেন তাদের সঙ্গে। ভারতবর্ষের যত দুঃখ, যত পাপ, যত অমঙ্গল অশ্রুজল জমে উঠেছিল তাকে নির্মূল করার জন্যই তো কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ধর্মাশ্রয়ী পাণ্ডবদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তিনি। তবু কি উদ্ধার হল সত্য, শিব ও সুন্দর? নিজের কাছে তাঁর প্রশ্ন: "সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে, পাপ যদি নাহি মরে যায় আপনার প্রকাশলজ্জায়, অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়, তবে অন্তরের কী আশ্বাস রবে মরিতে?" হতাশায় ভেঙে পড়লেন কৃষ্ণ। চতুর্বর্ণের মিলন, সাধারণ মানুষের শান্তি, ধর্মরাজ্য, অখণ্ড ভারতবর্ষ—প্রীতি, মৈত্রী, সহযোগিতা, সৌভ্রাত্র, পারস্পরিক সহবস্থান, সুখী সুন্দর ধরণী সব চোখের তারায় পদ্মপত্রের জলের মত কাঁপতে লাগল। তবে,—স্বর্গ কি হবে না কেনা? জবাব মেলে না তার।

দীর্ঘকাল ধরে, যে পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন আজ তাঁর ঘরেই ঢুকল সে পাপ! কি করে তাড়াবেন তাকে? অবশেষে তাঁর আত্মীয়রাই শত্রু হয়ে দাঁড়াল? সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় পেঁৗছিয়েও শিখর ভেঙে ধরাশায়ী হলেন। মনের কাছে তাঁর নিরন্তর জিজ্ঞাসা: এতকাল ধরে কার সাথে সংগ্রাম করলেন তিনি? কি লাভ হল সেই সংগ্রামে? দুর্বিষহ দুঃখের বোঝায় ভারী হল তাঁর মন। বিভীষণেরাই কুল নির্বংশ করে। সুতরাং স্বর্ণলঙ্কার মত যদুবংশও ধ্বংস হবে। এ তাদের ভাগ্যলিপি।

আত্মীয়দের অধঃপতনে কাতর হলেন কৃষ্ণ। মহা সর্বনাশ থেকে তাদের রক্ষার জন্য কি অসাধ্য সাধনই না করেছেন তিনি। কংসের অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক যাদব সমবায়কে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন এই পরিণতি দেখার জন্যে কি? একজাতি একমন ও একপ্রাণ হয়ে কাজ করার যে সংকল্প তাদের একদিন নিবিড় ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করল সে সংকল্প কোথায় গেল? একদিন যে সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন সে সাফল্যের গৌরব ম্লান হয়ে গেল স্বজাতির অধঃপতনে ও গৃহযুদ্ধে। এমনি করে যে সব মূল্যহীন হয়ে যাবে একদিন, কৃষ্ণ ভাবেননি কখনও। দুঃখে হৃদয় তাঁর বিদীর্ণ হতে লাগল। দুঃসহ গ্লানিতে অবসন্ন হল তাঁর মন। নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি।

বাইরে নিকষ কালো অমাবস্যার অন্ধকার। বাতায়ন পথে নয়ন মেলে তাকিয়ে

আছেন কৃষ্ণ ! শূন্য উদাস দৃষ্টি তাঁর। ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চলে না। তবু তার মধ্যে কি যেন অন্বেষণ করছেন ?

চোখের উপর মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে কুরুক্ষেত্রের বীভৎস ভয়ংকর দৃশ্য। পতি-পুত্রহীনা রমণীদের বক্ষবিদারী ক্রন্দন, হাহাকার এবং দীর্ঘশ্বাস। তাঁর বুকেও জাগল সেই হাহাকার। আপন দুঃখ ও বিষণ্ণতার ভাবে তাঁর হৃদয় জীর্ণ ও বিদীর্ণ হতে লাগল। নিজের কাছেই তাঁর প্রশ্ন—কি লাভ হল এই যুদ্ধে ? কি চেয়েছিলেন আর কী পেলেন তিনি ? এই কি তাঁর আকাঙ্খিত ধর্মরাজ্য ? পলকের তরে শিহরিত হল তাঁর দেহ। আত্মঘাতী মূঢ়তার এই পরিণামের কথা কেউ চিন্তা করতে পারে কখনও ?

কৃষ্ণের দীর্ঘশ্বাসে চমকে উঠলেন রুক্মিণী। আস্তে আস্তে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালেন। আপন কোমল করযুগল খুব সন্তর্পণে তাঁর স্কন্ধেতে স্থাপন করলেন। তবু কৃষ্ণের তন্ময়তা ভঙ্গ হল না। তাঁর ভ্রমর কালো ঢেউ খেলানো চুলের মধ্যে চম্পককলির মত অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগল। তবু কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না কৃষ্ণ। কথা বলার আগ্রহও প্রকাশ পেল না। অভিমান হল রুক্মিণীর। চোখে জল এসে গেল তাঁর। মনে মনে বলল : নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর—ভীষণ নিষ্ঠুর !—হবেই তো ! ভালবাসার লোকের তো অভাব নেই। কি করে জানবে বিরহের জ্বালা ? সারাজীবন ধরে দুঃখ দিয়েছেন. দুঃখ পেয়েছেন, তবু দুঃখ ভালো লাগে তাঁর। দুঃখেই যেন তাঁর আনন্দ। বহু কষ্টে আপনার অধীর চিত্তাবেগ দমন করল। স্বামীর বিমর্ষ বেদনা ও দুঃখে অভিভূত হল তাঁর হৃদয়। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে। ধীরে ধীরে ডাকল রুক্মিণী—নাথ, ত্রিভুবনের কোন অকল্যাণ ঘটেছে কি ? এমন আত্মসমাহিত কেন তুমি ? নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত নিশ্চল হয়ে কেন বসে রও ? যদি অযোগ্য মনে না কর তাহলে তোমার দুঃখের অংশ দাও আমাকে।

করুণা সুন্দর নয়ন মেলে একবার কৃষ্ণ রুক্মিণীর দিকে তাকালেন। অধরে প্রসন্ন হাসি। সুমিষ্ট হেসে বললেন : তোমার বাক্য শুনে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হল। তোমাকে তো কিছু বলার নেই আমার। সবই জান তুমি। নিজের চোখে দেখছ।

রুক্মিণীর দুই চোখে বিস্ময়, ললাটে কুঞ্চন। বদন বিষণ্ণ। মুখে কথা যোগাল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল : আত্মীয়দের দুর্নাম, সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাসে তুমি কাতর হয়েছ। তারা নির্বোধ। তোমাকেই তারা জানে।

ক্লিষ্ট সুরে বললেন কৃষ্ণ : না প্রিয়ে। তারা আমার আর বশে নেই। ঐশ্বর্যের অহংকারে ক্ষাত্রশক্তির গর্বে তারা উদ্ধত। আমার পরামর্শকে কর্তৃত্বের অধিকার মনে করে তারা। তাদের সন্দেহ সংশয় দূর করার জন্য নিজের সম্পদ, ঐশ্বর্যের অর্ধাংশ দিয়েছি। তবু তাদের কুঞ্চিত দৃষ্টিতে ঘৃণার বিষ। নিঃশ্বাসে ঈর্ষার আগুন। তাদের আচরণে মর্মাহত আমি।

রুক্মিণী বিস্মিত হয়ে বলল : এত সহজে তোমায় কখনও নিরাশ হতে দেখিনি।

বাধা বিপদ আছে জেনেও, সব তুচ্ছ করে বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে উদ্ধার করেছ দুর্গত মানুষদের।

সত্য রাণী! আজ আমি বড় শ্রান্ত। অবসন্ন। আমার ধর্মরাজ্য ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, আজ এই দ্বারকাতেই। পানোন্মত্ত যাদবেরা আমার স্বপ্নের ভারতরাজ্য ভেঙে তছনছ করতে উদ্যত। এই দুঃখ আমি সইতে পারছি না। বলতে বলতে কৃষ্ণের শ্যামা মুখখানি কালো হয়ে উঠল।

বিষণ্ণ কণ্ঠে রুক্মিণী বলল ঃ এত সহজে তোমার ভেঙ্গে পড়লে চলবে না নাথ!

হতাশা হয়ে কৃষ্ণ বললেন ঃ রুক্মিণী, কংসেরা মরে না। চিরকালেব জন্য দমনও করা যায় না তাদের। সারা জীবন ধরে চেষ্টা করেও পারলাম কি তাদের ধ্বংস করতে? অবশেষে, আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত আত্মীয় ও বান্ধবের মধ্যে যখন কংস জরাসন্ধের বীভৎস অট্টহাস্য শুনতে পেলাম তখন ভয় পেয়ে থমকে গেলাম। আমার উৎসাহ, উদ্দীপনায় ভাটার টান ধরল। এই পরিণতি দেখার জন্যই কি আহার নিদ্রা ভুলেও এর পেছনে ছুটেছি? নিরন্তর হা হুতাশ আর প্রশ্ন করি কেন এমন হল? কি লাভ হল যুদ্ধ করে? কি পেলাম আমি? একে কি জয় বলা যায়? আত্মঘাতী এই পরিণামকে জয় বলে গৌরব করে কেউ? তারপর থেকে ভীষণ ক্লান্ত আমি। মনে হচ্ছে, জড়ত্বের ভারে অথর্ব পঙ্গু এক অসহায় ক্লিষ্ট প্রাণ আমি।

আকুল হয়ে রুক্মিণী বলল ঃ আত্মীয় বলে ক্ষমা করছ কেন তুমি? অন্যদের মত যাদবদেরও পাপের দণ্ড দাও।

শশব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণ বললেন ঃ না, না, রাণী তা নয়। এই অভিশপ্ত পাপ থেকে পৃথিবীর মুক্তি নেই। মানুষের চেষ্টায় পৃথিবী কখনও পাপমুক্ত হয় না, হতে পারে না। মহাকাল ছাড়া আর কেউ দমন করতে পারে না তাকে। কাল হল নিষ্ঠুর বিচারক।

ক্ষেদোক্তি করে রুক্মিণী বলল—বড় হতাশ করলে নাথ। আমারও যে স্বপ্নভঙ্গ হল। কি নিয়ে থাকব বল, রাজা।

ব্যথা পেলাম রাণী। জীর্ণ ক্লান্ত দেহ আমার। এই পথের শেষ কোথায় জানতে পারলে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মানুষী চেষ্টায় কোনদিন শেষ হবে না এই সংগ্রাম। কুরুক্ষেত্রের মত আর একটা শ্মশান সৃষ্টি করতে চাই না রাণী। ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ আত্মীয় ও বান্ধবহীন হয়ে কেমন করে কাটাবে? তাই, রাজনীতি থেকে আমিও অবসর নিয়েছি। মহাকাল নিজের হাতেই তার দণ্ড দিন।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকল রুক্মিণী। মনে হল, কালের ঘূর্ণি যেন মুহূর্তের জন্য থেমে গেছে। যুগান্তরের জন্য মাঝে মাঝে বিরতির প্রয়োজন ঘটে। তবে কি সেই মহালগ্ন সমাগত?

কৃষ্ণ গম্ভীর হলেন। পর্বতের মত শান্ত, স্তব্ধ ভীষণ মৌন। ললাটে তাঁর চিন্তার কোন কুঞ্চন নেই। প্রশান্ত, নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন তাঁর মুখমণ্ডল। নেত্রদ্বয় অর্ধনিমীলিত মহাযোগীর মত ধ্যানস্থ। যেন ডুব দিয়েছেন কোন অতল মহাসিন্ধুর গভীরে। দেহ মন ইন্দ্রিয় সমস্তই যেন তাঁর মহাকালের রথচক্রধ্বনি শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে।

বর্তমানে প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্র কৃষ্ণের সেই স্বপ্নেরই রূপরেখা। খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি পরস্পরের মধ্যে শান্তি, সৌভ্রাত্র, বন্ধুত্ব, সংহতি বজায় রেখে পরস্পরের অধিকারকে সম্মান করে, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, জাতীয় স্বার্থে দেশ ও জাতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নিরাপত্তার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হয়েছে। এ ভারত কৃষ্ণের চিন্তিত ভারতরাষ্ট্র।

ইতিহাসের ঘটনাচক্র এখন চলেছে সমান্তরালভাবে। মহাভারতের যুগের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয়নি। ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও চলেছে সেই দল ভাঙাভাঙির পালা, গোষ্ঠির কোন্দল, আর পারস্পরিক স্বার্থের হানাহানির পুনরাবৃত্তি। ইতিহাসের রথচক্রের পরিক্রমায় তাদের পরিহাসরূপে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতিরা এখনও জীবিত। তাদের অত্যাচার, অনাচার, অবিচার ব্যাভিচার, উৎপীড়ন, নির্যাতন, লোভ, ক্রোধ, জিঘাংসা থেকে পৃথিবীর মুক্তি হয় নি। তাদের আসুরিক শক্তির দম্ভ ও অহংকারের অট্টহাস্যে পৃথিবী কম্পিত। দুঃশাসনের কলুষ স্পর্শে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা। শকুনির কপট কুট বুদ্ধির তাপে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত। জরাসন্ধের 'সুপার পাওয়ার' লাভের প্রমত্ততা বিশ্ব রাজনীতির শিরঃপীড়া। বৃহৎ শক্তিবর্গ তার প্রতিবেশী ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রকে আপন ইচ্ছার কাছে সর্বদা নত রাখছে। স্থায়ীভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার ও প্রভুত্ব করছে। এর ফলে, বৃহৎ শক্তিবর্গের রেষারেষি ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অহংকার কর্তৃত্বের লোভ, প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের উন্মত্ত আকাংখা কুরুক্ষেত্রের মত নিয়মিত উত্তেজনাকারী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য করে তুলেছে। আজিকার বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী দুর্যোধনের মত অসিকেই মীমাংসার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে। আর তারই পরিণাম যুদ্ধ ও অশান্তি।

মহাভারতের কালের সঙ্গে তাই একালের ইতিহাসের অবনিবনা নেই।